লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের
উপর হাদীসশাস্ত্রের আলোকে রচিত প্রামাণ্যগ্রন্থ
'প্রচলিত জাল হাদীস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের উপর
হাদীসশাস্ত্রের আলোকে রচিত প্রামাণ্যগ্রন্থ
'প্রচলিত জাল হাদীস'এর দ্বিতীয় খণ্ড

এসব হাদীস নয়

মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ্

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

এসব হাদীস নয় : ২

মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক

প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩
ফোন : ৮০০১৪৯৪, ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫
E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

পরিবেশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড
বাংলাবাজার-ঢাকা, মোবা. : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মহররম ১৪৩৮ হি. = অক্টোবর ২০১৬ ঈ.

মূল্য	স্বত্ব
২২০ (দু'শ বিশ) টাকা মাত্র	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Eshob hadith noi By Maolana Huzzatullah, Edited By Maolana Muhammad Abdul Malek, Published by the Department of Publication, Markazud Dawah AlIslamia Dhaka.

Price : Tk. 220.00 Us$ 8.00.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের কথা

আলহামদু লিল্লাহ, 'প্রচলিত জাল হাদীস : ১'-এর বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ 'এসব হাদীস নয় : ১' নামে প্রকাশিত হল। সাথে প্রকাশিত হল পাঠকের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'এসব হাদীস নয় : ২'।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রধান উৎস, দ্বীনের ভিত্তি-স্তম্ভ। এই হাদীসের যথাযথ সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে যুগে যুগে উম্মতের মনীষীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কোন রেওয়ায়েত বাস্তবেই হাদীসে নববী কি না তা যাচাইয়ের জন্য তাঁরা তৈরি করেছেন বহু শাস্ত্র। কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন বর্ণনাকারীদের জীবন-ধারা। এভাবেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভাণ্ডার পৌঁছে দিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

ওই দিকে আরেকদল দুষ্ট বা বোকা লোক সময়ে সময়ে করেছে উল্টো কাণ্ড। ওরা মনগড়া কথাবার্তাকে হাদীসে রাসূল বলে প্রচার করার প্রয়াস পেয়েছে। এমনটা যে হতে পারে সে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইতো তিনি মিথ্যা হাদীস গড়ার এবং তা বর্ণনা করার ব্যাপারে কঠোর ধমকি-বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। এমন লোকদের ঠিকানা যে জাহান্নামে হবে তা বলে গেছেন সুস্পষ্টভাবে। তথাপি জাল বর্ণনার প্রচার-প্রসারের ধারা থেমে থাকেনি। কিন্তু দ্বীনের হেফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা নিজেই করেন। তাই যুগে যুগে পয়দা করেছেন উলূমুল হাদীস (হাদীস-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ)এর বড় বড় ইমাম ও মুহাক্কিকদের। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ওই সব মনগড়া জাল কথাগুলো চিহ্নিত করে গেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরবী ভাষায় রচিত হয়েছে বিভিন্ন নামের জাল-হাদীস সংকলন।

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাধ্যানুযায়ী হাদীস-বিষয়ক উচ্চতর গবেষণাধর্মী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক হাদীস বিশারদগণের পরম স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হচ্ছেন হাদীস বিভাগের প্রধান। আলহামদু লিল্লাহ, মাওলানা আব্দুল মালেক এ দেশে উলূমুল

হাদীসের প্রচার, বিস্তার ও উন্নয়নের যে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তা হয়ত ওই মনীষীগণের দুআরই বরকত।

২০০৩ ঈ. সালে প্রচলিত জাল হাদীস প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এর দ্বিতীয় খণ্ড তৈরির ফিকির চলছিল। কিছু কিছু করে কাজও হচ্ছিল, কিন্তু অন্যান্য ব্যস্ততায় এটি পেছাতে থাকে। এ দিকে পাঠকগণ একাধারে তাড়া দিয়ে যাচ্ছিলেন কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য। তাদের অপেক্ষার পালা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছিল। অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্বের জন্য আমরা মাযেরাত করছি। আলহামদু লিল্লাহ, 'এসব হাদীস নয় : ২' এখন আপনাদের হাতে। এটি তৈরি করেছেন মারকাযের উলূমুল হাদীস বিভাগের তালেবে ইলম মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ। তিনি এখন মারকাযের দারুত তাসনীফের রুকন। তিনি তার উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেকের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় কিতাবটি তৈরিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এ খণ্ডের শুরুতেও একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব। প্রথম খণ্ডের মতো এ খণ্ডও পাঠকগণ পছন্দ করবেন আশা করি। প্রথমটির মতো এটিও আপনাদের দ্বীনী চাহিদা মেটাবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

এ সতরগুলো লেখার সময় নযর পড়ল এসব হাদীস নয় : ২-এর শুরুতে লেখা ভূমিকার নিচে তারিখটির দিকে ২২-০৩-১৪৩৬ হি. অর্থাৎ প্রায় দুই বছর আগে বইটি শেষ করে ভূমিকাও লেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরও সুন্দর আরও বিশুদ্ধ করার জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক এত দীর্ঘ সময় নিয়েছেন। এর থেকে পাঠকগণ তাঁর তাহকীকী দৃষ্টিভঙ্গিও কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন।

যা হোক, এরপরও মুদ্রণজনিত বা অন্য কোনো ধরনের ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারও নযরে এমন কিছু এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থ দু'টিকে কবুল করুন, এর লেখকদ্বয়ের ইলম-আমলে বরকত দান করুন, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে ছিহ্হাত ও আফিয়াতের সঙ্গে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন, উম্মতের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমী, তাহকীকী ও সংস্কারমূলক কাজগুলো করে যাওয়ার তাওফীক দান করুন এবং পাঠকবর্গকে ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে উভয় জাহানে কামিয়াব করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
রঈস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
২৩ মহররম, ১৪৩৮হি.=২৫ অক্টোবর, ২০১৬ঈ.

নিবেদন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ!

আলহামদু লিল্লাহ, দীর্ঘদিন পর 'এসব হাদীস নয়' (আগের নাম 'প্রচলিত জাল হাদীস')এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ রকম একটি গ্রন্থের কাজে অংশ নিতে পারার জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি–

اَللّٰهُمَّ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

প্রথম খণ্ডের মতো এ খণ্ডও উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দামাত বারাকাতুহুমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সংকলিত হয়েছে। তাঁর নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে প্রথমে রেওয়ায়েতগুলো নির্বাচন করা হয়। তারপর সেগুলোর শাস্ত্রীয় মান নির্ণয়, শাস্ত্রজ্ঞদের মতামত ও উদ্ধৃতি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত একত্র করে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে লেখা হয়; এরপর উস্তাযে মুহতারাম তা আদ্যোপান্ত দেখেন এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেন। কাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকাও লিখে দেন তিনি। বস্তুত তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানের ফলেই আমাদের পক্ষে এ রকম একটি গ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা উস্তাযে মুহতারামকে 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন। তাঁকে সিহ্হত ও আফিয়ত এবং খায়ের ও বরকতপূর্ণ দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। তাঁর ইলমী ও তাহকীকী কাজগুলো সম্পূর্ণ করে দিন। যে ইলম ও হেকমত এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন আমাদের তা থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

মৌলিকভাবে এ খণ্ডে প্রথম খণ্ডের শৈলীই অবলম্বিত হয়েছে। জটিল ও শাস্ত্রীয় আলোচনায় না গিয়ে শুধু শাস্ত্রজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনাগুলোর মান উল্লেখ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে কিছু মৌলিক কথা বলেই আলোচনা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস পাওয়া গেলে তা উল্লেখ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মূল গ্রন্থে প্রবেশের আগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাঠকের জানা থাকা প্রয়োজন–

ক. প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় খণ্ডে অনেক মনীষীর নামের শুরুতে 'ইমাম' শব্দ এসেছে। এই অভিধাটি ব্যবহৃত হত শাস্ত্রজ্ঞদের জন্য। বহুশাস্ত্রবিদের ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার বেশি। বিশেষ করে এ গ্রন্থে যাঁদের নামের শুরুতে এ শব্দ এসেছে তাদের অধিকাংশই বহুশাস্ত্রবিদ।

খ. এ খণ্ডে জাল ও ভিত্তিহীন হাদীসের পাশাপাশি নমুনাস্বরূপ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও আওলিয়া কেরাম সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভিত্তিহীন ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা মানুষের আকীদা-বিশ্বাসে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ দিক থেকে এগুলো অনেকটা জাল হাদীসের মতোই ক্ষতিকর।

গ. হাদীস যেমন জাল করা হয় তেমনি কখনও গোটা একটি গ্রন্থ বা পুস্তিকাও জাল করা হয়। অর্থাৎ নিজেদের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা তৈরি করে কোনো মনীষীর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। কখনও এমনও হয়, বিখ্যাত একজন মনীষীর কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকার নামে নামকরণ করে জাল একটি গ্রন্থ বা পুস্তিকা ছেপে দেওয়া হয়। এর ফলে সাধারণ পাঠক ধোঁকায় পড়ে যান। এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য বর্তমান খণ্ডে নমুনাস্বরূপ দু'টি জাল পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ. বরাত (রেফারেন্স) প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে সমকালীন কোনো কোনো লেখকের গ্রন্থের বরাত দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তীদের পাশাপাশি বর্তমান লেখকরাও যে এ বিষয়ে একই মত পোষণ করেন সেটা বোঝানোর জন্য তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু স্থানে শুধু এ কারণে বরাত দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত কিতাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গোছালো ও সারগর্ভ আলোচনা আছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক একটি রায়ে পৌঁছাবার ক্ষেত্রে যা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মোটকথা সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেই এগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ. কোনো তালেবে ইলম ভাই যদি গ্রন্থে উল্লেখকৃত কোনো রেওয়ায়েত সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা পড়তে চান তাহলে প্রত্যেক রেওয়ায়েতের সঙ্গে উল্লেখকৃত সবগুলো বরাত মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে।

চ. নিতান্ত প্রয়োজনে জটিল বা শাস্ত্রীয় কোনো আলোচনা করতে হলে সেগুলো টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ছ. প্রথম খণ্ডের মতো এ খণ্ডেও বরাত টীকায় উল্লেখ না করে মূল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ. প্রথম খণ্ডে জাল বর্ণনাগুলোর একটি আরবী সূচি দেওয়া হয়েছিল। এ খণ্ডের কিছু বর্ণনা বেশ দীর্ঘ হওয়ায় এবং কিছু বর্ণনার শুধু বাংলা পাঠ পাওয়া যাওয়ায় আরবী সূচি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এ খণ্ডে বর্ণনাগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানো হয়েছে এবং একটি বিষয়ভিত্তিক সূচি দেওয়া হয়েছে। আশা করি, এই সূচির মাধ্যমে সহজেই কাঙ্ক্ষিত বর্ণনাটি খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া আরও কিছু জরুরি কথা গ্রন্থপাঠের আগেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন, উস্তাযে মুহতারাম তাঁর ভূমিকায় সেগুলো উল্লেখ করেছেন। ভূমিকা থেকে কথাগুলো পড়ে নেওয়ার জন্য পাঠককে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি শ্রদ্ধেয় উস্তায মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর সম্মানিত মুদীর হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম, উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম এবং (মকতব ও হিফযখানা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত) আমার সকল আসাতেযা কেরামের, যাঁদের মেহনত, তাওয়াজ্জুহ, নির্দেশনা ও নেক দুআর বদৌলতে আমার তালেবে ইলমী যিন্দেগির অস্তিত্ব। স্মরণ করছি মা-বাবা ও ভাই-বোনকে, আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে তাঁদের সবাইকে (এবং আমার উপর যার সামান্যতম 'ইহসান'ও আছে তাকে) আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দিন। উভয় জাহানে তাঁদের হায়াতে তাইয়েবা দান করুন।

এ কাজে আমাদের সহপাঠী মাওলানা আবদুর রহমান বেশ কিছু রেওয়ায়েতের তথ্য যোগাড় করে দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে (এবং আমার সকল সহপাঠীকে) সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিজ অনুগ্রহে আপনি এ কাজটি কবুল করে নিন। আমীন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত

হুজ্জাতুল্লাহ

২৬.০৫.'৩৬ হি.

সূচিপত্র

নবী-রাসূল, সাহাবী-তাবেঈ
দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর/৩৫
সাপের মুখে করে ইবলীসের বেহেশতে প্রবেশ/৩৬
সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে/৩৭
সুলাইমান আ.এর আংটি হারানো/৩৮
সুলাইমান আ.এর সকল সৃষ্টিজীবকে মেহমানদারি করানো/৪০
কুষ্ঠরোগে আইয়ূব আ.এর সারা শরীর ঘা হয়ে যাওয়া/৪১
যাকারিয়া আ.কে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা/৪৪
ঈসা আ.এর বিসমিল্লাহ-এর ব্যাখ্যা প্রদান/৪৫
ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের একটি ছেলে পাওয়া/৪৫
আবু বকর রা.এর খেজুর পাতার পোশাক পরিধান/৪৭
উমর রা.এর ছেলে আবু শাহমার ব্যভিচারের শাস্তি/৪৮
ফাতেমার 'জারি'/৫০
বেলাল রা.এর 'সীন'কে 'শীন' উচ্চারণ করা/৫০
জাবের রা.এর ছেলে কর্তৃক ভাইকে হত্যা/৫২
হাসান ও হুসাইন রা.এর নতুন কাপড়ের জন্য কান্নাকাটি/৫৩
উয়াইস কারনী রহ.এর দাঁত ভেঙে ফেলা/৫৩
উয়াইস কারনী রহ.কে খিরকা দিয়ে যাওয়া/৫৫

ইলম অন্বেষণ, পড়াশোনা
আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসা
জ্ঞানার্জনের জন্য চীনে গমন/৫৭
আসরের পর পড়াশোনার ক্ষতি/৬০
মেয়েদের হস্তলিপি শেখা/৬১
ইলম অনুযায়ী আমল করার ফযীলত/৬২
জ্ঞানীর কলমের কালির মর্যাদা/৬২
মসজিদ-মাদ্রাসার ফযীলত/৬৫
তাসাওউফ, পীর-মুরীদী ও ওলী-বুযুর্গ
শায়খের মর্যাদা/৬৭

আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া/৬৮
ইলমে বাতেন/৬৯
নেককারদের আলোচনার ফযীলত/৭০
গোপন মুত্তাকী/৭১
বোরাকে ওঠার জন্য আব্দুল কাদের জিলানীর কাঁধ বাড়িয়ে দেওয়া/৭২

দুআ-দরূদ

দরূদ পাঠের নির্দিষ্ট ফযীলত/৭৭
ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার ভিন্ন ভিন্ন দুআ/৭৮
ওযুর শুরুতে পড়ার দুআ/৮২
হিযবুল বাহ্‌র/৮৩
দুআয়ে ইবরাহীম/৮৫
দুআয়ে ক্বাদাহ/৮৬
দুআয়ে জামিলা/৮৯
আহাদনামা/৮৯
হাফতে হাইকাল/৯০
দুআয়ে হাবীবী/৯০
মুনাজাতে আবু বকর রা./৯১
দুআয়ে গঞ্জুল আরশ/৯৩
দরূদে তাজ/৯৪
দরূদে হাজারি/৯৬
দরূদে শেফা/৯৬
দরূদে তুনাজ্জিনা/দরূদে নাজিয়া/৯৬
দরূদে আকবর/৯৭
দরূদে নারিয়া/৯৮
দরূদে লাখী/৯৮

বিভিন্ন আমল

ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে
দু'রাকাত নামায আদায়ের নির্দিষ্ট সওয়াব/১০১
নামাযের পর নামাযের স্থানে বসে থাকার নির্দিষ্ট ফযীলত/১০২
তাকবীরে তাশরীকের প্রেক্ষাপট/১০৩
মসজিদে বাতি জ্বালানোর ফযীলত/১০৪
যোহরের নামাযের পর সূরা 'ফাত্‌হ' .../১০৫
চার হাজার দিনার সদকা দিয়ে ঘুমাবেন.../ ১০৫

দানশীলতার ফযীলত/১০৭
দৈনিক বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করার সওয়াব/১০৮
দৈনিক বিশজনকে সালাম প্রদানের ফযীলত/১০৯
সালাম প্রদানে নব্বই নেকি আর উত্তরে দশ নেকি/১১১
মাস, দিন, তারিখ ইত্যাদি বিষয়ক
কোন্ দিন কী সৃষ্টি হয়/১১৩
আইয়ামে বীয নামকরণের কারণ/১১৭
আইয়ামে বীযে রোযার নির্দিষ্ট সওয়াব/১১৭
আশুরার রোযার নির্দিষ্ট ফযীলত/১১৮
আশুরায় রোগীর সেবার ফযীলত/১১৯
আশুরার নির্দিষ্ট নিয়মের নামাযের ফযীলত/১১৯
আশুরার দিন কেয়ামত সংঘটিত হওয়া/১২০
আশুরার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি/১২০
রজব মাসের রোযার নির্দিষ্ট ফযীলত/১২৫
রজবের সাতাশ তারিখে রোযার ফযীলত/১২৬
শবে ইস্তিফতাহ/১২৬
২৭ রজব ইসরা ও মেরাজ সংঘটিত হওয়া/১২৯
রমযান মাসের নির্দিষ্ট ফযীলত/১৩০
রোযা ত্রিশ হওয়ার তাৎপর্য/১৩১
যিলহজের শেষ দিন এবং মহররমের প্রথম দিন রোযার ফযীলত/১৩১
যিলহজের প্রথম দশদিনের রোযার ফযীলত/১৩১
নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী
পরিবার ও দাম্পত্য জীবন
নেককার নারী ও বদকার নারী/১৩৫
স্বামী-স্ত্রীর হাসি-খুশি দেখা-সাক্ষাতের সওয়াব/১৩৫
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে দুর্ব্যবহার সহ্য করার সওয়াব/১৩৬
পরিবারের জন্য নিজ হাতে আসবাব-পত্র বহনের সওয়াব/১৩৭
স্বামীর কাপড় ধুয়ে দেওয়ার সওয়াব/১৩৭
ডিমের গুণাগুণ/১৩৮
দাম্পত্য মিলনের বিধিনিষেধ/১৩৮
গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের পুরস্কার/১৪০
প্রবাদ-প্রবচন ও উক্তি
আচার-আচরণ কর ভাইয়ের মতো

লেনদেন কর অপরিচিতের মতো/১৪৩
অপবাদের জায়গা থেকে দূরে থাক/১৪৪
মুমিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করবে/১৪৪
নামায মুমিনের মেরাজ/১৪৬
যে অপরকে নিয়ে হাসাহাসি করে সে নিজেও হাসির পাত্র হয়/১৪৭
বিবিধ
সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগৎ : আঠারো হাজার মাখলুকাত/১৪৯
কালেমায়ে তাইয়েবা ও আরশ/১৫০
আমার জন্ম হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসক 'নওশেরওঁয়া'র যুগে/১৫০
উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব/১৫০
দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র/১৫১
হক কথা না বলে যে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান/১৫২
দারিদ্র্য ও ক্ষুধা : প্রত্যেকের একটি পেশা থাকে। আমার পেশা দু'টি– জিহাদ ও দারিদ্র্য ...'/১৫৩
ক্ষুধার সাহায্যে বেহেশতের দরজায় করাঘাত করতে থাক/১৫৩
আরবদের মর্যাদা : তিন কারণে আরবদের ভালোবাসবে–.../১৫৫
আকিক পাথর : তোমরা আকিক পাথরের আংটি ব্যবহার কর, এ আংটি হাতে থাকলে কেউ পেরেশান হবে না/১৫৭
জাল পুস্তিকা
জাল পুস্তিকা-১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত/১৬০
'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত' শীর্ষক পুস্তিকা : একটি প্রশ্নোত্তর/১৬০
–মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
পুস্তিকাটি জাল কেন?/১৬২
জাল পুস্তিকা-২
মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার/১৬৯
আলোচিত পুস্তিকা ও হাফেয ইবনে হাজার রহ./১৬৯
ضمیمہ متعلق بحث منبہات : از بندہ محمد عبد المالک /১৯১
তথ্যপঞ্জি/১৯৫

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، أَمَّا بَعْدُ!

আলহামদু লিল্লাহ্, অনেক দেরিতে হলেও 'প্রচলিত জাল হাদীস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড এখন 'এসব হাদীস নয় দ্বিতীয় খণ্ড' নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا، اَللّٰهُمَّ مَا أَمْسٰى بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

গ্রন্থের নাম কেন বদলানো হল, প্রথম খণ্ডের নতুন সংস্করণের শুরুতে আমি তা বিস্তারিত লিখেছি। প্রথম খণ্ড ছিল মাওলানা মুতীউর রহমানের রচনা। মাওলানা যুবায়ের হুসাইন (ইবনে মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ) যখন মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এ উলূমুল হাদীস বিভাগে তৃতীয় বর্ষে পড়েন তখন লোকমুখে প্রসিদ্ধ কিছু রেওয়ায়েত (বর্ণনা-)এর অনুশীলনমূলক 'তাখরীজ'[১] ও 'তাহকীক'[২] করতে গিয়ে কিছু কাজ করেন। এ কাজগুলোই ছিল প্রথম খণ্ডের 'বীজ'। পরবর্তী সময়ে মাওলানা মুতীউর রহমান (ইবনে আফাযুদ্দীন) যখন উলূমুল হাদীস তৃতীয় বর্ষে পড়েন তখন তিনি এ কাজটিকে সামনে এগিয়ে নেন। লাগাতার এক-দেড় বছর কাজ করার পর তা একটি গ্রন্থের রূপ লাভ করে। পরে তা 'প্রচলিত জাল হাদীস প্রথম খণ্ড' নামে প্রকাশিত হয়।

---

[১] 'তাখরীজ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উদ্দেশ্য হল উৎসগ্রন্থ থেকে রেওয়ায়েত (বর্ণনা) খুঁজে বের করা।

[২] তাহকীক : কোনো বিষয়ের হাকীকত পর্যন্ত পৌছার জন্য গবেষণা করে যাওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হল রেওয়ায়েতের শাস্ত্রীয় মান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করা।

আলহামদু লিল্লাহ, তৃতীয়বারের মতো তা আগাগোড়া দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন-পরিমার্জন ও সংযোজনের পর 'এসব হাদীস নয় ১ম খণ্ড' নামে এর নতুন সংস্করণ বের হয়েছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

দ্বিতীয় খণ্ড মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ (ইবনে নূর মুহাম্মদ)-এর রচনা। এতে রেওয়ায়েত জমা করার ক্ষেত্রে তার সহপাঠী মাওলানা আবদুর রহমান ও উলূমুল হাদীসের কয়েকজন তালেবে ইলম তাকে সাহায্য করেছে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করুন।

রচয়িতা ভিন্ন হওয়ার কারণে দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাশৈলী প্রথম খণ্ড থেকে কিছুটা আলাদা হয়েছে। এটি হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু উভয় খণ্ডের ব্যাপারে যে কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য তা হল, উভয় খণ্ডে যা কিছু লেখা হয়েছে যথাসম্ভব তাহকীক ও তত্ত্ব-তালাশ করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَوَّلًا وَآخِرًا

প্রথম খণ্ডের মতো এ খণ্ডেও কিছু কিছু জায়গায় আরবীতে টীকা লেখা হয়েছে। সেগুলো এ খণ্ডের সংকলক মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহরই লেখা। টীকাসহ পুরো কিতাব আমি আগাগোড়া দেখেছি এবং আমার সাধ্য মোতাবেক সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি। এরপর মাওলানা মুতীউর রহমান ও উলূমুল হাদীস বিভাগের উস্তাদ মাওলানা সাঈদ আহমদ ইবনে গিয়াসুদ্দীনও কিতাবটি একবার দেখেছেন। কবুল করার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর দরবারে আমি দুআ করছি, তিনি যেন কাজটি কবুল করে নেন। সুধী পাঠকের কাছেও আমি এ দুআ চাচ্ছি।

কিছু জরুরি কথা

প্রথম খণ্ডের শুরুতে কিছু কথা বলা হয়েছিল। সুধী পাঠক হয়তো সেগুলো দেখেছেন। জরুরি বিবেচনায় এখানেও কিছু কথা আরয করা হচ্ছে। আশা করব, পাঠকবৃন্দ এ কথাগুলোও মন দিয়ে পড়বেন।

এক. এ গ্রন্থ মূলত নিজের সংশোধনের জন্য

আমাদের খোশ কিসমতিতে যদি এ গ্রন্থ কোনো আলেমে দ্বীনের মুতালাআ (অধ্যয়ন) দ্বারা ধন্য হয় এবং এই পঠনের বদৌলতে তিনি নতুন কিছু জানতে পারেন তাহলে এই লব্ধ জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ-পন্থা কী হবে তা-ও তিনি জানবেন। তাঁর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে কিছু বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে যারা আলেম নন, তালেবে ইলম বা আলেম-তালেবে ইলম নন, দ্বীনী বইয়ের সাধারণ পাঠক, তাদেরকে একটি কথা বলে দেওয়া জরুরি, তা হল গ্রন্থপাঠের সময় মনে রাখতে হবে, এ গ্রন্থ একান্ত আপনার জন্য, আপনি নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং আপনার নিজের সংশোধনের জন্য। আপনি এ গ্রন্থ পড়ে এখানে উল্লেখকৃত মওযূ (জাল), ভিত্তিহীন, মুনকার (চরম আপত্তিকর) রেওয়ায়েতগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বয়ানে বা লেখায় সেগুলো উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন এবং সওয়াবের অধিকারী হতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ লেখা। এ গ্রন্থ এ জন্য লেখা হয়নি যে, আপনি একে হাতিয়ার বানিয়ে অন্য কারও সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে যাবেন, কোনো বক্তা বা কোনো মসজিদের খতীবের মুখে এখানে উল্লেখকৃত বর্ণনা শুনলে তার উপর আপত্তি করে বসবেন, কোনো সাধারণ লোককে এখানের কোনো বর্ণনা উল্লেখ করতে দেখলে তার সঙ্গে ঝগড়া করা শুরু করে দেবেন। ইলমের এমন গলদ প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়।

ইলমের সঠিক প্রয়োগ উলামায়ে কেরাম জানেন। কোনো বর্ণনা 'মুনকার' বা ভিত্তিহীন হওয়া– একটি খালেস ইলমী বিষয় এবং খুবই নাযুক ও স্পর্শকাতর বিষয়। এখানে আপনার দখল দেওয়া ঠিক নয়। যদি আপনি এ বিষয়ে কোনো গ্রন্থ পড়ে থাকেন এবং বুঝে থাকেন তাহলে তা আপনি নিজের উপর প্রয়োগ করুন। অন্যদের ব্যাপারে নিজে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে তাদের উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিন। আর যারা দ্বীনী কোনো পদে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের ব্যাপারে কথা বলা থেকে তো আপনাকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। তাদের নেগরানি করবেন তাদের বড় যারা আছেন, তাদের যে উস্তাযবৃন্দ আছেন তারা। আপনার এখানে কথা বলা সমীচীন নয়। বরং আপনি তাদের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে গিয়ে সঠিকভাবে বলতে না পারার কারণে বেয়াদবি হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে, যা আপনার ক্ষতির কারণ হবে।

আপনার করণীয় হল, নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকা। নিজের সীমাবদ্ধতার কথা খেয়াল রাখা। আপনার তো কোনো গ্রন্থ সংগ্রহের আগেও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এরপর তা পড়াও উচিত তাদের তত্ত্বাবধানে। বরং সম্ভব হলে কোনো আলেমে দ্বীনের কাছে তা এক সবক এক সবক করে পড়ে নেওয়া। কোনো আলেমের সাহায্য ছাড়া পড়লে

কোনো কথা ভুল বোঝারও আশঙ্কা আছে। যার ফলে আপনার দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে।

দুই. কোনো দ্বীনী গ্রন্থে এ রকম কোনো রেওয়ায়েত থাকলে আমাদের করণীয় কী হবে?

দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল, সুন্নাতের অনুসারী সহীহ আকীদাসম্পন্ন বুযুর্গ ও আলেমে দ্বীনের সোহবত ও নেগরানি (তত্ত্বাবধান ও সাহচর্য অবলম্বন)। দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার এটাই স্বভাবজাত পথ। ইসলামের শুরু যুগ থেকে এ পর্যন্ত দ্বীন শেখার এ রীতিই চলে আসছে। এর কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প থাকা সম্ভবও নয়। তবে এ পন্থা অবলম্বনের পাশাপাশি সহায়ক একটি পন্থা আছে। তা হল, দ্বীনী গ্রন্থ পাঠ করা।

কুরআনে কারীম ও সুন্নতে নববীর শিক্ষা ও আদর্শ সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনের জন্য অনেক দ্বীনী কিতাব লেখা হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর আলোকে লেখা অনেক গ্রন্থও আছে। তা ছাড়া সীরাত, তারীখ এবং সালাফের জীবনচরিতের উপর লেখা হয়েছে শত শত গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং স্বতন্ত্র রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। স্পষ্টতই, দ্বীনী কিতাব নামে কেউ কোনো কিতাব লিখলেই তা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে– ব্যাপারটি এমন নয়। কোনো কিতাব নির্ভরযোগ্য ও পাঠকের উপযোগী হওয়ার জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত রয়েছে–

১. গ্রন্থকার বা সংকলক সুন্নতের অনুসারী ও সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া। যে লোক আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের 'মুতাওয়ারাছ আকীদা'[১] ও 'মুতাওয়ারাছ ফিক্র'[২] থেকে সরে গিয়ে 'শুযূয' (বিচ্ছিন্ন মত) অবলম্বন করেছে কিংবা যে লোক শরীয়ত ও সুন্নাহর পাবন্দ নয় তার রচিত বই সাধারণ পাঠকের পাঠযোগ্য নয়।

২. গ্রন্থে উল্লেখকৃত বিষয়াদি সামষ্টিক বিচারে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া। মানবরচিত কোনো গ্রন্থে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটিই থাকবে না– এটা সম্ভব

---

[১] যুগ পরম্পরায় চলে আসা দলিলসিদ্ধ ও স্বীকৃত ইসলামী আকীদা।

[২] দ্বীনের সেই মৌলিক বোধ ও রুচি-প্রকৃতি, যা যুগ পরম্পরায় দ্বীনের ধারক-বাহকদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছেছে।

নয়। সম্ভব নয় বলেই কোনো গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে এই শর্তারোপ করা যায় না যে, তাতে কোনো ভুল বা ত্রুটি থাকতে পারবে না। এ শর্তারোপ করলে আমরা কোনো কিতাবই পড়তে পারব না। অল্প-স্বল্প ভুল সব গ্রন্থেই থাকে। কারণ একজন লেখক যত বড় আলেম বা বুযুর্গই হোন না কেন তিনি মা'ছূম তো নন। তাই তার ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। এ কারণে এ ক্ষেত্রে শরয়ী উসূল হল, লেখক যদি শরীয়তের পাবন্দ ও সহীহ আকীদার অধিকারী হন, লেখায় কোনো 'ফিকরী শুযূয' (বিচ্ছিন্ন চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ) অবলম্বন না করে থাকেন এবং তার গ্রন্থটি সামষ্টিক বিচারে সহীহ ও সঠিক হয় অর্থাৎ সে গ্রন্থের মৌলিক বার্তা সঠিক হয়, তাতে বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি খুব বেশি পরিমাণে না থাকে তাহলে সে গ্রন্থকে নির্ভর করার মতো গ্রন্থ গণ্য করা হবে। এ গ্রন্থ পড়তে মানুষকে নিষেধ করা হবে না। তবে সে গ্রন্থের নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা বা নির্দিষ্ট কোনো মত সম্পর্কে যদি প্রমাণিত হয় যে, তা ইনসাফের অধিকারী এবং সব বিষয়ে সঠিক ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জুমহূর (অধিকাংশ) আহলে ইলমের মতে মুনকার[১] ও গলদ, তাহলে সেই রেওয়ায়েত বা সেই মত অবলম্বন করা ঠিক হবে না। গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে যেমন এই মুনকার রেওয়ায়েত বা মত গ্রহণ করা ঠিক হবে না, তেমনি এই ভুলের কারণে এ গ্রন্থ একেবারে বর্জন করাও ঠিক হবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শরয়ী মূলনীতি। যা সঠিকভাবে বোঝা ও ইলমী ময়দানে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা খুবই জরুরি।

আমাদের এ গ্রন্থ যারা পড়বেন তাদের কাছেও এ মূলনীতি স্পষ্ট থাকা জরুরি। এমনটি হওয়া সম্ভব, যে বর্ণনাগুলোকে এ গ্রন্থে আহলে ফনের (শাস্ত্রজ্ঞদের) বরাতে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে তার কোনো একটি বর্ণনা এমন কোনো গ্রন্থে পাওয়া গেল, যা শাস্ত্রজ্ঞদের মতানুসারে আপন শাস্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। মুসলিম উম্মাহ গ্রন্থটি থেকে আগেও উপকৃত হয়েছে এবং এখনও উপকৃত হচ্ছে। তো কেউ যদি আমাদের এ বইয়ে বর্ণনাটি থাকার কারণে ওই গ্রন্থটি সম্পর্কে 'যবান-দরাজি' করে অথবা মানুষের মনে (আপনশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ও উপকারী) সেই গ্রন্থটি সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করে তাহলে তার এই গলদ ও নিয়ম-পরিপন্থী কর্মপন্থার সঙ্গে আমাদের কোনো

[১] এখানে মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাস্ত্রীয় বিচারে তার 'নাকারাত' এত বেশি যে, তাকে 'মাতরূহ' বা 'মওযূ'-এর কাতারে ফেলতে হয়।

সম্পর্ক নেই। এ ধরনের লোকের জন্য আমরা দুআ করব, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে 'আকলে সালীম' (শুভবুদ্ধি) দান করেন, দ্বীনের সঠিক সমঝ দান করেন, সবধরনের প্রান্তিকতা থেকে বাঁচিয়ে ইতিদালের পথ (সঠিক ও মধ্যপথ) অবলম্বনের তাওফীক দান করেন।

তিন. নির্দিষ্ট রেওয়ায়েত মওযূ (জাল) হওয়া আর সংশ্লিষ্ট বিষয় একেবারে ভিত্তিহীন হওয়া এক কথা নয়

কোনো রেওয়ায়েত মওযূ হওয়া আর সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হওয়া এক কথা নয়। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টি দেখা কর্তব্য যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভিন্ন কোনো দলিল আছে কি না। ভিন্ন দলিল পাওয়া গেলে সরাসরি বিষয়টিকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া ঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি ভিন্ন দলিল না পাওয়া যায়, শুধু ওই মওযূ রেওয়ায়েতেই ওই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলে তা অবশ্যই ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে। তাই এমনটি হওয়া খুব সম্ভব যে, একটি রেওয়ায়েত মওযূ, কিন্তু তার বিষয়বস্তু বা বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট একটি অংশ ভিন্ন কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত। অথবা বিষয়টি-ই এতটা বাস্তবতা-সমর্থিত যে তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য ভিন্ন দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। এ ক্ষেত্রে শুধু রেওয়ায়েত মওযূ হওয়ার কারণে মূল বিষয়কে একেবারে 'রদ' করে দেওয়া ঠিক নয়।

যেমন, একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, পাগড়ি পরে নামায পড়লে প্রতি রাকাতে ২৫ রাকাত নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েত সর্বসম্মতিক্রমে মওযূ। প্রথম খণ্ডের নতুন সংস্করণে রেওয়ায়েতটিকে মওযূ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যদি কেউ এর দ্বারা এ কথা বুঝে যে, সাধারণ নামাযে বা জুমার নামাযে পাগড়ি পরার কোনো ভিত্তি নেই অথবা আল্লাহ মাফ করুন, এ কথা মনে করে যে, শরীয়তে পাগড়ি পরারই কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই তাহলে তা ওই ব্যক্তির অজ্ঞতা বলে বিবেচিত হবে। কারণ সহীহ হাদীস ও সাহাবা-তাবেঈনের আমল দ্বারা নামাযে পাগড়ি পরার কথা প্রমাণিত আছে। পাগড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের পোশাকের অংশ ছিল– এটা 'তাওয়াতুর' (অসংখ্য সূত্র) দ্বারা প্রমাণিত। তাই ভালোভাবে বোঝা দরকার, কোনো রেওয়ায়েতকে মওযূ বা ভিত্তিহীন বলার অর্থ শুধু এই যে, এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। এটিকে হাদীসে রাসূল হিসেবে

উল্লেখ করা জায়েয নয়। বাকি থাকল এই রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু। সেটা আলাদাভাবে তাহকীক করতে হবে যে, এই রেওয়ায়েতের কোনো অংশ ভিন্ন দলিল দ্বারা প্রমাণিত কি না। যেমন, উপরিউক্ত পাগড়ির রেওয়ায়েতে কয়েকটি বিষয় আছে–

ক. পাগড়ি ইসলামী লেবাস।

খ. নামাযে পাগড়ি পরা 'মাশরূ' হওয়া।

গ. জুমার নামাযের জন্য বিশেষভাবে পাগড়ি পরা।

ঘ. পাগড়ির বদৌলতে প্রতি রাকাতে পঁচিশ রাকাতের সওয়াব হওয়া।

প্রথম দুটি বিষয় হাদীস ও আছার দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস ও আছারে এগুলোর পক্ষে দলিল-প্রমাণ আছে। তৃতীয় বিষয়ে আমার জানামতে স্বতন্ত্র কোনো দলিল নেই। তবে যাদের পাগড়ি পরার অভ্যাস আছে তারা জুমার দিন অবশ্যই পাগড়ি পরবেন। কারণ বিভিন্ন মজলিসই পাগড়ি পরার বিশেষ স্থান। তাই এ তৃতীয় বিষয়টিও মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত। বাকি থাকল চতুর্থ বিষয়, যা এই মওযূ রেওয়ায়েতটির মুখ্য বিষয়, তা অন্য কোনো হাদীসে আসেনি; না সহীহ হাদীসে, না যয়ীফ হাদীসে। এই রেওয়ায়েত যেহেতু মওযূ, আর এ বিষয়টিও অন্য কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই বিষয়টিও ভিত্তিহীন। অর্থাৎ উল্লিখিত রেওয়ায়েতটিও প্রমাণিত নয় এবং পাগড়িসহ এক রাকাত নামাযে পচিশ রাকাত নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়– এমন কোনো কথাও প্রমাণিত নয়। প্রথমটিও ভিত্তিহীন দ্বিতীয়টিও ভিত্তিহীন। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাও ঠিক নয় যে, শরীয়তে পাগড়ি পরার কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই কিংবা জুমার নামাযে পাগড়ি পরা 'মাশরূ' নয়। এই অনুধাবন সম্পূর্ণ ভুল। এভাবে প্রত্যেক মওযূ রেওয়ায়েত সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

কোনো রেওয়ায়েত হাদীস না হওয়া আর সে রেওয়ায়েতে উল্লেখকৃত কথা গলদ বা ভিত্তিহীন হওয়া– দুটো যেহেতু এক কথা নয়, তাই 'এসব হাদীস নয়'-এর উভয় খণ্ডেই অধিকাংশ রেওয়ায়েতের সনদগত মান উল্লেখ করার পর রেওয়ায়েতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুধী পাঠকের কাছে আবেদন থাকবে, তারা যেন প্রতিটি রেওয়ায়েত সম্পর্কে উল্লেখকৃত পুরো আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়েন, যেন কোনো ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কা না থাকে।

চার. কোনো রেওয়ায়েত জাল বা ভিত্তিহীন বলার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা উচিত

প্রথম খণ্ডের ভূমিকার শেষদিকে আমি লিখেছিলাম, যেমনিভাবে মওযূ রেওয়ায়েতকে হাদীস মনে করা গোনাহ, মওযূ বর্ণনা প্রচার করা একটি বড় ফেতনা, তেমনি সহীহ্ হাদীসকে 'বাতেল' বা ভিত্তিহীন বলে দেওয়াও একটি বড় ফেতনা। মওযূ বর্ণনাকে হাদীসে রাসূল বলে দেওয়ার ফেতনার চেয়ে হাদীস হিসেবে প্রমাণিত রেওয়ায়েতকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়ার ফেতনা কম ভয়াবহ নয়।

প্রাচ্যবিদ, মুনকিরে হাদীস, যুক্তিপূজারী আধুনিকতাবাদী, উগ্রপন্থী বেদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের সবসময়কার নীতি হল, কোনো হাদীসের বক্তব্য তাদের বক্রবুদ্ধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হলেই তারা তা মানতে প্রস্তুত হয় না, শাস্ত্রীয় বিচারে সে হাদীস যত উচ্চ পর্যায়ের সহীহই হোক না কেন। কিন্তু তারা এটাও চায় না যে, তাদের উপর 'ইনকারে হাদীস' বা হাদীস অস্বীকারের অভিযোগ উঠুক। তাই হাদীস অস্বীকারের এই বিরুদ্ধ প্রয়াসকে ঢাকার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। সহীহ্ হাদীসকে 'মুনকার', 'বাতেল', 'মওযূ' বা অন্য কোনো নাম দিয়ে অস্বীকার করে। ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এ ধরনের লোকদের বক্তব্য জোরালো ভাষায় খণ্ডন করে আসছেন। ইমাম ইবনে কুতায়বা রহ. রচিত 'তা'বীলু মুখতালিফিল হাদীস' এর একটি উজ্জ্বল নমুনা। আমাদের উস্তায মুফতী ওলী হাসান টুংকী রহ. তাঁর ভাষণসংকলন 'ফিতনায়ে ইনকারে হাদীস : এ্যাক আযীম ফেতনা'-এ হাদীস অস্বীকারের উপরিউক্ত দিকগুলো সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যা হোক, এই ফেতনা তো সৃষ্টি হয়েছিল 'মুলহিদ' মানসিকতার কারণে, কিন্তু এখন অন্য একটি ফেতনা, যা সম্ভবত নেক নিয়তেই করা হচ্ছে, আমাদের দেশে প্রসার লাভ করছে। সেটা হল কোনো রেওয়ায়েত মওযূ বলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতার পরিচয় না দেওয়া, এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও প্রান্তিকতার শিকার হওয়া। এই ফেতনা সৃষ্টির কারণ তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীনের অভাব, উলূমুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে 'বাসীরত'-এর কমতি এবং নিজ দল ও মতের প্রতি অবচেতনমনে কৃত না-হক পক্ষপাত।

এই ফেতনার কিছু দিক নিম্নরূপ–

ক. মুখতালাফ ফীহ সহীহ্ হাদীসের [১] সঙ্গে 'যয়ীফ' হাদীসের মতো কর্মপন্থা অবলম্বন।

খ. মুতালাক্কা বিল কবুল যয়ীফ [২] ও যয়ীফে মুনজাবির [৩] হাদীসের সঙ্গে সাধারণ যয়ীফ হাদীসের মতো কর্মপন্থা অবলম্বন।

গ. যয়ীফ বর্ণনা ও মওযূ বর্ণনাকে এক কাতারে নিয়ে যাওয়া। যেখানে যয়ীফ বর্ণনা বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে সেখানেও যয়ীফকে রদ করে দেওয়া।

ঘ. নির্দিষ্ট রেওয়ায়েত যয়ীফ হওয়ার কারণে রেওয়ায়েতে উল্লেখকৃত পুরো বিষয়বস্তু বা বিধানকেই রদ করে দেওয়া। অথচ বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভিন্ন দলিল আছে।

ঙ. যথাযথ অনুসন্ধান না করে কিংবা অসম্পূর্ণ অধ্যয়নের ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া।

মন চাচ্ছিল, এই সবগুলো বিষয় সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করি, কিন্তু তা করলে এই ভূমিকা আর ভূমিকা থাকবে না, স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়ে যাবে। সুধী পাঠক যদি শায়খ আলবানী রহ.-এর 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল-মাওযূআ' সম্পর্কে লিখিত আমার সেই প্রবন্ধটি পড়েন, যা 'আলকাউসার' (১ম ভলিয়ম, রজব ও শাবান সংখ্যা, ১৪২৬ হি.)-এ প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলে ইন্শা-আল্লাহ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা জানতে পারবেন। মুযাফফর বিন মুহসিন কৃত (আল্লাহ তাকে সকল ফেতনা-ফাসাদ ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন) 'জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায'-এ উল্লেখিত বাড়াবাড়িগুলোর প্রায় সবগুলোই পাওয়া যাবে। মুযাফফর বিন মুহসিনের এ কিতাব সম্পর্কে জানতে চেয়ে পাঠানো একটি চিঠির জবাবে হযরত মাওলানা আবদুল গাফফার সাহেব লিখিত জবাবি চিঠির যে অংশ আলকাউসার (১১তম ভলিয়ম, আগস্ট ও ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৪ ঈ.)-এ ছাপা হয়েছে, তা থেকে সুধী পাঠক হয়তো কিছুটা ধারণা লাভ করে থাকবেন।

---

[১] মুখ্তালাফ ফীহ সহীহ হাদীস : যে হাদীস সহীহ কি যয়ীফ– এ ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে দলিলের আলোকে মতভেদ আছে। কারও মতে সহীহ, কারও মতে যয়ীফ।

[২] মুতালাক্কা বিল-কবুল যয়ীফ : যে বর্ণনার সনদ যয়ীফ, কিন্তু তার মর্ম স্বীকৃত ও অনুসৃত।

[৩] যয়ীফে মুনজাবির : যে বর্ণনার সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে, কিন্তু তার শব্দগত বা অর্থগত সমার্থক বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ ফেতনার আরও দু'টি দিক উল্লেখ করে আমরা সামনের কথায় যাব :

(১) যে রেওয়ায়েতের ব্যাপারে খোদ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, রেওয়ায়েতটি 'হাসান' পর্যায়ের, না 'যয়ীফ'; বেশি দুর্বল, না চলার মতো কিংবা রেওয়ায়েতটি যয়ীফ না মওযূ– এ ধরনের রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে একটি মত অবলম্বন করে ভিন্নমতাবলম্বীকে 'জাহেল' বা 'গোমরাহ' সাব্যস্ত করে দেওয়া, অথচ ভিন্ন মতটি প্রথম মতের মতোই শক্তিশালী কিংবা ভিন্ন মতটি 'মারজূহ' হলেও একটি 'মুজতাহাদ ফীহ' রায়ের মর্যাদা রাখে। সেটিকে এমন ভুলের কাতারে ফেলা যায় না, যাকে 'যাল্লাত' (নিশ্চিত ভুল) বলা চলে।

তবে হ্যাঁ, ভিন্ন মতটি যদি যাল্লাতের পর্যায়ে পড়ে তাহলে তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কোনো আলেমের ব্যাপারে যদি জানা যায় যে, তিনি হঠকারিতা করে নয়, নেক নিয়তে ভুলক্রমে সেই মত অবলম্বন করেছেন তাহলে আদবের সঙ্গে তার ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কারণে তাকে জাহেল বা গোমরাহ তো বলা যাবে না।

(২) কোনো যয়ীফ রেওয়ায়েত বা কোনো ঘটনা বা কাহিনীতে শিরকি কথা আছে বলে অমূলক দাবি উত্থাপন করা, এরপর এই অজুহাতে রেওয়ায়েতটি মওযূ বা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা এবং ওই রেওয়ায়েত বা ঘটনা যে কিতাবে আছে সে কিতাবকে শিরক ও মওযূ রেওয়ায়েতের কিতাব সাব্যস্ত করা।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর ফাযায়েলের কিতাবগুলোর উপর কিছু কট্টরপন্থী লোক যে আপত্তিগুলো উত্থাপন করে থাকে তার অধিকাংশের মূলেই আছে এ দু'টি বিষয়। আপত্তি উত্থাপনকারীরা যদি এই বাড়াবাড়ি ছাড়তে পারতেন তাহলে এই আপত্তিগুলোর অধিকাংশ তারা নিজেরাই ফিরিয়ে নিতেন এবং আপত্তি উত্থাপন ও গালমন্দের পথ ছেড়ে আলোচনা ও কল্যাণকামিতার পথ অবলম্বন করতেন।

ভূমিকার এই চতুর্থ শিরোনাম দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। সম্ভব হলে অন্য কোনো সময় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ। এখানে এটুকু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

পাঁচ. মওযূ রেওয়ায়েত পরিহারের উপায়

মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত থেকে বাঁচার উপায় হল, প্রথমে নির্ভরযোগ্য ও বা-খবর কোনো আলেমে দ্বীনের সঙ্গে পরামর্শ করে দু'তিনটি সহীহ হাদীসের

কিতাব নির্বাচন করা। এরপর সেগুলো বারবার পড়া ও বোঝার চেষ্টা করা। এভাবে ধারাবাহিক পড়তে থাকলে একসময় মুখস্থ হয়ে যাবে কিংবা মুখস্থের মতো হয়ে যাবে। এর ফলে সহীহ হাদীসের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠবে। নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে হাদীসের শিক্ষা কী– জানার দরকার পড়লে সে কিতাবগুলো থেকে বের করতে পারবে।

এর বাইরে কোনো বর্ণনা শুনতে পেলে বা বরাত ছাড়া কোনো জায়গায় কোনো বর্ণনা পেলে বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য কি না, তা হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্ক কোনো আলেমে দ্বীনের কাছ থেকে যাচাই করে নেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যাচাই সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ তা বর্ণনা করা যাবে না। যিনি হাদীস বলবেন তিনি বলার আগে শাস্ত্রজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়ে যাচাই করে নেবেন। আর যিনি শুনছেন তিনি কানে যা-ই পড়ছে তা-ই সহীহ ও সঠিক মনে করা থেকে বিরত থাকবেন। সমাজে মওযূ ও ভিত্তিহীন বর্ণনার যে সয়লাব দেখা যায় শুধু এই মূলনীতি মেনে চললেও তা অনেকাংশে কমে আসবে।

উপরের স্তরের তালেবে ইলমগণ যদি চেষ্টা করেন তাহলে তাদের জন্য মওযূ রেওয়ায়েত থেকে বাঁচা খুবই সহজ। তারা যদি–

ক. মন দিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন মজীদ মুতালাআ করেন।

খ. নির্ভরযোগ্য কোনো তাফসীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন।

গ. সহীহ হাদীস ও সহীহ আছারের নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থগুলো বারবার মুতালাআ করেন, তাহলে সহীহ হাদীসের ইলম যেমন হাসিল হবে, তেমনি 'কাওয়ায়েদে শরীয়ত' এবং হাদীসের উসলূব ও শৈলীর সঙ্গেও তার এক ধরনের মুনাসাবাত তৈরি হয়ে যাবে। এর ফলে তার সামনে 'আজনবী' কোনো রেওয়ায়েত আসলে তার মনে খটকা লাগবে। এই খটকাই তাকে তাহকীকের দিকে নিয়ে যাবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে তাহকীক করলে এক সময় সে হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

তালেবে ইলমরা এ ক্ষেত্রে আহাদীসে মুশ্‌তাহিরা, আহাদীসে মাওযূআ এবং কুতুবুত তাখারীজ থেকে উপকৃত হতে পারেন। এ তিন ফনের নির্বাচিত ও নির্ভরযোগ্য কিছু কিতাব বারবার পড়লে ইন্‌শা-আল্লাহ এ পরিমাণ যওক ও রুচিবোধ তৈরি হয়ে যাবে, যার বদৌলতে মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত তারা সহজেই বের করে ফেলতে পারবে। তবে শাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা

এবং জটিল স্থানসমূহে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। কিতাব সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, উস্তাযের বিকল্প হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে মোল্লা আলী কারী রহ. রচিত 'আলমাসনূ ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওযূ', ইবনুল কাইয়িম রহ. রচিত 'আলমানারুল মুনীফ ফিস সহীহি ওয়ায-যয়ীফ' (উভয়টি শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর ভূমিকা ও টীকাসহ) শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. কৃত 'আলমাকাসিদুল হাসানা ফী বয়ানি কাসীরিম মিনাল আহাদীসিল মুশ্‌তাহিরা আলাল আলসিনাহ' অধ্যয়ন বিশেষ উপকারী হবে। মোটকথা, মওযূ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা থেকে বাঁচতে হলে কমপক্ষে তিনটি কাজ করতে হবে–

১. কোনো রেওয়ায়েত সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে না-জানা যাবে যে রেওয়ায়েতটি নির্ভরযোগ্য, ততক্ষণ তা বর্ণনা করা যাবে না।

২. মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো কিতাব মুতালাআ করবে। যার জন্য যেটা মুনাসিব সে সেটা মুতালাআ করবে।

৩. সহীহ হাদীসের ইলম হাসিল করবে। যে কিতাবসমূহে শুধু নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে, অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত তাতে খুবই কম, এমন কিতাব বারবার মুতালাআ করবে। এখন প্রশ্ন হল, সহীহ হাদীসের ইলম কীভাবে হাসিল করবে?

ছয়. সহীহ হাদীসের ইলম কীভাবে এবং কোত্থেকে হাসিল করবে

হাদীসের কিতাবসমূহ বিভিন্ন ধরনের। সব ধরনের কিতাব সব শ্রেণির পাঠকের উপযোগী নয়। কারণ সব শ্রেণির মানুষ সব ধরনের কিতাব থেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারে না। সব শ্রেণির পাঠকের উপযোগী কিছু কিতাবের নাম নিম্নে দেওয়া হল–

১. আলআদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.)
২. রিয়াযুস সালেহীন, ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.)
৩. আলআযকার, ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.)
৪. আলহিসনুল হাসীন, ইবনুল জাযারী (৭৫১-৮৩৩ হি.)
৫. আশ্‌শামায়েল, ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.)
৬. মিন মায়ীনিশ শামায়েল, সালেহ আহমদ শামী
৭. মাআরেফুল হাদীস, মুহাম্মদ মনযূর নোমানী (১৩২৩-১৪১৭ হি.)

৮. তরজমানুস সুন্নাহ, বদরে আলম মিরাঠী (১৩১৬-১৩৮৫ হি.)
৯. হাদীসের আলো, মুহিউদ্দীন ইবনে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা
১০. মুন্তাখাব হাদীস, নির্বাচন : হযরতজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী (১৩৩৫-১৩৮৪ হি.) এ কিতাবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. (১৩১৫-১৪০২ হি.)এর ফাযায়েলের কিতাবগুলোর উত্তম খুলাসা চলে এসেছে।
১১. হাদীসের আলো জীবনের পাথেয়, তরজমা : উম্মে আবদুল্লাহ, ব্যাখ্যা : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ
১২. ফাযায়েলে যিন্দেগি, মুহাম্মদ হেমায়েতুদ্দীন
১৩. ফিকহুস সুনানি ওয়াল-আছার, আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
১৪. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, মাওলানা আবদুল মতীন
১৫. নবীজীর নামায, ইলিয়াস ফয়সাল, মদীনা মুনাওয়ারা, অনুবাদ : যাকারিয়া আবদুল্লাহ, প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ

এর মধ্যে কিছু কিছু কিতাবে তো হাদীসের সঙ্গে হাদীসের বাংলা অনুবাদও আছে। অন্য কিতাবগুলোর অধিকাংশেরই বাংলা কিংবা ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে। যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছি– এই কিতাবগুলো সব ধরনের পাঠকের উপযোগী। এ ধরনের কিতাব আরও আছে। এখানে খুব সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

এ কিতাবগুলোর ক্ষেত্রেও সতর্কতা হল, এগুলো কোনো আলেমে দ্বীনের তত্ত্বাবধানে পড়বে। কোনো স্থানে প্রশ্ন জাগলে নিজে দেমাগ খরচ না করে তাদের কাছ থেকে বুঝে নেবে। এই অধ্যয়ন থেকে লব্ধ ইলমের মাধ্যমে নিজের ঈমান তাজা করবে এবং আমল করবে, কিন্তু খবরদার ইজতিহাদ করতে যাবে না।

আর হাদীসের ইলমী ও তাহকীকী কিতাব যেগুলো আছে সেগুলো সব শ্রেণির পাঠকের জন্য নয়। উদাহরণত মুআত্তা মালেক, আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবুল আছার, মুসনাদে আবু হানীফা, মুআত্তা মুহাম্মদ, মুসনাদে শাফেঈ, মুসনাদে আহমদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, শরহু মাআনিল আছার (তহাবী শরীফ) এগুলোর অধিকাংশেরই কিংবা হয়ত সবগুলোরই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা হল, এ কিতাবগুলো থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য অনেক ইলম ও আকল প্রয়োজন। দ্বীনী মাদারেসের তালেবে ইলমগণ দশ-

এগারো বছর পড়ালেখা করার পর এ কিতাবগুলো পড়ে। সে পড়াও তারা নিজে নিজে পড়ে না, বরং বড় বড় উস্তাযবৃন্দের কাছে এক সবক এক সবক করে পড়ে। একজন স্কলার, তিনি যত বড় স্কলারই হোন না কেন, তরজমার সাহায্যে যতটুকু বুঝতে পারেন এই তালেবে ইলমগণ এমনিতেই আরবী কিতাব তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। তার পরও এসব কিতাব তাদের বড় বড় উস্তাযবৃন্দের কাছে পড়তে হয়।

কোনো কিতাব নিজস্ব ভাষায় ভাষান্তর হলেই সেটা পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব– এ ধারণা খামখেয়ালি ছাড়া কিছু নয়। তাহলে তো স্রেফ অনুবাদের বদৌলতেই মানুষ সব শাস্ত্র শিখে ফেলত। এখন তো অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তরজমার মাধ্যমে শুধু নিজে পড়া ও বোঝাই নয়, তরজমা-নির্ভর এই ঝুঁকিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করা হচ্ছে, জটিল ও মতভেদপূর্ণ মাসআলায় রায় প্রদান করা হচ্ছে। এরপর নিজের রায় ও ইজতিহাদের দিকে এ ভাষায় দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে– 'আমার মত মানলেই তুমি হাদীসের উপর আমল করতে পারবে, 'আমেল বিল-হাদীস' তথা হাদীসের উপর আমলকারী হতে পারবে, নতুবা নয়।' কেউ কেউ এ ভাষায় দাওয়াত দিচ্ছে– 'আমার কথা শুনবে তো আসল শরীয়ত ও আসল ফিক্‌হ পাবে, নতুবা নয়।'

অনেকদিন থেকে ইচ্ছা, 'স্রেফ অনুবাদ-নির্ভর জ্ঞান ঝুঁকিপূর্ণ' এই শিরোনামে বিস্তৃত আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখব। কিন্তু এখনও সুযোগ পাইনি। আল্লাহর কোনো বান্দা যদি এ বিষয়ে কলম ধরেন তাহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমত হবে।

হাদীস শরীফের একটি বিশেষ অধ্যায়ের নাম 'মুখ্‌তালিফুল হাদীস'। মুখ্‌তালিফুল হাদীসের ক্ষেত্রে কর্মনীতি কী হবে সেটা জানতে অধমের রচিত 'উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা' পড়া যেতে পারে। সহীহ বুখারীসহ হাদীসের অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলিতে 'মুখতালিফুল হাদীস' ও 'মুশকিলুল হাদীস' এ দুই অধ্যায়ের অনেক হাদীস রয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবং যথাযথ অনুধাবন করার জন্য শুধু তরজমা যথেষ্ট নয়। এ কিতাবগুলো বোঝার জন্য প্রথমত ইলমে উসূলুল হাদীস, ইলমে উসূলুল ফিক্‌হ, ইলমুল জারহি ওয়াত-তা'দীল, ইলমু ইলালিল হাদীস প্রভৃতি শাস্ত্র জানা থাকা

জরুরি। এরপর স্বতন্ত্র ও বিস্তারিতভাবে প্রত্যেক হাদীসের ব্যাখ্যা জানা জরুরি। এই শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো যদি এক সবক এক সবক করে পড়ার হিম্মত বা সুযোগ না হয় তাহলে একমাত্র পথ হল, এ কিতাবগুলো থেকে অবস্থাভেদে সব শ্রেণির পাঠকের উপযোগী করে এক বা একাধিক সংকলন তৈরি করা। এতে প্রত্যেক হাদীসের সঙ্গে হাদীসটির সহজ-সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও উল্লেখ করা হবে। এই শাস্ত্রীয় কিতাবগুলোর অনুবাদ তো হয়েছে, সে অনুবাদ মানোত্তীর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক, কিন্তু আমার জানা মতে এই জরুরি কাজটি এখনও হয়নি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

পড়াশোনার আগ্রহ থাকা ভালো। কিন্তু এ আগ্রহকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগানো উচিত। যদি সরাসরি ফন্নী ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পড়ারই আগ্রহ হয় তাহলে সেই পঠন অনুবাদের সহায়তায় কেন হবে? এর জন্য প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় প্রাথমিক জ্ঞান কেন অর্জন করা হয় না? কেন তিনি উস্তাযের শরণাপন্ন হন না?

যাই হোক, কথা লম্বা হয়ে গেল। আমি বলছিলাম, সহীহ হাদীস অধ্যয়ন করা এমনিতেও জরুরি। মওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত থেকে বাঁচার জন্যও জরুরি। এ জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং যার জন্য যে পদ্ধতি মুনাসিব হয় সে পদ্ধতি অনুসারে সহীহ হাদীসের ইলম হাসিল করা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন।

সাত. মর্ম জাল করাও গোনাহ

এ গ্রন্থ থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য উল্লিখিত ছয়টি কথা বলা জরুরি ছিল। এ জন্যই তা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ভুল ধারণা এবং একটি ভুল কর্মনীতির সংশোধনের জন্য আরেকটি কথা বলে দেওয়াও মুনাসিব মনে হচ্ছে–

হাদীস জাল করার অর্থ হল, আরবী ভাষায় নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা তৈরি করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দেওয়া। মৌলিকভাবে 'হাদীস জাল করা' বলতে এটি বোঝানো হয়। কিন্তু 'হাদীস জালকরণ' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো ভাষায় কোনো কথা তৈরি করে তা রাসূলের দিকে সম্বন্ধিত করে বর্ণনা করাও হাদীস জাল করার

অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে অন্য কারও জাল করা বর্ণনা জেনে-বুঝে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করাও হাদীস জাল করার নামান্তর।

তদ্রূপ কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার স্বীকৃত ও সহীহ অর্থ বদলে দিয়ে 'আজনবী' কোনো অর্থ তাতে চাপিয়ে দেওয়া, যে অর্থ কোনোভাবেই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হতে পারে না– এটিও রাসূলের উপর মিথ্যাচারের শামিল এবং হাদীস জাল করার নিকৃষ্টতম প্রকার। কারও উপর মিথ্যারোপের ক্ষেত্রে শব্দ-বাক্য মুখ্য থাকে না, মর্ম ও বিষয়বস্তুই এ ক্ষেত্রে মূল। শব্দ তো অর্থের বাহন। তাই সহীহ হাদীসের 'মুতাওয়ারাছ ও মুজমা আলাইহি' অর্থ (যুগ পরম্পরায় চলে আসা স্বীকৃত ও সর্বসম্মত অর্থ) বদলে দেওয়া বা কোনো সহীহ হাদীসের এমন কোনো অর্থ উদ্ভাবন করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই, আর সরাসরি হাদীস জাল করা একই পর্যায়ের অপরাধ। কারণ এ সবগুলোই রাসূলের উপর মিথ্যারোপের বিভিন্ন প্রকার।

আরেকটি বিষয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা যেমন কঠিন একটি কবীরা গোনাহ, তেমনি আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করাও কবীরা গোনাহ। বস্তুত রাসূলের উপর মিথ্যারোপ আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপেরই নামান্তর।

এমনিভাবে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে মিথ্যাচার করা, অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো শরয়ী মাসআলা অস্বীকার করা, শরয়ী কোনো দলিল ছাড়াই শুধু প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে শরীয়তে নতুন কিছু দাখেল করা, আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তে মনগড়াভাবে সংযোজন-বিয়োজন করা– এগুলো সব জুলুম। এগুলো যারা করে তারা সবাই জালেম। যেমন কতিপয় আধুনিকতাবাদী পর্দা, সুদ, সিয়াসাত, জিহাদ, শরয়ী দণ্ডবিধি ইত্যাদি অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করে কিংবা বিকৃত করার অপচেষ্টা করে। বিকৃত করার এই অপচেষ্টা মূলত মিথ্যাচার। এরা মূলত মিথ্যাচারী-দাজ্জাল।

কুরআন কারীমের মনগড়া তাফসীর করা, কোনো আয়াতের অকাট্য ও 'মুতাওয়ারাছ' (যুগযুগ ধরে চলে আসা স্বীকৃত) মর্ম বদলে দেওয়া অথবা কোনো আয়াতের এমন অর্থ করা যার সঙ্গে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের কোনো মিল নেই– এগুলোও মিথ্যারোপের নিকৃষ্টতম প্রকার। হাদীস

শরীফে একে 'তাফসীর বির-রায়' বলা হয়েছে এবং এর ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সব ধরনের মিথ্যা থেকে রক্ষা করুন। বিশেষভাবে আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূলের নামে, আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর (কুরআন হাদীসের) নামে, আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত শরীয়তের নামে মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা করুন। অন্যের বানানো মিথ্যা কথা প্রচার করা থেকেও আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

মোটকথা, আমাদের শুধু মওযূ হাদীস থেকে নয়, মওযূ তাফসীর, মওযূ অনুবাদ, মওযূ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মওযূ মাসআলা, কোনো ইসলামী আকীদা এবং দ্বীনী কোনো পরিভাষার মওযূ বা বিকৃত উপস্থাপন– সর্বপ্রকার মওযূ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে এবং এ সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করতে হবে।

যার আগ্রহ আছে এবং সুযোগ আছে তার জন্য এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু তাফসীর মুতালাআ করা মুনাসিব হবে, যেমন মুফতী শফী রহ. কৃত মাআরেফুল কুরআন, শাব্বীর আহমদ উসমানী কৃত তাফসীরে উসমানী, মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী কৃত তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন। এমনিভাবে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে মৌলিক কিছু কিতাব পড়া। যেমন–

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. রচিত–

ক. দুস্তূরে হায়াত।

খ. আরকানে আরবাআ।

গ. তাযকিয়া ও ইহসান, তাসাওউফ ও সুলূক।

ঘ. মানসাবে নুবুওয়্যত আওর উস কে আলী মাকাম হামিলীন।

ঙ. আসরে হাযের মে দ্বীন কী তাফহীম ও তাশরীহ।

চ. মা-যা খাসিরাল আলামু বিন্‌হিতাতিল মুসলিমীন।

ছ. মুসলিম মামালেক মে ইসলামিয়্যাত আওর মাগরিবিয়্যাত কি কাশ্‌মাকাশ।

জ. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত।

বিশেষ করে প্রথমোক্ত দুই কিতাব।

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী রহ. রচিত–

ক. মাআরেফুল হাদীস।

খ. কুরআন আপ সে কেয়া ক্যাহতা হ্যায়?
গ. ইসলাম কেয়া হ্যায়?
ঘ. দ্বীন ও শরীয়ত।
ঙ. কাদিয়ানী কিউঁ মুসলমান নেহী।

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম রচিত–
ক. ঈসায়িয়্যাত কেয়া হ্যায়?
খ. যিক্র ও ফিক্র।
গ. হামারে আয়িলী মাসায়েল।
ঘ. উলূমুল কুরআন।
ঙ. ইসলাম আওর জিদ্দত পসন্দী।
চ. হুজ্জিয়্যাতে হাদীস।
ছ. যবতে বিলাদাত কি শরয়ী হাইছিয়্যাত।
জ. সুদ পর তারীখী ফায়সালা।

ড. খালেদ মাহমুদ কৃত–
ক. মুতালাআয়ে বেরেলবিয়্যাত
খ. আছারুত তাশরী' ।
গ. আছারুল হাদীস।

হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.এর–
ক. ইসলাহুর রুসূম।
খ. আগলাতুল আওয়াম।[১]
গ. ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত।
এবং তাঁর খুতুবাত, মালফূযাত ও মুআল্লাফাত থেকে নির্বাচিত কিছু কিতাব যেমন–
ঘ. তাসহীলুল মাওয়ায়েয।
ঙ. আশরাফুল জওয়াব।
চ. মাআরেফে হাকীমুল উম্মত।
ছ. বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত।

---

[১] 'প্রচলিত ভুল' বিভাগটি এ ধারারই একটি প্রয়াস। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা পাঠককে উপকৃত করুন এবং বিভাগটি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখুন, আমীন।

জ. মাআছিরে হাকীমুল উম্মত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন।

এ কয়েকটি নিবেদন উল্লেখ করেই এই ভূমিকা শেষ করছি। এখন শুধু কিতাব সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

কিতাব সম্পর্কে কিছু কথা

১. প্রথম খণ্ডে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছিল–

ক. বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে মওযূ রেওয়ায়েত প্রচলিত নয় তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ যে মওযূ বা জাল রেওয়ায়েত সাধারণ মানুষ জানে না, তা উল্লেখ করে মানুষকে পেরেশান করার কী অর্থ? অযথা কাজ বাড়ানোর কী প্রয়োজন? বর্তমান খণ্ডেও এ বিষয়টি লক্ষ রাখা হয়েছে।

খ. কোনো রেওয়ায়েত মওযূ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে মতভেদ থাকলে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, 'মওযূ নয়' এ মতটি শুধু 'মারজূহ'ই নয় বরং গলদ, তাহলে সে ক্ষেত্রে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শর্তটিও বর্তমান খণ্ডে রক্ষিত হয়েছে।

গ. প্রথম খণ্ডে একটি শর্ত ছিল, ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত সম্পর্কে কোনো না কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদের বরাত উল্লেখ করা। এ কারণে প্রথম খণ্ডে প্রায় সব রেওয়ায়েত সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদদের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে।

এ খণ্ডেও অধিকাংশ রেওয়ায়েত সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদদের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ খণ্ডে নমুনাস্বরূপ এমন কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা একেবারেই 'হাওয়াই' এবং বর্ণনা ও বিষয়বস্তুও এত মুনকার ও আপত্তিকর যে, সেগুলো মওযূ বা ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অনারবরা এগুলো বানানোর কারণে মুহাদ্দিসীনে কেরামের আদালতে এগুলো উত্থাপিতই হয়নি। তাই এগুলো সম্পর্কে তাঁরা মতামতও দিতে পারেননি। এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসদের বরাত কীভাবে পেশ করব? এসব নতুন বর্ণনা সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের বরাত উল্লেখ করা তো অসম্ভব। এরপরও সতর্কতার খাতিরে আমরা এসব রেওয়ায়েত সম্পর্কে দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান এবং একাধিক বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরামর্শ করেছি।

২. আগে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এসব হাদীস নয়'-এর উভয় খণ্ডেই উল্লেখকৃত বর্ণনাসমূহের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রাসঙ্গিকভাবে অনেক সহীহ হাদীসও উল্লেখ করতে হয়েছে। এ কিতাবের মূল বিষয়বস্তু যেহেতু মওযূ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা, তাই আশঙ্কা আছে, কেউ যদি পুরো আলোচনা মনোযোগ দিয়ে না পড়ে তাহলে সহীহ হাদীসকে মওযূ কিংবা মওযূ বর্ণনাকে সহীহ হাদীস ভেবে বসতে পারে। কারণ অনেকের অভ্যাস আছে, কিতাব বুঝেশুনে না পড়ে শুধু পাতা উল্টে যাওয়া। এরপর এই পাতা উল্টানোর উপর ভিত্তি করে শুধু যে নিজে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয় তাই নয়, অন্যদের উপর আপত্তিও তুলতে থাকে। এ কারণে উভয় খণ্ডে গুরুত্বের সঙ্গে রেওয়ায়েতের সনদগত মান স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে। যেমন, প্রত্যেক রেওয়ায়েতের শুরুতে মোটা হরফে লেখা হয়েছে, 'জাল বর্ণনা' বা 'ভিত্তিহীন বর্ণনা'। সহীহ হাদীসগুলোর শুরুতে তৃতীয় বন্ধনীতে 'সহীহ হাদীস' লিখে দেওয়া হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহীহ হাদীসের আরবী পাঠ উৎসগ্রন্থের বরাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

স্মর্তব্য, এখানে 'সহীহ' শব্দ পারিভাষিক অর্থে (যার মধ্যে হাসান পর্যায়ের রেওয়ায়েতকেও শামিল করা হয় না) ব্যবহৃত হয়নি। এখানে 'সহীহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'নির্ভরযোগ্য বর্ণনা', যার মধ্যে সহীহ, হাসান, সালেহ লিল-আমল (আমলযোগ্য) এই তিন ধরনের বর্ণনা শামিল।

৩. মওযূ ও ভিত্তিহীন বর্ণনার অন্ত নেই। তাই এ ধারণা করা মোটেই ঠিক হবে না যে, এ দু'খণ্ডে সব মওযূ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা চলে এসেছে। আমরা শুধু নমুনাস্বরূপ কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছি।

মানুষ ফোনে এমন সব আশ্চর্য বর্ণনার কথা জিজ্ঞাসা করে যার সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের হাদীস একেবারে মিলে যায়–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ، وَلَاآبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَايُضِلُّوْنَكُمْ، وَلَايَفْتِنُوْنَكُمْ.

[সহীহ হাদীস] আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শেষ যমানায় কিছুসংখ্যক মিথ্যাচারী দাজ্জাল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের কাছে এসে এমন সব কথা বলবে, যা না

তোমরা শুনেছ আর না তোমাদের পূর্বপুরুষরা। তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে, তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে। যেন তারা তোমাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট না করতে পারে।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭

মানুষের এসব প্রশ্নের আমাদের কাছে একটাই জবাব, 'ভাই আমরা তো এই রেওয়ায়েত কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে পাইনি। নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের কাছেও শুনিনি।' কেউ কেউ এরপরও বলে, 'একটু তালাশ করে দেখুন না।' তাদের খবর নেই যে, এ জাতীয় আজগুবি ও উদ্ভট রেওয়ায়েত তালাশ করে যদি কোনো কিতাবে পাওয়া যায় তাহলে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতসংক্রান্ত কিতাবাদিতেই পাওয়া যাবে।

কাউকে কাউকে কখনও অসন্তোষের স্বরে বলি, 'ভাই আপনি যার কাছ থেকে শুনেছেন তাকেই বরাত জিজ্ঞাসা করুন।' আর এরই-বা কী প্রয়োজন যে, অনির্ভরযোগ্য লোক থেকে সনদ-সূত্রহীন কিছু শুনলেই তা তালাশ করতে হবে। এটা তালাশে যে সময় ব্যয় করবেন সে সময়ে আপনি কোনো নির্ভরযোগ্য দ্বীনী কিতাব পড়ুন। নির্ভরযোগ্য হাদীসের কোনো সংকলনগ্রন্থ পড়ুন। কুরআন কারীম তেলাওয়াত করুন। যিকির-আযকার, দুআ-দরূদ পড়ুন। দাওয়াত-তাবলীগে সময় দিন। কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে গিয়ে বসুন। দ্বীন শেখার জন্য কোনো আলেমের কাছে চলে যান। নিজের পরিবার-পরিজনকে সময় দিন। নিজের জরুরি কাজকর্ম ও দায়িত্ব পালন করুন। দ্বীন-দুনিয়ার জরুরি কাজ কি কম যে, কেউ উল্টা-পাল্টা কিছু বললেই কাজকর্ম ফেলে রেখে তার সনদ তালাশ করা শুরু করতে হবে।

৪. সবশেষে আমি এ খণ্ডের সংকলক মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এমন একটি ইলমী খেদমতের তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা 'আযীয'কে আফিয়ত ও সালামত, সিহ্হাত ও কুওয়াত এবং হায়াতে তাইয়েবা তবীলা দান করুন। তাকে তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন, রুসূখ ফিল ইলম ও তাকওয়া-তহারত দান করুন। ইফ্ফত ও আফাফ, রিযকে হালাল এবং নেক সন্তান-সন্ততির নেয়ামত দান করুন। সারা জীবন ইখলাস ও ইতকানের সঙ্গে দ্বীন ও আল্লাহর মাখলুকের খেদমত করে যাওয়ার তাওফীক দিন। এই গুণগুলো আল্লাহ তাআলা মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর সকল উস্তাদ-ছাত্রকে এবং সকল দ্বীনী মাদরাসার আসাতেযা ও তলাবাকে দান করুন। আল্লাহ তাআলা নিজ

ফযল ও করমে সবার থেকে ইহয়ায়ে সুন্নত, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ এবং সমাজের বিভিন্ন দ্বীনী তাকাযা পূরণের খেদমত নিন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

২২.০৩.১৪৩৬ হি.

মঙ্গলবার দিনগত রাত

নবী-রাসূল, সাহাবী-তাবেঈ

দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১] অনেককে বলতে শোনা যায়, 'আল্লাহ্ তাআলা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে **দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর** পাঠিয়েছেন।' এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত পাওয়া গেলেও (রেওয়ায়েতটির মান সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে) দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সম্পর্কে কোনো রেওয়ায়েত খুঁজে পাওয়া যায় না। হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেছেন– لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ 'আমি এটি (দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার-এর রেওয়ায়েত) খুঁজে পাইনি।'

মোল্লা আলী কারী রহ. জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.এর কথা উল্লেখ করে মৌন সমর্থন করেছেন। –তাখরীজু আহাদীসি শরহিল আকায়িদ, জালালুদ্দীন সুয়ূতী; ফারায়েদুল কালায়েদ আলা আহাদীসি শরহিল আকায়িদ, মোল্লা আলী কারী, ক্রমিক নং ৩৬

জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.এর বক্তব্য তাঁর রচিত পুস্তিকা 'তাখরীজু আহাদীসি শরহিল আকায়িদ' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এ পুস্তিকা এখনও ছাপেনি। একটি পাণ্ডুলিপি থেকে আমরা কথাটি উল্লেখ করেছি। আহলে ইলম উলামায়ে কেরামের সুবিধার্থে এখানে পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতিচিত্র তুলে দেওয়া হল–

انه سئل عن عدد الانبياء – مائة الف واربعة وعشرون الفا اخرجه ابن
حبان في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله عنه
وفي رواية مائتا الف لم اقف عليها
– انا سيد ولد ادم اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة

এই পাণ্ডুলিপি তিউনিসের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যায় সংরক্ষিত আছে।
এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের সংখ্যাটি একটি রেওয়ায়েতে এসেছে। মুসনাদে আহমদে রেওয়ায়েতটি রয়েছে। তবে এর সনদ দুর্বল।
দেখুন, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২২৮৮ (টীকাসহ), আনীসুস সারী ফী তাখরীজি ওয়া-তাহক্বীকিল আহাদীস আল্লাতি যাকারাহাল হাফিয ইবনে হাজার ফী ফাতহিল বারী ১/৫১৮-৫২৩

প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"বস্তুত আমি তোমার আগেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক এমন, যাদের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি আর কতক এমন, যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইনি।" –সূরা মুমিন ৭৮

সাপের মুখে করে ইবলীসের বেহেশতে প্রবেশ

[ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-২][১] প্রসিদ্ধ আছে, ইবলীস আদম আ. ও হাওয়া আ.কে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার জন্য জান্নাতে ঢুকতে চাইলে জান্নাতের প্রহরীরা বাঁধা দেয়। তাই সে সাপের মুখে করে লুকিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। এ অপরাধের কারণে সাপের শরীরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। সাপের পা খসে পড়ে। এরপর থেকেই সাপকে বুকে ভর দিয়ে চলতে হয়।

কুরআন মজীদ থেকে আমরা জানতে পারি, শয়তান আদম ও হাওয়া আ.কে ওয়াসওয়াসা দিয়েছিল, কিন্তু কীভাবে দিয়েছিল– কুরআন সুন্নাহর কোথাও তা উল্লেখ করা হয়নি। কিছু কিছু ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে আছে, শয়তান সাপ ও ময়ূরের সাহায্যে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। এগুলোর কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। অধিকাংশই কল্পকাহিনী।
ঘটনাটি উল্লেখ করে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. বলেন–

وَاعْلَمْ أَنَّ هٰذَا وَأَمْثَالَهُ مِمَّا يَجِبُ أَنْ لَا يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ.

---

[১] ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দলিলযোগ্য উৎস নয়। ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের স্বরূপ ও হুকুম সম্পর্কে জানতে দেখুন, প্রচলিত জাল হাদীস ১/১৬৫-১৭২ (১ম সংস্করণ)

'এগুলোর প্রতি কর্ণপাত করাও উচিত নয়।'

তিনি আরও বলেন–

لِأَنَّ إِبْلِيْسَ لَوْقَدَرَ عَلَى الدُّخُوْلِ فِيْ فَمِ الْحَيَّةِ فَلِمَ لَمْ يَقْدِرْ عَلٰى أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهٗ حَيَّةً ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

"ইবলীস সাপের মুখে করে ঢুকতে পারলে নিজেই সাপের বেশ ধরে ঢুকতে পারল না কেন?" –তাফসীরে কাবীর ৩/১৫

তা ছাড়া জান্নাতের প্রহরীরা কি এতই অসতর্ক যে ইবলীস তাঁদের ধোঁকা দিয়ে জান্নাতে ঢুকে গেল? মোটকথা, ঘটনাটি কুরআন হাদীসে নেই। এর নির্ভরযোগ্য কোনো ঐতিহাসিক সূত্রও পাওয়া যায় না। ঘটনার বিবরণও আপত্তিকর। আরও দেখুন, আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত, ড. আবু শাহবা ১৭৮-১৮০, তাফসীরে মাজেদী ১/১০১

সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে

[জাল বর্ণনা-৩] আল্লাহ্ পাক একবার মূসা আ.কে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি বনী ইসরাঈলকে (মূসা আ.এর কওমকে) জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আহ্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। হযরত মূসা আ. আরয করলেন, আহ্মদ কে?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন– হে মূসা, আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি। আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সঙ্গে আসমান ও জমিন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বছর আগে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ! আমার মাখলুকের জন্য জান্নাত হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে।

এরপর মূসা আ. আরয করলেন, হে আল্লাহ্, আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, <u>সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে</u>। মূসা আ. পুনরায় আরয করলেন, তবে আমাকে সেই নবীর এক উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, তুমি তাঁর আগেই

নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্র করে দেব।[১]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী রহ. প্রমুখ বলেছেন, বর্ণনাটি জাল। –মীযানুল ইতিদাল ২/১৬০, লিসানুল মীযান ৪/৭৭, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৮৪-৮৫, তানযীহুশ শরীয়া ১/২৪৪-২৪৫

সুলাইমান আ.এর আংটি হারানো

[ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-৪] সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা একটি আংটি দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তার বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। এর বদৌলতেই জীব-জন্তু, জিন-পরী, আকাশ-বাতাস সবকিছু তাঁর বশীভূত ছিল। এই আংটিটিতে 'ইসমে আযম' লেখা থাকায় শৌচাগারে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর এক স্ত্রীর কাছে তা রেখে যেতেন। একবার তিনি আংটিটি তাঁর স্ত্রীর কাছে রেখে গেলে একটি দুষ্ট জিন (তাঁর বেশ ধরে এসে) আংটিটি নিয়ে নেয়। ফলে তিনি রাজত্ব হারান।

জীবন ধারণের জন্য তিনি এক জেলের সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন। পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি প্রতিদিন দু'টো মাছ পেতেন। একদিন একটি মাছ কাটার পর মাছের পেটে তিনি তাঁর হারানো আংটিটি ফিরে পান।

ঘটনা হল, উক্ত দুষ্ট জিনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সবাই বুঝে ফেলে যে, সে আসলে সুলাইমান আ. নয়। তাই সে আংটিটি সমুদ্রে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর একটি মাছ তা খেয়ে ফেলে। সেই মাছটিই সুলাইমান আ.এর জালে ধরা পড়ে ...।[২]

আংটি হারানোর এই ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু তা নির্ভরযোগ্য নয়। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে এটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-নির্ভর একটি কাল্পনিক কাহিনী।[৩]

---

[১] উম্মতি নবী ১২-১৩

[২] সহীহ(?) কাছাছুল আম্বিয়া, তাহের সূরাটী, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আসরারুল কোরআন প্রকাশনী, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ (সংক্ষেপিত)

[৩] আহলে ইলমদের জন্য এখানে তিনজন মুসলিম মনীষীর (কাযী ইয়ায, ইবনে কাসীর ও ফখরুদ্দীন রাযী রহ.এর) বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল–

قَالَ الْقَاضِيْ عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى : =

এগুলো বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাছাড়া নবীদের বেশ ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা শয়তানের নেই।

= «وَلَا يَصِحُّ مَا نَقَلَهُ الْأَخْبَارِيُّوْنَ مِنْ تَشَبُّهِ الشَّيْطَانِ بِهِ، وَتَسَلُّطِهِ عَلٰى مُلْكِهِ، وَتَصَرُّفِهِ فِيْ أُمَّتِهِ بِالْجَوْرِ فِيْ حُكْمِهِ، لِأَنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا يُسَلَّطُوْنَ عَلٰى مِثْلِ هٰذَا، وَقَدْ عُصِمَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ مِثْلِهِ».

وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى :

«هٰذِهِ كُلُّهَا مِنَ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ، وَمِنْ أَنْكَرِهَا مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ (فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ:) إِسْنَادُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَوِيٌّ، وَلٰكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -إِنْ صَحَّ عَنْهُ- مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِيْهِمْ طَائِفَةٌ لَا يَعْتَقِدُوْنَ نُبُوَّةَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ عَلَيْهِ، وَلِهٰذَا كَانَ فِي السِّيَاقِ مُنْكَرَاتٌ، مِنْ أَشَدِّهَا :ذِكْرُ النِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَشْهُوْرَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ: أَنَّ ذٰلِكَ الْجِنِّيَّ لَمْ يُسَلَّطْ عَلٰى نِسَاءِ سُلَيْمَانَ بَلْ عَصَمَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقَدْ رُوِيَتْ هٰذِهِ الْقِصَّةُ مُطَوَّلَةً عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَجَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ، وَكُلُّهَا مُتَلَقَّاةٌ مِنْ قَصَصِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.»

وَقَالَ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى :

«وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ التَّحْقِيْقِ اسْتَبْعَدُوْا هٰذَا الْكَلَامَ مِنْ وُجُوْهٍ، اَلْأَوَّلُ : أَنَّ الشَّيْطَانَ لَوْ قَدَرَ عَلٰى أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالصُّوْرَةِ وَالْخِلْقَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ، فَحِيْنَئِذٍ لَا يَبْقٰى اعْتِمَادٌ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ. فَلَعَلَّ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ رَآهُمُ النَّاسُ فِيْ صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ وَعِيْسٰى وَمُوْسٰى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَا كَانُوْا أُولٰئِكَ بَلْ كَانُوْا شَيَاطِيْنَ تَشَبَّهُوْا بِهِمْ فِي الصُّوْرَةِ لِأَجْلِ الْإِغْوَاءِ وَالْإِضْلَالِ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ ذٰلِكَ يُبْطِلُ الدِّيْنَ بِالْكُلِّيَّةِ. اَلثَّانِيْ : أَنَّ الشَّيْطَانَ لَوْ قَدَرَ عَلٰى أَنْ يُعَامِلَ نَبِيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْمُعَامَلَةِ لَوَجَبَ أَنْ يَقْدِرَ عَلٰى مِثْلِهَا مَعَ جَمِيْعِ الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ، وَحِيْنَئِذٍ وَجَبَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ وَأَنْ يُمَزِّقَ تَصَانِيْفَهُمْ وَأَنْ يُخَرِّبَ دِيَارَهُمْ، وَلَمَّا بَطَلَ ذٰلِكَ فِيْ حَقِّ آحَادِ الْعُلَمَاءِ فَلَأَنْ يَبْطُلَ مِثْلُهُ فِيْ حَقِّ أَكَابِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلٰى، وَالثَّالِثُ : كَيْفَ يَلِيْقُ بِحِكْمَةِ اللهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ يُسَلِّطَ الشَّيْطَانَ عَلٰى أَزْوَاجِ سُلَيْمَانَ؟ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَبِيْحٌ. اَلرَّابِعُ : لَوْ قُلْنَا إِنَّ سُلَيْمَانَ أَذِنَ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فِيْ عِبَادَةِ تِلْكَ الصُّوْرَةِ فَهٰذَا كُفْرٌ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ الْبَتَّةَ فَالذَّنْبُ عَلٰى تِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَكَيْفَ يُؤَاخِذُ اللهُ سُلَيْمَانَ بِفِعْلٍ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ؟»

–তাফসীরে নাসাফী ৩/১৫৬, আলবাহরুল মুহীত ৭/৫২৭, তাফসীরে কাবীর, ফখরুদ্দীন রাযী ২৬/১৮২, রূহুল মাআনী ২৩/১৯৯, তাফসীরে কাসেমী ৬/১০১, নাসীমুর রিয়াব ৪/২০৫, মাআরেজুত তাফাক্কুর ৩/৫৬৮, আযওয়াউল বয়ান ৪/৬০-৬১, তাফসীরে উসমানী, শাব্বীর আহমদ উসমানী ২/৯৮৪ (সূরা সাদ, ৩৪ নং আয়াতের অধীনে) তাফসীরে মাজেদী ৬/৭৯, আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত, আবু শাহবা ২৭০-২৭৫, আরও দেখুন, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, মুহাম্মদ তকী উসমানী ৩/১৩৯৯, তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১৩১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬/৪৩১-৪৩৩

সুলাইমান আ.এর সকল সৃষ্টিজীবকে মেহমানদারি করানো

[ভিত্তিহীন ঘটনা-৫] লোকমুখে প্রসিদ্ধ, সুলাইমান আ. একবার আল্লাহর সকল সৃষ্টিজীবকে দাওয়াত খাওয়ানোর ইচ্ছা করেন। অনুগত জিন-ইনসানের সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে খাবার জমা করা হয়। বিপুল পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে গেলে মেহমানদারি শুরু করা হয়। কিন্তু সমুদ্রের একটি মাছই তাঁর সকল খাদ্যসামগ্রী খেয়ে ফেলে। এমনকি মাছটি আরও খাবার চাইতে থাকে। মাছটি বলে, 'আমার রব আমাকে প্রতিদিন এর তিনগুণ খাবার খেতে দেন।' এ কথা শুনে সুলাইমান আ. সেজদায় লুটিয়ে পড়েন![১]

কাহিনীটি ভিত্তিহীন। হাদীস, তাফসীর বা ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে এ কাহিনীটি নেই। আহমদ শিহাবুদ্দীন কালয়ূবী রচিত একটি গ্রন্থে যদিও ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও নির্ভরযোগ্য (কিংবা অনির্ভরযোগ্য) কোনো গ্রন্থের হাওয়ালা (Reference) দেওয়া হয়নি। আহলে ইলমগণ জানেন, নির্ভরযোগ্য সনদ-সূত্র কিংবা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের হাওয়ালা ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া ঘটনাটির বক্তব্য আপত্তিকর। কত বিশাল এই সৃষ্টিজগৎ, বিচিত্র সব প্রাণী এই মহাবিশ্বে, এদের খাবারও বিচিত্র রকমের। এত এত প্রাণীর এত বিচিত্র ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা কোনো মাখলুকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই ধ্রুব সত্যটুকু কে না বুঝবে? মোটকথা, ঘটনাটি ভিত্তিহীন ও বাস্তবতাবিরোধী।

উল্লেখ্য, কালয়ূবী রচিত এ গ্রন্থটি কোনো রেওয়ায়েত বা মাসআলা প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভর করার মতো নয়। বইটিতে কোনো কথারই হাওয়ালা উল্লেখ করা হয় না। বেশ কিছু উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনীও রয়েছে এতে। যাচাই-

---

[১] কালয়ূবী ১৪৪ (আশরাফিয়া বুক হাউস)

বাছাই ছাড়া এ ধরনের গ্রন্থে উল্লেখকৃত কোনো তথ্য, কথা, বাণী বা ঘটনা গ্রহণ করা উচিত নয়। শুধু ভাষাচর্চার জন্য কেউ পড়তে চাইলে সেটা ভিন্ন কথা।

কুষ্ঠরোগে আইয়ূব আ.এর সারা শরীর ঘা হয়ে যাওয়া

[ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-৬] আইয়ূব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রচলিত আছে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর সারা শরীরে ঘা হয়ে যায়। শরীরে পোকা বাসা বাঁধে এবং শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার কারণে লোকেরা তাঁকে জনবসতি থেকে বের করে দেয়। স্ত্রী ছাড়া তাঁর সকল আত্মীয়-পরিজন আস্তে আস্তে তাঁকে পরিত্যাগ করে। খাবারের ব্যবস্থা করতে তাঁর স্ত্রী মানুষের বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হন। এমনকি একসময় তাকে তার মাথার চুল বিক্রি করতে হয়...।

কুরআন কারীম থেকে জানা যায়, আইয়ূব আলাইহিস সালাম একটি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। নবীসুলভ দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি অসুখের কষ্ট সহ্য করে গেছেন। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও তিনি ছিলেন সদা আল্লাহমুখী। এক সময় তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করে তাঁকে সুস্থতা দান করেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে একটি প্রস্রবন সৃষ্টি হয়। এ প্রস্রবনের পানি পান করার পর এবং এর পানি দিয়ে গোসল করার পর তিনি সুস্থতা ফিরে পান।

আইয়ূব আ.এর অসুখ সম্পর্কে কুরআন কারীম থেকে এতটুকুই জানা যায়। আইয়ূব আ.এর কী অসুখ ছিল, কতদিন তা স্থায়ী হয়েছিল, রোগের কারণে তাঁকে কেমন কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে– এসব সম্পর্কে কুরআন কারীমে কিছু নেই। কুরআন কারীমে নবীদের ঘটনা উল্লেখ করা হয় মূলত শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য। আইয়ূব আ.এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঘটনার ততটুকু অংশই উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে মুমিনরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কুরআন কারীম এর অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

সম্ভবত এ কারণেই এ সম্পর্কে হাদীসেও কোনো আলোকপাত করা হয়নি। মুমিনের কর্তব্য, কুরআনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং কুরআনী হেদায়েতের উপর আমল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

আইয়ূব আ.এর অসুখ কী ছিল, কতকাল স্থায়ী হয়েছিল এই ব্যাধি, রোগভোগের কেমন কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন– এগুলোর বিস্তারিত বিবরণসম্বলিত কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন কিতাবে। কিন্তু এ বর্ণনাগুলোর সবগুলোর উৎসই নিরেট ইসরাঈলী রেওয়ায়েত কিংবা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-নির্ভর ঐতিহাসিক বর্ণনা (সাহাবী, তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈর উক্তি)।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দলিলযোগ্য উৎস নয় এবং শুধু ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রমাণ করা যায় না। মুহাক্কিক আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন । বিশেষ করে বিষয়টি যদি নবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি হয়ে পড়ে অনেক বেশি। এটিও একটি স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি।

প্রসঙ্গের গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে দু'জন মুসলিম মনীষীর (মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ও মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা. বা.এর) দু'টি প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল। মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা. বা. বলেন–

حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قران کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر وضبط سے کام لیا، اور اللہ تعالی کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ اس کی تشریح قران کریم نے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو روایتیں اس سلسلے میں مشہور ہیں، وہ عام طور سے مستند نہیں ہیں۔ (تفسیر توضیح القران ۲ :۱۰۰۴)

"আইয়ূব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন কারীমে এতটুকু বলা হয়েছে যে, তিনি কোনো কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি তাতে পরম ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। তাঁর রোগটা কী ছিল, কুরআন কারীম তা খুলে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই এর অনুসন্ধানে পড়ার দরকার নেই। আর এ ক্ষেত্রে যে বর্ণনাগুলো প্রসিদ্ধ আছে তা নির্ভরযোগ্য নয়।" –তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন ২/১০০৪

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. লিখেছেন, "কুরআন কারীমে এতটুকু তো বলা হয়েছে যে, আইয়ূব আলাইহিস সালাম কোনো গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটা কেমন রোগ ছিল তা বলা হয়নি। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর কোনো বিবরণ বর্ণিত হয়নি। হ্যাঁ, কিছু আছার (ঐতিহাসিক বর্ণনা) থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, তাঁর পুরো শরীরে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এক পর্যায়ে লোকেরা ঘৃণায় তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে ফেলে রেখে গিয়েছিল। **কিন্তু কতক মুহাক্কিক মুফাস্সির এসব আছারের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম রোগাক্রান্ত তো হতে পারেন। কিন্তু মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মতো কোনো রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না।**[১]

আইয়ূব আলাইহিস সালামের রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোনো সাধারণ রোগই ছিল। সুতরাং যে বর্ণনাগুলোয় এ কথা আছে যে, তাঁর পুরো শরীরে ফোঁড়া হয়েছিল কিংবা যাতে বলা হয়েছে, তাঁকে আবর্জনার স্তূপে রেখে আসা হয়েছে তা সনদ ও যুক্তি কোনো বিচারেই নির্ভরযোগ্য নয়।" –মাআরেফুল কুরআন ৭/৫২২

আরও দেখুন, আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর, ড. আবু শাহবা ২৭৫-২৮২, কাছাছুল কুরআন, হিফজুর রহমান সিয়ূহারভী ১/৫১৩-৫১৮, তাফসীরে উসমানী আলা তরজমাতি শায়খুল হিন্দ, শাব্বীর আহমদ উসমানী ৫৯২, মাওসূআতুল ইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ২/৬৪২-৬৪৬, রুহুল মাআনী ১২/২০৮, মাহাসিনুত তা'বীল, জামালুদ্দীন কাসেমী ৫/১৬৯-১৭০, তাফসীরুল মারাগী ৬/৬১ (সূরা আম্বিয়া) ৮/১২৪ (সূরা সাদ), হাদায়েকুর রাওহি ওয়ার-রায়হান ১৮/১৭৪, ২৪/৩৯৭, আততাফসীরুল ওয়াযেহ, মাহমুদ মুহাম্মদ হিজাযী ২/৫৪৮, আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর কাদীমান ওয়া-হাদীসান, সা'দ ইউসুফ ১৯১, মাআরেজুত তাফাক্কুর, আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা ৩/৫৮১, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৩০৩, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/৩১৭, সহীহ ইবনে হিব্বান ৭/১৫৯ (টীকা)

---

[১] কারণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে পাঠানোই হয় মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ঘৃণার কারণে মানুষ তাঁদের কাছে যেতে না পারলে তাঁরা মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে পারবেন না। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্যই তাহলে ব্যাহত হয়ে যেতে পারে।

যাকারিয়া আ.কে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা

[ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-৭] প্রচলিত আছে, বনী ইসরাঈল হযরত যাকারিয়া আ.কে মারার জন্য ধাওয়া করলে তিনি একটি গাছের মধ্যে আশ্রয় নেন। কিন্তু শয়তান তার কাপড়ের প্রান্ত ধরে ফেলে। কাপড়ের প্রান্ত বের হয়ে থাকার কারণে দুর্বৃত্তরা বুঝতে পারে যে তিনি গাছে লুকিয়েছেন। এরপর তারা গাছটিকে করাত দিয়ে চিরে ফেলে।

কাহিনীটির দালিলিক কোনো ভিত্তি নেই। এ সম্পর্কে যে রেওয়ায়েতটি রয়েছে, শাস্ত্রজ্ঞদের মতে তা জাল ও বানোয়াট। কোনো কোনো কিতাবে ঘটনাটি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সনদও (বর্ণনাসূত্র) নির্ভর করার মতো নয়।[১] বস্তুত এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত-নির্ভর কল্পকাহিনী।

—আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২২৪, ২২৭-২২৮, মাওসূআতুল ইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ২/৬২৯, কাছাছুল কুরআন ১/৫৭৩, আলমুজালাসা ওয়া-জাওয়াহিরুল ইলম, দিনাওয়ারী (দারু ইবনে হাযম) ১/৩৩২-৩৩৩ (টীকাসহ) (আরও দেখুন, তারীখে দামেস্ক ১৯/৫৪-৫৬, মীযানুল ইতিদাল ১/১৬৯, ২/৬৬৮ (আবদুল মুনয়িম ইবনে ইদরীস-এর জীবনী) তারীখে দামেস্ক ৬৪/২০৬-২০৭, মীযানুল ইতিদাল ৩/১২৭-১৩০, আলী ইবনে যায়েদ-এর জীবনী)

উল্লেখ্য, আরও নাটকীয়ভাবে এই কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে গাছের কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া আ.কে এই শাস্তি দিয়েছিলেন। ...করাত দিয়ে কাটার সময় আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

যাকারিয়া, তুমি যদি 'আহ' শব্দও কর, তাহলে নবুওয়তের খাতা থেকে তোমার নাম কেটে দেব।...

---

[১] ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে 'আবদুল মুনয়িম ইবনে ইদরীস' নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। ইমাম আহমদ বলেছেন, 'এ লোক ওহাব ইবনে মুনাব্বিহের নামে মিথ্যা কথা বলত।' সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে যে বর্ণনাটি রয়েছে, তাতে 'আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন' নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছে। এই রাবী যয়ীফ, কোনো কোনো হাদীস বিশারদ তার সম্পর্কে আরও কঠিন মন্তব্য করেছেন। সুতরাং ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেছেন কি না, সে ব্যাপারটিই নিশ্চিত নয়। যদি তা তাদের বক্তব্য হিসেবে প্রমাণিত হত, তবুও তা গ্রহণযোগ্য হত না। কারণ, এ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যের উৎস 'ইসরাঈলী রেওয়ায়েত', যা দলিলযোগ্য উৎস নয়।

ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হিসেবেও এ কথাগুলো আমরা খুঁজে পাইনি। বাহ্যত, এগুলো উপরিউক্ত ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বিকৃত রূপ। কথাগুলো নবীদের শান-বিরোধী। কোনো নবী সম্পর্কে এ ধরনের আপত্তিকর কথাবার্তা বলা ধৃষ্টতার শামিল। নবী-রাসূলগণের শানে (বরং যেকোনো দ্বীনী বিষয়ে) কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা কাম্য।

ঈসা আ.এর বিসমিল্লাহ-এর ব্যাখ্যা প্রদান

[জাল বর্ণনা-৮] বাল্যকালে ঈসা আ.কে তাঁর মা মক্তবে পাঠিয়েছিলেন। প্রথমদিন শিক্ষক মহোদয় তাঁকে পড়াতে বসে বললেন– বল, 'বিসমিল্লাহ'। তিনি তখন শিক্ষক মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন 'বিসমিল্লাহ' মানে কি?

তিনি বললেন, না। তখন ঈসা আ. বললেন– ب (বা)এ بَهَاءُ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহর নূর। س (সীন)এ سَنَاءُ اللهِ অর্থাৎ তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা। م (মীম)এ مُلْكُهُ (তাঁর রাজত্ব)। শিক্ষক তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে যান।

ইমাম ইবনুল জাওযী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ শাওকানী প্রমুখ বলেছেন, বর্ণনাটি জাল।

–কিতাবুল মাওযূআত ১/৩২৮, আললাআলিল মাসনূআ ১/১৭২, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৬০৭, আরও দেখুন, আলমাজরূহীন ১/১২৬, আলকামেল, ইবনে আদী ১/৪৯৪

ঈসা আ. যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ভাষা আরবী ছিল না। তাঁর পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থের ভাষাও আরবী ছিল না, তা হলে শিক্ষক তাঁকে 'বিসমিল্লাহ' শেখাতে যাবেন কেন? আর তিনি আরবী বর্ণমালার ব্যাখ্যাই-বা দেবেন কীভাবে?

ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ছেলে পাওয়া

[ভিত্তিহীন ঘটনা-৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন, ছেলেরা খেলছে আর একটি ছেলে মাঠের এক কোণে বসে কাঁদছে। তার গায়ে জীর্ণ-শীর্ণ কাপড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? ছেলেটি নবীজীকে

চিনতে পারেনি। উত্তরে সে বলল, আমার কথা ছাড়ুন, আমার বাবা নবীজীর সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, আর আমার মায়ের অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে। তারা আমার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এরপর সেই স্বামী আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি নিঃস্ব, পরার মতো পোশাক নেই, খাবার নেই, থাকার জায়গা নেই। এই ছেলেদের যখন দেখলাম, সুন্দর পোশাক পরে খেলছে তখন আমার খুব খারাপ লেগেছে, আর খুব কান্না আসছিল। তিনি ছেলেটির হাত ধরে বললেন, আজ থেকে আমিই তোমার বাবা, আয়েশা তোমার মা, আর আমার মেয়ে ফাতেমা তোমার বোন। আলী তোমার চাচা, হাসান-হুসাইন তোমার ভাই। এরপর তিনি ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে যান এবং তাকে খেতে দেন। ভালো পোশাক পরান। একটু পর ছেলেটি হাসতে হাসতে বের হয়, তখন অন্য ছেলেরা জিজ্ঞাসা করে, একটু আগে তোমাকে কাঁদতে দেখলাম, এখন আবার হাসছ? ছেলেটি বলল, আমার পরার মতো কাপড় ছিল না, এখন কাপড় পেয়েছি; আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, এখন পেটপুরে খেয়েছি; আমি এতিম ছিলাম, এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাবা এবং আয়েশা রা. আমার মা হয়ে গেছেন ...। এ কথা শুনে ছেলেরা বলল, হায়! যদি আমাদের বাবাও সেই গযওয়ায় তথা যুদ্ধে শহীদ হতেন।[১]

এ রকম বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থে আমরা পাইনি। শুধু আহমদ শিহাবুদ্দীন কালয়ূবী রচিত একটি গ্রন্থে এটি পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে নির্ভরযোগ্য (বা অনির্ভরযোগ্য) কোনো গ্রন্থের বরাত দেওয়া হয়নি। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত বা মাসআলা প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি নির্ভর করার মতো নয়। এ ক্ষেত্রে যা পাওয়া যায় তা হল–

[নির্ভরযোগ্য ঘটনা] বিশ্‌র ইবনে আকরাবা নামক এক সাহাবীর পিতা এক গযওয়ায় শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন তিনি কাঁদছেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমার বাবা আর আয়েশা তোমার মা? তিনি বলেন, কেন নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। –আততারীখুল কাবীর, ইমাম বুখারী ২/৭৮, আলইসাবা ১/৩০২

---

[১] কালয়ূবী ১৭ (আশরাফিয়া বুক হাউস)

হয়তো ঘটনাটি বিশ্‌র ইবনে আকরাবা রা.এর ঘটনারই বিকৃত ও সংযোজিত রূপ। কিন্তু নিশ্চিত করে বলার মতো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

আবু বকর রা.এর খেজুর পাতার পোশাক পরিধান

[ভিত্তিহীন ঘটনা-১০] প্রচলিত একটি পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে–

"ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একজন বড় ধনাঢ্য লোক ছিলেন। যেদিন হযরত (দ.)এর খেদমতে আসিয়া তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইলেন সেই দিন হইতেই তাঁহার যত ধন-সম্পত্তি ছিল সমস্তই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়াই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেন এবং খোদা তাআলার সন্তোষ লাভের আশা করিতেন। কিছুদিন পর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, নিজের ও পরিবারের খোরাক পোশাকের জন্য অনেক কষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন। একদিন পরনের কাপড়-অভাবে মসজিদে নামায পড়িতে যাইতে কিঞ্চিৎ দেরী হইয়াছিল দেখিয়া হযরত (দ.) বলিলেন, "হে আবু বকর! আমি জীবিত থাকিতেই ইসলামের প্রতি আপনাদের এত অবহেলা হইতেছে, আমি অভাবে আরও কত কি হয় বলা যায় না।"

তখন সিদ্দীক (রা.) বলিলেন, "হুজুর! আমার অবহেলার কিছুই নহে, বাস্তবিক আমার পরনের কাপড় ছিল না, সেই হেতু আমি ছোট একখানা কাপড়ের সহিত বালিশের কাপড় ছিঁড়িয়া খেজুর পাতা ও কাঁটা দ্বারা সেলাই করত ধুইয়া শুকাইয়া পরিয়া আসিতে এত গৌণ হইয়াছে। হুজুর মার্জনার চক্ষে দর্শন করুন।" সিদ্দীক (রা.)এর কথা শুনিয়া হযরতের প্রাণ গলিয়া গেল। তাই তিনি দুঃখিত অন্তরে নামায আদায় করিয়া তাহার জন্য কিঞ্চিত দুআ করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই জিবরাঈল (আ.) সম্পূর্ণ খেজুর পাতার পোশাক পরিয়া হযরত (দ.)এর সম্মুখে হাজির হইলেন। হযরত (দ.) তাহা দেখিয়া অবাক হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরাঈল! প্রত্যহ তোমার শরীরে জরির পোশাক দেখিতে পাই, আর আজ খেজুর পাতার পোশাক দেখিতে পাইতেছি কেন? তদুত্তরে জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খেজুর পত্রের সেলাই করা কাপড় পরিয়া নামায পড়িতে আসিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা সমস্ত ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ হে

ফেরেশতাগণ! আবু বকর আমার সন্তোষ লাভের জন্য কতই না কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। অতএব তোমরা যদি আজ আমার সন্তোষ চাও, আমার দফতরে তোমাদের নাম রাখিতে চাও, তবে এখনই আবু বকরের সম্মানার্থে সকলেই খেজুর পত্রের পোশাক পরিধান কর। নচেৎ আজই আমার দফতর হইতে সমস্ত ফেরেশতার নাম কাটিয়া দিব।' এই কঠোর বাক্য শুনিয়া আমরা সকলেই তাঁহার সম্মানার্থে খেজুর পত্রের পোশাক পরিতে বাধ্য হইয়াছি।"[১]

হাদীস, তাফসীর, সীরাত ও তারীখের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থে ঘটনাটি নেই। আবু বকর রা. সম্পর্কে লিখিত নির্ভরযোগ্য কোনো জীবনীগ্রন্থেও আমরা ঘটনাটি পাইনি।[২] শাস্ত্রীয় নীতিমালার আলোকে বিচার করলে এটি একটি 'বানোয়াট ঘটনা' বলেই প্রতীয়মান হয়। -মাসিক আলকাউসার, মার্চ '১২ পৃ. ৩৩

উমর রা.এর ছেলে আবু শাহমার ব্যভিচারের শাস্তি

[জাল বর্ণনা-১১] উমর রা.এর এক ছেলে আবু শাহমা একবার ব্যভিচার করে ফেলে। জানতে পেরে উমর রা. তাকে (ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ) ১০০ বেত্রাঘাত করেন। এতে তিনি মারা যান।

এটি একটি জঘন্যতম জাল বর্ণনা । আদৌ উমর রা.এর কোনো ছেলে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়েনি। হাদীস বিশারদগণের মতে এটি একটি মনগড়া কাহিনী।

-আলআবাতীল ওয়াল-মানাকীর ২৯০-২৯৫, কিতাবুল মাওযূআত ৩/৬০৭-৬১৫, আল্লাআলিল মাসনূআ ২/১৯৪-১৯৮, তানযীহুশ শরীয়া ২/২২০, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/২৫৪

প্রকৃত ঘটনা হল, উমর রা.এর ছেলে আবু শাহমা একবার 'নাবীয' (খেজুর বা কিসমিস ভিজিয়ে রাখা পানি) পান করেন। সাধারণত নাবীয পান করলে মাদকতা আসে না, কিন্তু সেদিন কোনো কারণে মাদকতা এসে গিয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন মিসরে। পরদিন তিনি মিসরের গভর্নর আমর ইবনে আস

---

[১] মকছুদোল মোমেনীন ১৪৫-১৪৬

[২] খতীব বাগদাদী রহ. রচিত 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে (৫/৪৪২) একটি 'জাল' বর্ণনা রয়েছে। এ ঘটনাটি সেই বর্ণনার বিকৃত ও সংযোজিত রূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আহলে ইলম উলামায়ে কেরাম বর্ণনাটি দেখতে পারেন। আরও দেখুন, কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৪-৫৫, তানযীহুশ শরীয়া ১/৩৪৩, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ৩৩২

রা.এর কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলেন এবং তাকে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি (৪০ বেত্রাঘাত) প্রদানের আবেদন করেন। তার আবেদনে আমর ইবনুল আস রা. নিয়মানুযায়ী শাস্তি কার্যকর করেন।

উমর রা. এ ঘটনা জানতে পেরে আবু শাহমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি আবু শাহমাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ পাঠান। মদীনায় পৌছুলে তিনি তাকে আবারও প্রহার করেন। সম্পর্কে ছেলে ও নিকটজন হওয়ার কারণে তিনি তাকে আবার এই প্রহার করেন। এটি 'হদ্দ' (শরয়ী শাস্তি) ছিল না। কারণ 'হদ্দ' দু'বার প্রদান করা যায় না।[১]

এরপর আবু শাহমা রা. এক মাস সুস্থ অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। এক মাস পর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু উমর রা.এর প্রহারের মাত্র এক মাসের মাথায় তিনি ইন্তেকাল করায় সাধারণ মানুষ মনে করেছিল উমর রা.এর প্রহারের কারণেই তিনি মারা যান। এটি ছিল একটি ভুল ধারণা। তাই উমর রা.এর আরেক ছেলে (আবু শাহমা-এর ভাই) বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এই ভুল ধারণার অপনোদন করে দেন। তিনি বলেন–

فَلَمَّا قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَهُ وَعَاقَبَهُ مِنْ أَجْلِ مَكَانِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَبِثَ شَهْرًا صَحِيْحًا، ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ، فَيَحْسِبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِهِ.

"...উমর রা.এর প্রহারের পরও পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এক মাস বেঁচে ছিলেন। এরপর আল্লাহর ফয়সালায় তাঁর আয়ু শেষ হয়ে গেলে তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করতে থাকে উমর রা.এর প্রহারের ফলেই তিনি মারা গেছেন। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়।"

এ-ই হল প্রকৃত ঘটনা। এটিকে 'তিল থেকে তাল বানিয়ে' ব্যভিচারের নোংরা গল্পটি তৈরি করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, গল্পটি বানোয়াট। এটি বলা, লেখা ও প্রচার করা সম্পূর্ণ হারাম।

বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৯/২৩২-২৩৩ (১৭০৪৭) আস্‌সুনানুল কুব্‌রা, বাইহাকী ৮/৩১২-৩১৩, আলইস্‌তিআব, ইবনে আবদুল বার্‌

---

(১) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الْكُبْرٰى» ٨/٣١٣: «وَالَّذِيْ يُشْبِهُ أَنَّهُ جَلَدَهُ جَلْدَ تَعْزِيْرٍ، فَإِنَّ الْحَدَّ لَا يُعَادُ. وَاللهُ أَعْلَمُ».

২/৮৪২, উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসীর ৩/১৩৯, তাহযীবুল আসমা, ইমাম নববী ৩৯৮, মুসনাদুল ফারূক, ইবনে কাসীর ২/৫১৮-৫২১, আলইসাবা, ইবনে হাজার ৫/৪৪-৪৫

ফাতেমার 'জারি'

[ভিত্তিহীন ঘটনা-১২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই কন্যা- উম্মে কুলসুম রা. ও ফাতেমা রা. ছিলেন যথাক্রমে উসমান রা. ও আলী রা.এর সহধর্মিণী। উসমান রা. ছিলেন বেশ ধনী। কিন্তু আলী রা.এর তেমন সম্পদ ছিল না। উম্মে কুলসুম রা. একবার মদীনার সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দাওয়াত করেন। কিন্তু ফাতেমা রা.কে দাওয়াত করা হয়নি। ভরা মজলিসে দরিদ্র বোনের কারণে তিনি বিব্রত হতে চাননি! ফাতেমা রা. এতে খুবই মর্মাহত হন। তাঁর মনঃকষ্টের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় দাওয়াতের মজলিসে। আগত মেহমানরা খেতে বসলে দেখা গেল, পাকানো ভাত চাল হয়ে আছে, আর গোশতের টুকরোগুলো পাথরের টুকরোয় পরিণত হয়ে গেছে।

ঘটনাটি আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বেশ প্রচলিত। এটি নিয়ে একটি 'জারি গান'ও রয়েছে। কিন্তু ঘটনাটির ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। বাহ্যত, সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনীটি বানানো হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা উম্মে কুলসুম রা.এর প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আপত্তিকর। নবী পরিবারের কারও সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা ধৃষ্টতার শামিল।

বেলাল রা.এর 'সীন'কে 'শীন' উচ্চারণ করা

[ভিত্তিহীন ঘটনা-১৩] বেলাল রা. ছিলেন হাবশা বা আবিসিনিয়ার বাসিন্দা। (এরা ছিল অনারব)। এ কারণে আরবী উচ্চারণ তাঁর সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হত না। আযানের মধ্যে 'আশ্‌হাদু' শব্দটি তাঁর মুখে 'আছহাদু' উচ্চারিত হয়ে যেত। একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেলালের আযান শুনে কাফেররা বিদ্রূপ করে বলে, মুহাম্মদ এমন কিছু বোকাকে মুসলমান বানিয়েছে যারা আরবী বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ পর্যন্ত জানে না। কাফেরদের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে আমরা বিব্রত বোধ করি। আমাদের অনুরোধ, বেলালের পরিবর্তে

অন্য কাউকে মুআয্যিন নিযুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের আবেদন মঞ্জুর করে বেলাল রা.এর স্থানে অন্য একজনকে মুআয্যিন হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

নতুন মুআয্যিন এক ওয়াক্ত নামাযের আযান দেওয়ার পরই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কী হয়েছে যে আযান দেওয়া হল না?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ তো আযান হয়েছে। ফেরেশতা বললেন, বেলাল যখন আযান দেন তখন সেই আযানের আওয়ায আরশে মুআল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে সেই আযান শুনেন। আজ বেলালের আযান আরশে মুআল্লায় পৌঁছায়নি। তাই আল্লাহ পাক জানতে চেয়েছেন, আজ কি আযান হয়নি?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, এখন থেকে বেলালই আযান দেবে। বেলালের 'সীন'ই আল্লাহর কাছে 'শীন।'

ঘটনাটি কাল্পনিক। এর কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। হাফেয জামালুদ্দীন মিয্যী, হাফেয ইবনে কাসীর, বদরুদ্দীন যারকাশী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শামসুদ্দীন সাখাবী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, ইসমাঈল আজলূনী, আবুল মাহাসিন কাউক্জী প্রমুখ বর্ণনাটি ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

وَكَانَ مِنْ أَفْصَحِ النَّاسِ لَا كَمَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ سِينَهُ كَانَتْ شِينًا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَرْوِيْ حَدِيثًا فِيْ ذٰلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سِيْنَ بِلَالٍ عِنْدَ اللهِ شِيْنٌ.

অর্থাৎ তিনি (বেলাল রা.) ছিলেন আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষীদের একজন। কিছু লোক যে ধারণা করে তিনি 'শীন' উচ্চারণ করতে পারতেন না তা ভুল। কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিহীন বর্ণনাও উল্লেখ করে। তা হল, 'বেলালের সীনই আল্লাহর কাছে শীন।'

অপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন–

وَكَانَ بِلَالٌ نَدِيَّ الصَّوْتِ، حَسَنَهُ، فَصِيْحًا، وَمَا يُرْوٰى: «إِنَّ سِيْنَ بِلَالٍ عِنْدَ اللهِ شِيْنٌ» فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

"বেলাল রা. সুমধুর ও উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী। আর 'বেলালের সীনই আল্লাহর কাছে শীন' মর্মে যে রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয় তার কোনো ভিত্তি নেই।

–আত্তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশ্তাহিরা ২০৭-২০৮, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা ২০৪, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৫/৪৭৭, ৭/২২১, আলমাকাসিদুল হাসানা ১৯০, ৩৯৭, আলমাসনূ ১১৩, আলআসরারুল মারফূআ ৭৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১০১, কাশফুল খাফা ১/৪১১, আললু'লুউল মারসূ ৪৪

জাবের রা.এর ছেলে কর্তৃক ভাইকে হত্যা

[ভিত্তিহীন ঘটনা-১৪] একবার জাবের রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করেন। ইত্যবসরে জাবের রা.এর এক শিশু ছেলে আরেক ছেলেকে হত্যা করে। এরপর সে ভয়ে পালাতে গিয়ে চুলায় পড়ে যায়। ফলে সেও মারা যায়। জাবের রা.এর স্ত্রী এসব বিষয় চেপে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেহমানদারি করেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে জাবের রা. ছেলেদের মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এনে রাখেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলে দু'টিকে জীবিত করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন। তাঁর দুআর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা ছেলে দুটিকে জীবিত করে দেন।

ঘটনাটির নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ খুঁজে পাওয়া যায় না।[১] মুহাম্মদ বিন দরবেশ হূত বলেছেন, ঘটনাটি জাল ও বানোয়াট। –আসনাল মাতালিব ৩৭৫

---

[১] ঘটনাটি 'শাওয়াহেদুন নুবুওয়া' (১০৮-১০৯, অনূদিত সংস্করণ)-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এর কোনো সনদ উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি নির্ভরযোগ্য (কিংবা অনির্ভরযোগ্য) কোনো গ্রন্থের বরাতও দেওয়া হয়নি। আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম সফ্ফুরী নামক নবম শতকের (৮৯৪ হি.) এক লোক কর্তৃক রচিত 'নুযহাতুল মাজালিস ওয়া-মুনতাখাবুন নাফায়িস' গ্রন্থেও (১/৭৮) এটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও কোনো বরাত দেওয়া হয়নি। এ গ্রন্থটিতে অধিকাংশ কথার নির্ভরযোগ্য কোনো বরাত দেওয়া হয় না। প্রচুর পরিমাণ উদ্ভট ও আজগুবি ঘটনারও উল্লেখ আছে এতে। এ উপমহাদেশে উদ্ভট-আজগুবি ঘটনা ও রেওয়ায়েত ছড়ানোর পেছনে এ গ্রন্থটির বড় ভূমিকা আছে। যাচাই-বাছাই ছাড়া এ ধরনের গ্রন্থে উল্লেখকৃত কোনো তথ্য বা ঘটনা গ্রহণ করা একেবারেই উচিত নয়।

হাসান ও হুসাইন রা.এর নতুন কাপড়ের জন্য কান্নাকাটি

[ভিত্তিহীন ঘটনা-১৫] হাসান ও হুসাইন রা. তখন ছোট। একবার ঈদে তাদের নতুন পোশাকের ব্যবস্থা হয়নি। ঈদের দিন সকালে তাই তারা দু'জন খুব কান্নাকাটি করছিলেন। 'তোমাদের নতুন কাপড় দেওয়া হবে' এ কথা বলে ফাতেমা রা. তাঁদের শান্ত করে গোসল করতে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সেজদায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন। তখন জিবরাঈল আ. দর্জির বেশ ধরে দু'টি নতুন কাপড় নিয়ে আসেন। একটি লাল, আরেকটি নীল। নতুন কাপড় পেয়ে তারা খুবই খুশি হল। নানাজীকে দেখানোর জন্য তারা কাপড় দু'টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল। কিন্তু তিনি কাপড় দু'টি দেখে কেঁদে ফেলেন। এরপর লাল কাপড়টি হুসাইন রা.কে আর নীল কাপড়টি হাসান রা.কে পরিয়ে দেন। হুসাইন রা.এর শাহাদাত এবং হাসান রা.কে বিষ পান করানোর প্রতি ইঙ্গিত ছিল কাপড় দুটিতে। যা পরবর্তী সময়ে বাস্তবতা হয়ে দেখা দেয়।

ঘটনাটির ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনাও নবী-পরিবারের সঙ্গে ঘটতে পারে। কিন্তু তার পক্ষে প্রমাণ প্রয়োজন, নির্ভরযোগ্য সূত্র প্রয়োজন। এখানে (আমাদের জানা মতে) তা অনুপস্থিত। নবী পরিবারের সদস্যদের দুনিয়ার প্রতি যে নিরাসক্তি আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। তাছাড়া ঈদের দিন নতুন কাপড়ই পড়তে হবে, পুরনো কাপড় পরা যাবে না-এমন ধারণা তখন ছিল না। সম্ভব হলে নতুন পোশাক নতুবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তুলনামূলক ভালো পোশাক পড়াই তখন রেওয়াজ ছিল।

উয়াইস কারনী রহ.এর দাঁত ভেঙে ফেলা

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১৬] ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দাঁত ভেঙে যায়। উয়াইস কারনী রহ. তা জানতে পেরে নিজের সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ দাঁত ভেঙেছে তা তিনি জানতেন না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন–

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا اشْتَهَرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ مِنْ أَنَّ أُوَيْسًا قَلَعَ جَمِيْعَ أَسْنَانِهِ لِشِدَّةِ أَحْزَانِهِ، حِيْنَ سَمِعَ أَنَّ سِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصِيْبَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ

يَعْرِفْ خُصُوْصَ أَيِّ سِنٍّ كَانَ بِوَجْهٍ مُعْتَمَدٍ: فَلَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيْعَةِ الْغَرَّاءِ، وَ لِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكُبَرَاءِ، عَلٰى أَنَّ فِعْلَهُ هٰذَا عَبَثٌ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنِ السُّفَهَاءِ...» اِنْتَهَى الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ.

"ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়ে একটি দাঁত ভেঙে যাওয়ার খবর শুনে শোকে-দুঃখে উয়াইস কারনী রহ. নিজের সকল দাঁত উপড়ে ফেলার যে কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞদের দৃষ্টিতে তার **কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া কাজটি শরীয়তবিরোধী, তাই কোনো সাহাবী এ কাজ করেননি।** সর্বোপরি কাজটি অযথা একটি কাজ, নির্বোধ লোক ছাড়া কেউ তা করতে পারে না।"

আহমদ গুমারী রহ. মোল্লা আলী কারী রহ.-এর কথা সমর্থন করেছেন। –আলমা'দিনুল আদানী ফী ফাযলি উয়াইস আলকারনী (পাণ্ডুলিপি), আলবুরহানুল জালী ফী তাহকীকি ইনতিসাবিস সুফিয়্যাতি ইলা আলী ১৬৪-১৬৫

মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক মানুষ নয়। হাত-পা, চোখ-কান, নাক-মুখ-দাঁত ইত্যাদি শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলা মানুষকে আমানতস্বরূপ দান করেছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে এসব আমানতের হিসাব নেবেন। মালিক নয় বলেই কারও জন্য নিজের শরীরের কোনোরূপ ক্ষতি করা জায়েয নয়। জায়েয নয় নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়া। **দাঁত উপড়ে ফেলার কথা আলোচনা করতে গিয়ে এ জন্যই মোল্লা আলী কারী রহ. বলেছেন, 'কাজটি শরীয়তবিরোধী।'**

উয়াইস কারনী রহ. অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের তাবেঈ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ তাবেঈর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দাঁত ভেঙে ফেলার মতো শরীয়তবিরোধী কাজ তিনি করতেই পারেন না। ভিত্তি ছাড়া কোনো তাবেঈর নামে এ রকম কথা বলে দেওয়া ঠিক নয়।

উল্লেখ্য, মোল্লা আলী কারী রহ. উয়াইস কারনী রহ. সম্পর্কে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম 'আলমা'দিনুল আদানী ফী ফাযলি উয়াইস আলকারনী'। আমাদের জানা মতে এই পুস্তিকাটি এখনও ছাপেনি। আহমদ গুমারী রহ.এর কিতাবে মোল্লা আলী কারী রহ.এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমরা সেখান থেকেই তা উদ্ধৃত করেছি। পরবর্তী সময়ে আমরা মোল্লা আলী কারী রহ.এর পুস্তিকাটির একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির

সন্ধান পাই। 'মাকতাবাতুল মালিক আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয'-এ এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। আহলে ইলম উলামায়ে কেরামের জন্য এখানে উক্ত বক্তব্যের প্রতিচিত্র দেওয়া হল–

منه وقد بينت معنى هذا الحديث في شرح الأربعين والله
الموفق والمعين ثم اعلم ان ما اشتهر على ألسنة العامة من
ان اويسا قلع جميع اسنانه لشدة احزانه حين سمع ان
سن النبي صلى الله عليه وسلم اصيب يوم احد ولم يعرف
خصوص اي سن كان بوجه معتمد فلا اصل له عند العلماء
مع انه مخالف للشريعة الغراء ولذا لم يفعله احد من الصحابة
الكبراء على ان فعله هذا عبث لا يصدر الا عن السفهاء، وكذا
لا يثبت نسبة الخرقة النبوية اليه ومنه الى بعض المشايخ
بما لا يعتمد عليه وكذا بلغني الذكر الخفي او الجلي ونسبته

উয়াইস কারনী রহ.কে খিরকা দিয়ে যাওয়া

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১৭] ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইস কারনী রহ.কে নিজের একটি খিরকা দিয়ে যান। উমর ও আলী রা.কে এই খিরকা পৌছে দেওয়ার জন্য তিনি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁরা এই খিরকা উয়াইস কারনীকে পৌছে দেন।

খিরকা প্রদানের এই ঘটনা প্রমাণিত নয়। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন–

وَكَذَا مَا اشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ أَوْصٰى عُمَرَ وَعَلِيًّا بِخِرْقَتِهِ لِأُوَيْسٍ وَأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ وَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ مَعَ أُوَيْسٍ وَهَلُمَّ جَرًّا، فَلَا أَصْلَ لَهُ أَيْضًا.

"এমনিভাবে খিরকা পৌছে দেওয়ার জন্য উমর ও আলী রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত করা, উমর ও আলী রা. কর্তৃক উয়াইস কারনী রহ.কে তা পৌছানো এবং উয়াইস কারনীর মাধ্যমেই এই খিরকা পরবর্তী সুফীদের কাছে পৌছানো ইত্যাদি যে কথাগুলো সুফীদের নিকট প্রসিদ্ধ তার কোনোটিরই ভিত্তি নেই।"

ইসমাঈল আজলূনী ও আহমদ গুমারী রহ. তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।
–আলমাসনূ ২৬৯, আলআসরারুল মারফূআ ১৮১, কাশফুল খাফা ২/১২৬, আলবুরহানুল জালী ১৬৩-১৬৭, আলমা'দিনুল আদানী ফী ফাযলি উয়াইস আলকারনী (পাণ্ডুলিপি)

ইলম অন্বেষণ, পড়াশোনা
আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসা

জ্ঞানার্জনের জন্য চীনে গমন

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

[হাদীস নয়-১৮] **'জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।'**

বাক্যটি হাদীস হিসেবে ব্যাপক প্রসিদ্ধ। আসলে তা হাদীস নয়। এর বর্ণনাসূত্রে আবু আতেকা তারিফ ইবনে সুলাইমান নামে এক রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের দৃষ্টিতে সে মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিল না।

ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন–

مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

'সে আপত্তিকর রেওয়ায়েত বর্ণনা করে।'

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেছেন–

لَيْسَ بِثِقَةٍ.

'সে কোনো দিক থেকেই নির্ভরযোগ্য নয়।'

ইমাম আবু জাফর উকাইলী রহ. বলেছেন–

مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ.

'তার হাদীস পরিত্যক্ত।'

তার ব্যাপারে হাদীস জাল করার অভিযোগও রয়েছে।

ইমাম আহমদ রহ.এর সামনে বাক্যটি উল্লেখ করা হলে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন।[১]

---

[১] قَالَ الْمَرْوَذِيُّ: ذُكِرَ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ، فَأَنْكَرَهُ إِنْكَارًا شَدِيْدًا.

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেছেন–

هٰذَا بَاطِلٌ، لَا أَصْلَ لَهُ.

‘এটি একটি বাতিল বর্ণনা, এর কোনো ভিত্তি নেই।’

ইবনুল জাওযী রহ. তার কথা সমর্থন করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ বিন তাহের মাকদিসী রহ.এর মতে বর্ণনাটি জাল।

–আততারীখুল কাবীর ৪/৩৫৭-৩৫৮, আযযুআফাউল কাবীর ২/২৩০-২৩১, মীযানুল ইতিদাল ২/৩৩৫, ৪/৫৪৩, আলমুনতাখাব মিনাল ইলাল লিল-খাল্লাল, ইবনে কুদামা ১২৯, কিতাবুল মাওযূআত ১/৩৪৭, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২৯, আরও দেখুন, আলমুসহিম, আহমদ গুমারী ১৯, ২১-২২, ৩৫, আলকামেল, ইবনে আদী ৫/১৮৮-১৮৯, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২৭২ (টীকা), হাশিয়ায়ে শায়খুল হিন্দ আলা মুখতাসারুল মাআনী ১৫৪

ইসলামে ইলম অন্বেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। একাধিক হাদীসে ইলম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযীলতের কথাও এসেছে কয়েকটি হাদীসে। ইলম অন্বেষণে, বিশেষত হাদীস শেখার জন্য মুসলিম মনীষীদের দূর দূর দেশ সফর করার শত-সহস্র নজির রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এমন অনেক মনীষী আছেন যাঁরা শুধু একটি হাদীস শোনার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশ সফর করেছেন।[১] তাই ইলম অর্জনের জন্য সফর করা ইসলামে একটি স্বীকৃত ও নন্দিত বিষয়। কিন্তু ‘জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও’ কথাটি রাসূলের হাদীস নয়। হাদীস হিসেবে তা বলা, লেখা ও প্রচার করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহীহ হাদীস–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] «وَإِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (٣٧٤١) وَأَحْمَدُ (٢١٧١٥، ٢١٧١٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٨٢) وَابْنُ حِبَّانَ (٨٨).

[সহীহ হাদীস] “আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তালেবে ইলমের (দ্বীনী ইলম অন্বেষণকারীর)

---

[১] দেখুন, খতীব বাগদাদী রহ. রচিত ‘আররিহলাতু ফী তলাবিল হাদীস’।

জন্য ফেরেশতারা নিজেদের ডানা বিছিয়ে রাখে। আসমান-জমিনের সবাই এমনকি পানির নিচের মাছও আলেমের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করে। আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব নক্ষত্রের উপর পূর্ণিমার চাঁদের মতো। আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৪১, জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ইবনে হিব্বান, হাদীস ৮৮, আরও দেখুন, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২১৭১৫-২১৭১৬ (৫/১৯৬ টীকা)

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ.

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো কওমের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে কিতাবুল্লাহ তেলাওয়াত করে, কিতাবুল্লাহ পড়ে এবং পড়ায় তখন ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে রাখে, তাদের উপর 'সাকিনা' নাযিল হয়।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

ইলম অন্বেষণে সফর করা

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٩٩)

[সহীহ হাদীস] "ইলম অর্জনের জন্য যে 'পথ চলে' আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ». قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[সহীহ হাদীস] "আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, যে ইলম অন্বেষণে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৪৭

[সহীহ আছার] সাহাবী হযরত জাবের রা. একটি মাত্র হাদীস শোনার জন্য এক মাস সফর করে শামে গিয়েছিলেন। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬০৪২ (৩/৪৯৫)

একটি জরুরি বিষয়

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ 'ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীনে যাও' এ বাক্যটিকে কোনো কোনো বর্ণনাকারী طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য' এ হাদীসের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করেছে। এটি ভুল। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা। দু'টির হুকুমও ভিন্ন। একটি হাদীস, অপরটি হাদীস নয়। طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ কে অনেকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'হাসান' বলেছেন।

বাক্য দু'টি কোনো কোনো বর্ণনায় একসঙ্গে আসায় অনেকে أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِকেও 'হাসান' মনে করেছেন। এ ধারণা ঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাসিক আলকাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঈ. (একটি প্রচলিত বর্ণনা : প্রশ্ন ও উত্তর, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক)

আসরের পর পড়াশোনার ক্ষতি

مَنْ أَحَبَّ كَرِيْمَتَهُ فَلَا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১৯] যে তার চোখ দুটিকে ভালোবাসে সে যেন আসরের পর লেখালেখি না করে।

এটি হাদীস নয়। হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেছেন–

لَيْسَ فِي الْمَرْفُوْعِ.

'হাদীস হিসেবে বাক্যটি পাওয়া যায় না।'

মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী ও আবুল মাহাসিন কাউক্জী রহ. প্রমুখও অনুরূপ মত প্রদান করেছেন।

–আলমাকাসিদুল হাসানা ৬২৬, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৬২, আলমাসনূ ১৭৬, আলআসরারুল মারফূআ ২১৬, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/২৭৪

আসরের পর পড়াশোনা করাকে অনেকে স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে চোখের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। এর কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। এ সম্পর্কে কোনো হাদীসও নেই। তাই এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নির্দেশনাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আমাদের জানামতে আসরের পর পড়াশোনা করার ব্যাপারে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কম আলো কিংবা অন্ধকারে পড়ালেখা করা চোখের জন্য ক্ষতিকর বলে মতামত দিয়ে থাকেন চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ।

মেয়েদের হস্তলিপি শেখা

[জাল বর্ণনা-২০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের হস্তলিপি শেখাতে বারণ করেছেন।

কথাটি ঠিক নয়। আদৌ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের হস্তলিপি শেখাতে বারণ করেননি। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে উপরিউক্ত কথাটি রাসূলের নামে বানানো একটি জাল বর্ণনা।

–আলকামেল, ইবনে আদী ২/৩৯৫, কিতাবুল মাওযূআত ৩/৬৩, মীযানুল ইতিদাল ১/৪১৯, লিসানুল মীযান ২/৪৭৯, আললাআলিল মাসনূআ ২/১৬৮, তানযীহুশ শরীয়া ২/২০৮-২০৯, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১২৬-১২৭, তালখীসুল মুস্তাদ্রাক ২/৩৯৬, আওনুল মা'বুদ ১০/২৬৮-২৬৯, ইমদাদুল আহকাম ১/২১৪-২১৫, আলআজবিবাতুল মারযিয়া, সাখাবী ২/৭৮৭-৭৯১, আরও দেখা যেতে পারে– মাজমূআতুল ফাতাওয়া, আবদুল হাই লাখনোভী ১/১৩৪-১৩৬ (উর্দু)

প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা নারী-পুরুষ সবার উপর ফরয। সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখা, কুরআনের মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল, দুআ-দরূদ, হাদীস শরীফ ইত্যাদি শিক্ষা করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই আর মেয়েদের হস্তলিপি শেখার ব্যাপারে শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই। হাদীসে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. লায়লা নামের এক নারী সাহাবীর কাছ থেকে (যিনি 'শিফা' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন) লেখা শিখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৬৪৪৯, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৭

আয়েশা রা.এর বোনের মেয়ে (যার নামও ছিল আয়েশা) তাঁর কাছে থাকতেন। আয়েশা রা.এর কাছাকাছি থাকার কারণে লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে তার কাছে (বিভিন্ন বিষয়ে) চিঠি পাঠাত। তিনি আয়েশা রা.কে দেখিয়ে সেগুলোর জবাব লিখতেন। –আলআদাবুল মুফরাদ, বুখারী ৩৮২

বোঝা গেল, নবীযুগে ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে মেয়েদের হস্তলিপি শেখা একটি স্বীকৃত বিষয় ছিল।

লেখালেখির যোগ্যতা একটি প্রশংসনীয় গুণ। দ্বীনদারি ও পরহেযগারি থাকলে এর মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করাও সম্ভব। দ্বীনদারি না থাকলে নারী কেন অনেক পুরুষের জন্যও তা কাল হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় তাকওয়া ও খোদাভীতি, নারী-পুরুষের পার্থক্য নয়।

ইলম অনুযায়ী আমল করার ফযীলত

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

[হাদীস নয়-২১] যে ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্ তাকে অজানা বিষয়ের জ্ঞান দান করেন।

কথাটি হাদীস নয়। এর নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ (সূত্র) নেই। যে সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে হাদীস বিশারদদের মতে তা জাল ও বানোয়াট।

–হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/১৩, আন্নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনুস সালাহ, বদরুদ্দীন যারকাশী ২/২৯৬, ফাতহুল মুগীস, সাখাবী ২/১২৬, আলমুদাভী, আহমদ গুমারী ৪/৩৭০-৩৭১, রিসালাতুল মুস্তারশিদীন ১৫৪

উপরিউক্ত বর্ণনাটি 'হাদীস নয়' বলে ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয় কিছুতেই। ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব একটি স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। তাই এ বিষয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে শুধু একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হল–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٤١٧) وَقَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ».

[সহীহ হাদীস] "আবু বারযা আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা এ কয়টি বিষয়ে জবাব না দিয়ে সামনে বাড়তে পারবে না– তার জীবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছে, **তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে**, কোত্থেকে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোন কোন খাতে তা ব্যয় করেছে, কী কী কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৭

জ্ঞানীর কলমের কালির মর্যাদা

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ

[হাদীস নয়-২২] বিদ্যানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও দামি।

বর্ণনাটির গ্রহণযোগ্য কোনো সনদ (বর্ণনাসূত্র) নেই। যে কয়টি সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী তার কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। খতীব বাগদাদী রহ. মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারী নামক একজন বর্ণনাকারীর সূত্রে অন্য একটি বর্ণনার সঙ্গে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন–

رِجَالُ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَنَرٰى الْحَدِيْثَيْنِ مِمَّا صَنَعَتْ يَدَاهُ.

"আমার দৃষ্টিতে এই দুই বর্ণনা মুহাম্মদ ইবনে হাসান কর্তৃক জালকৃত।"

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. উক্তিটির তিনটি সনদ উল্লেখ করে কোনোটিই প্রমাণিত নয় বলে মত দিয়েছেন।[১] তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

প্রথম সনদ সম্পর্কে–

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْخَطِيْبُ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَنَرَاهُ مِمَّا صَنَعَتْ يَدَاهُ.

দ্বিতীয় সনদ সম্পর্কে–

وَهٰذَا لَا يَصِحُّ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ لَايَرْوِيْ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ شَيْئًا، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوْعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ.

তৃতীয় সনদ সম্পর্কে–

---

[১] ইবনুল জাওযী রহ. বর্ণনাগুলোর হুকুম বলতে গিয়ে لَايَصِحُّ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হল 'সহীহ নয়'। এতে অনেকে মনে করতে পারেন, 'সহীহ' না হলেও বর্ণনাগুলো হাসান বা যয়ীফ হতে পারে। তাই তাদের ধারণা অনুসারে لَايَصِحُّ শব্দের অর্থ 'প্রমাণিত নয়' করা সঠিক নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইবনুল জাওযী রহ.এর বক্তব্যের পূর্বাপর দেখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন, 'প্রমাণিত নয়', তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য কিছুতেই এ নয় যে, এটি 'সহীহ' না হলেও 'হাসান' বা 'যয়ীফ' হতে পারে। এ কারণেই আমরা পূর্বাপরসহ তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে দিয়েছি। তাছাড়া ইবনুল জাওযী রহ. তাঁর এই গ্রন্থের (আলইলালুল মুতানাহিয়া'এর) ভূমিকায় বলেছেন–

وَقَدْ جَمَعْتُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ الْأَحَادِيْثَ الشَّدِيْدَةَ التَّزَلْزُلِ الْكَثِيْرَةَ الْعِلَلِ.

সুতরাং ইবনুল জাওযী রহ. এই কিতাবে যেখানে لَايَصِحُّ বলেছেন, সেখানে لَايَصِحُّ শব্দের অর্থ 'সহীহ নয়' করা, এরপর এই দাবি করা যে, বর্ণনাটি (ইবনুল জাওযী রহ.এর দৃষ্টিতেই) 'হাসান' বা 'যয়ীফ' হতে পারে– একেবারেই ঠিক নয়।

هٰذَا لَايَصِحُّ أَمَّا هَارُوْنُ بْنُ عَنْتَرَةَ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَايَجُوْزُ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ، يَرْوِيْ الْمَنَاكِيْرَ الَّتِيْ يَسْبِقُ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهُ الْمُتَعَمِّدُ لَهَا، وَيَعْقُوْبُ الْقُمِّيُّ ضَعِيْفٌ.

এ ছাড়া এর আরও কয়েকটি বর্ণনাসূত্র[১] আছে, কিন্তু তার কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়।

–তারীখে বাগদাদ ২/১৯৩-১৯৪, জামিউ বয়ানিল ইলম ১/১৫০-১৫১ (টীকাসহ) আলইলালুল মুতানাহিয়া ১/৮০, মীযানুল ইতিদাল ৩/৫১৭ (মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারী-এর জীবনী) লিসানুল মীযান ৭/৬৮, আদ্‌দুরারুল মুন্‌তাসিরা ১৬৬, ফয়যুল কাদীর ৬/৪৬৬, আলমুগীর, আহমদ গুমারী ১০১, আরও দেখুন, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২৮৭ (টীকাসহ), আললু'লুউল মারসূ ৭

একজন প্রকৃত আলেমে দ্বীনের কলমের কালি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান– শরয়ী দলিল ছাড়া এটি বলা কীভাবে সম্ভব?

শহীদের রক্ত ও আলেমের কলমের কালি দুটোর অবস্থান স্বতন্ত্র। আপন আপন অবস্থানে রেখেই প্রত্যেকটিকে মূল্যায়ন করা উচিত। একটির মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে অপরটিকে খাটো করে উপস্থাপন করা ঠিক নয়। একটিকে আরেকটির সঙ্গে তুলনা করারও দরকার নেই।

এ সম্পর্কিত আরেকটি জাল বর্ণনা

نُقْطَةٌ مِنْ دَوَاةِ عَالِمٍ عَلٰى ثَوْبِهِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَرَقِ مِئَةِ شَهِيْدٍ

[জাল বর্ণনা-২৩] আল্লাহ তাআলার কাছে আলেমের কাপড়ে লেগে থাকা এক বিন্দু কলমের কালি শত শহীদের ঘামের চেয়েও প্রিয়।

বর্ণনাটি জাল। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী রহ. প্রমুখের মতে বর্ণনাটি জাল ও বানোয়াট।

–লিসানুল মীযান ৩/৪৫৭-৪৫৯, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৩২৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত, মুহাম্মদ তাহের পাটনী ২৩, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৩৭০, আলমাসনূ ২০৩, কাশফুল খাফা ২/৪৩১

---

[১] একটি বর্ণনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য তার একাধিক বর্ণনাসূত্র থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং বর্ণনাসূত্রগুলো (স্বতন্ত্রভাবে কিংবা সামষ্টিক বিচারে) গ্রহণযোগ্য হওয়া জরুরি। আলোচ্য বর্ণনাটি এমন নয়।

মসজিদ-মাদ্‌রাসার ফযীলত

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِيْ

[হাদীস নয়-২৪] মসজিদ আল্লাহর ঘর আর মাদ্‌রাসা আমার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ঘর।

এটি হাদীস নয়। আমাদের জানামতে ঠিক এ শব্দ-বাক্যে কথাটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো হাদীসগ্রন্থে নেই। তবে কথাটির প্রথমাংশের (মসজিদ আল্লাহর ঘর) সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায়। প্রায় এর কাছাকাছি শব্দে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১] কিন্তু বাক্যটির দ্বিতীয়াংশের (মাদরাসা আমার ঘর) সমর্থনে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। মাদরাসার বর্তমান রূপকাঠামোও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না। তখন দ্বীনী ইলমের চর্চা অনেকটা মসজিদকেন্দ্রিক ছিল। তবে সন্দেহ নেই, যেখানে কুরআন হাদীস শেখানো হয়, দ্বীনী ইলমের চর্চা হয় তা অত্যন্ত বরকতময় স্থান। হাদীসে আছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] . . . مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ.

[সহীহ হাদীস] "কোনো কওমের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে কিতাবুল্লাহ তেলাওয়াত করে, কিতাবুল্লাহ পড়ে ও পড়ায় তখন ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে রাখে, তাদের উপর 'সাকিনা' নাযিল হয়।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

ইমাম নববী রহ. বলেন, "(শুধু আল্লাহর ঘর নয়) মাদরাসা, সীমান্তচৌকি বা এ জাতীয় অন্য কোনো জায়গায় একত্র হলেও এ সওয়াব পাবে। আল্লাহর ঘরের উল্লেখ মূলত স্বাভাবিক রীতির[২] প্রতি লক্ষ করে করা হয়েছে।" –শরহু সহীহ মুসলিম ১৭/২২

---

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

[২] আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সে কালে দ্বীনী ইলমের চর্চা মৌলিকভাবে মসজিদকেন্দ্রিক ছিল। ইমাম নববী 'স্বাভাবিক রীতি' বলে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তাসাওউফ, পীর-মুরীদী ও ওলী-বুযুর্গ

শায়খের মর্যাদা

اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِيْ أُمَّتِهِ

[জাল বর্ণনা-২৫] উম্মতের জন্য নবী যেমন, অনুসারীদের জন্য শায়খ তেমন।

বাক্যটি হাদীস নয়। যে কয়টি সনদে (বর্ণনাসূত্রে) এটি বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। যেভাবে এ বাক্যে শায়খকে নবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা সঙ্গত নয়। হকের অনুগামী ও সুন্নতের অনুসারী পীর-মাশায়েখের সাহচর্য অবলম্বন করা খুবই জরুরি। ইসলামে তার যথেষ্ট গুরুত্বও রয়েছে। কিন্তু তাঁদেরকে 'কান্নাবিয়্যি' (নবীর মতো) বলে ফেলা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি।

বাক্যটি থেকে ভুল বুঝাবুঝিরও আশঙ্কা রয়েছে। (আল্লাহ মাফ করুন) 'নবীর মতো' এ কথা থেকে অনেকে মনে ক'রতে পারে, নবীর মতো শায়খও বুঝি মা'ছূম (নিষ্পাপ ও গোনাহের ঊর্ধ্বে) কিংবা শায়খের কথাও নবীর কথার মতোই শরীয়তের দলিল অথচ বাস্তবতা এই যে, নবী ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউই মা'ছূম নয়। কোনো শায়খের কথা শরীয়তের দলিল নয়। শায়খেরও কর্তব্য, নবীর সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং শরীয়ত মোতাবেক মানুষকে পরিচালিত করা।

বাক্যটি সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত : ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন–

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ وَإِنَّمَا يَقُوْلُهُ بَعْضُ النَّاسِ.

"এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, কোনো কোনো লোক তা বলে।"

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক কানাতিরী-এর জীবনীতে এটি উল্লেখ করে বলেছেন–

رَوٰى حَدِيْثًا بَاطِلًا.

অর্থাৎ এটি একটি 'বাতেল' বর্ণনা।

হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. তাঁর কথা উদ্ধৃত করে মৌন সমর্থন করেছেন।

হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেন–

وَكَذَا جَزَمَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوْعًا شَيْخُنَا يَعْنِي الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ.

"আমাদের শায়খ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এটি নিশ্চিত জাল বলে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন।"

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এটি বলেছেন 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে গানেম-এর জীবনীতে।

ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী রহ. ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

–মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১৮/৩৭৯, মীযানুল ইতিদাল ৩/৬৩২ (মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক কানাতিরী-এর জীবনী) লিসানুল মীযান ৪/৩০৯, ৭/৩১৭, তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩৩১-৩৩২ (আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে গানেম-এর জীবনী) আলমাকাসিদুল হাসানা ৪১২, তানযীহুশ শরীয়া ১/১০৭-১০৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২০

আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-২৬] আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।

বাক্যটি হাদীস নয়। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন–

«تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ» هٰذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ، وَلَا هُوَ مَعْرُوْفٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْمَوْضُوْعَاتِ عِنْدَهُمْ...

"রাসূলের হাদীস হিসেবে কোনো হাদীসগ্রন্থে এ বাক্যটি পাওয়া যায় না। কোনো আহলে ইলম মুসলিম মনীষীর উক্তি হিসেবেও তা প্রসিদ্ধ নয়। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে তা জাল বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত।"

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন–

وَ رَوَوْا فِيْ ذٰلِكَ أَثَرًا بَاطِلًا.

অর্থাৎ এটি একটি বাতেল বর্ণনা। –বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়া ২/১১৭০, মাদারেজুস সালেকীন ৩/২২৬-২২৭

ইলমে বাতেন

اَلْعِلْمُ الْبَاطِنُ سِرٌّ مِنْ سِرِّيْ . . .

[হাদীস নয়-২৭] ইলমে বাতেন আমার একটি গোপন বিষয়, যা আমি আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তরে উদিত করে থাকি। আমি ছাড়া আর কেউ সে বিষয় জানে না।[১]

ইবনুল জাওযী, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও ইবনে আররাক কিনানী রহ. প্রমুখ বর্ণনাটি সহীহ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। –আলইলালুল মুতানাহিয়া ১/১৭, তালখীসুল ইলালিল মুতানাহিয়া ৩৬, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/১৯২, তানযীহুশ শরীয়া ১/২৮০

এ মর্মের আরও একটি জাল বর্ণনা

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ حُذَيْفَةَ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ جِبْرِيْلَ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ : يَا جِبْرِيْلُ هُوَ سِرٌّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَحْبَابِيْ وَأَوْلِيَائِيْ وَأَصْفِيَائِيْ، أُوْدِعُهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ، لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

[জাল বর্ণনা-২৮] হাসান বসরী রহ. হুযায়ফা রা.কে বলেন, ইলমে বাতেন কী? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলমে বাতেন কী? তিনি আমাকে বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলমে বাতেন কী? তিনি আমাকে বলেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলমে বাতেন কী? আল্লাহ তাআলা বলেছেন– হে জিবরাঈল, ইলমে বাতেন আমার এবং আমার

---

[১] ইলমে মারেফাতের গোপন রহস্য, ইউনুস ফকীর ২৬ (মীনা বুক হাউস)

ওলী ও মাহবুব বান্দাদের মাঝের এক রহস্য, কোনো নবী বা নিকটবর্তী ফেরেশতাও এই রহস্য উদ্ধার করতে পারবে না।
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন, এটি জালকৃত। জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী রহ. প্রমুখ তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।
–যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/১৯২-১৯৩, তানযীহুশ শরীয়া ১/২৮০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৮, আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ ১২৪
উল্লেখ্য, ইলমে বাতেন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কিছু কথা প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ১৮১-১৮৫, প্রচলিত জাল হাদীস ১ম খ. ৮৫-৮৭ (প্রথম সংস্করণ)

নেককারদের আলোচনার ফযীলত

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

[হাদীস নয়-২৯] নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হয়।

এটি হাদীস নয়, মনীষীদের উক্তি। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. (মৃত্যু ১৯৮হি.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে কথাটি বলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ কথাটি কার? তিনি বলেন, মনীষীদের।
–যাম্মুল কালামি ওয়া-আহলিহী ৪/১৯১, কিতাবুয যুহ্দ ৩৯৪ (দারুর রাইয়ান) আরও দেখুন, মাসায়েলুল ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ৩৭৭

فِيْ «ذَمِّ الْكَلَامِ وَأَهْلِهِ» ٤/١٩١ : «...أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ: «تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ» قِيْلَ لِسُفْيَانَ: عَمَّنْ هٰذَا؟ قَالَ: عَنِ الْعُلَمَاءِ».

وَفِي «الزُّهْدِ» لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ ص٣٩٤: «قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ يُقَالُ: «عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ»، قِيْلَ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: بَعْضُ الْعُلَمَاءِ».

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, কুফার প্রসিদ্ধ আবেদ মুহাম্মদ বিন নায্র হারিছী[১] রহ.-ও এ কথাটি বলতেন।

---

[১] তাঁর জীবনী জানার জন্য দেখুন, হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/২৩৮-২৪৬, তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/৭৪১ (মৃত্যুসন ১৭০হি. থেকে ১৮০হি.এর মধ্যে।)

–শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআহ ৯/১০০-১০১ (সনদ নির্ভরযোগ্য)

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. কখনও নিজেও এ কথাটি বলতেন। তাই অনেক কিতাবে কথাটিকে তাঁর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। –হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৩৫, আত্তামহীদ, ইবনে আবদুল বার্ ১৭/৪২৯

প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে অনেকে কথাটিকে হাদীস মনে করেন। এটি ঠিক নয়। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন, 'হাদীস হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই।' হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী রহ. প্রমুখ মুসলিম মনীষীগণও একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

–আলমুগনী আন হামলিল আসফার ২/৩২৯, আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৬৭, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৯৩, আলআসরারুল মারফূআ ১৬১, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৬২২, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৬/৩৫০-৩৫১

প্রসঙ্গত, পঞ্চম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে আবদুল বার্ রহ. রচিত 'জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া-ফাযলিহী' গ্রন্থে সনদ ও বরাত ছাড়া এ কথাটিকে সুফিয়ান ছাওরী রহ.এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে আবদুল বার্ রহ. নিজেই তাঁর অপর একটি গ্রন্থে (আত্তামহীদ ১৭/৪২৯) সনদসহ এটিকে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.-এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুরতাযা যাবিদী রহ. বলেন, "ইবনে আবদুল বার্ রহ.এর 'জামিউ বয়ানিল ইলম'-এ কথাটি সুফিয়ান ছাওরীর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ হল, এটি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.এর উক্তি।" –ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৬/৩৫১

উল্লেখ্য, নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল হওয়ার বিষয়টি অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস মনে না করে সালাফের উক্তি হিসেবে এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত একটি বাস্তব বিষয় হিসেবে এটি বলা যেতে পারে।

গোপন মুত্তাকী

[জাল বর্ণনা-৩০] কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের অধিক নিকটবর্তী সে ব্যক্তিই হবে, যে দুনিয়াতে অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও চিন্তান্বিত থাকবে। এ ধরনের লোকেরা হচ্ছে গোপন মুত্তাকী। এরা আত্মপ্রকাশ করলে কেউ তাদেরকে চেনে না এবং অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ খোঁজে না। ফেরেশতারা

তাদেরকে ঘিরে রাখে। তারাই ভালো লোক। আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যও উত্তমরূপে তারাই করে। লোকেরা নরম নরম শয্যায় শয়ন করে। আর তারা নিজেদের মস্তক ও হাঁটু বিছিয়ে দেয়। পয়গম্বরদের চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম তাদের মুখস্থ। যে জায়গা থেকে তারা চলে যায়, সেই জায়গা কাঁদে। যে শহরে তাদের কেউ না থাকে, সেই শহরের উপর গযব নাযিল হয়। তারা দুনিয়ার জন্য মৃতের উপর কুকুরের মতো লড়াই করে না। যে পরিমাণ খেলে নিঃশ্বাস বাকি থাকে, তারা সেই পরিমাণই খায় এবং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে। মলিন অবস্থার কারণে লোকেরা তাদের রোগগ্রস্ত মনে করে, অথচ তাদের কোনো রোগ নেই। কেউ কেউ মনে করে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত, অথচ এটাও নয়। পরকালের গৌরব তাদের জন্যই। ...যে শহরে এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় সে শহরের শান্তির কারণ তারাই। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা থাকে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে আযাব দেন না। ভূপৃষ্ঠও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাদের প্রতি রাযি। মানুষের মধ্যে তাদেরকে রাখার কারণ তাদের দ্বারা যথাসম্ভব মানুষকে মুক্তি দেওয়া। তুমি যদি আমৃত্যু ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করতে পার, তবে কর। এর কারণে তুমি উচ্চ মর্যাদা পাবে এবং নবীগণের কাতারে দাখেল হবে। তোমার আত্মা যখন ফেরেশতাদের কাছে যাবে তখন তারা আনন্দিত হবে এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করবেন।[১]

ইবনুল জাওযী রহ. বলেছেন–

هُوَ مِنْ عَمَلِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ.

'পরবর্তী যুগের কেউ তা বানিয়েছে।'

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন, ইবনুল জাওযীর বক্তব্য সঠিক।

–কিতাবুল মাওযূআত ৩/৩৯৬, তালখীসুল মাওযূআত ৩০৬, আরও দেখুন, আলমুগনী আন হামলিল আসফার ৩/১১৮, তানযীহুশ শরীয়া ২/৩০১

বোরাকে ওঠার জন্য আব্দুল কাদের জিলানীর কাঁধ বাড়িয়ে দেওয়া

[ভিত্তিহীন ঘটনা-৩১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে যাওয়ার সময় যখন বোরাকে উঠছিলেন তখন কিছুটা কষ্ট হচ্ছিল। কারণ বোরাক ছিল বেশ উঁচু। আবদুল কাদের জিলানী রহ. তখন কাঁধ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলানী রহ.এর কাঁধে পা দিয়ে বোরাকে উঠেন।

---

[১] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/২৭৮

মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.এর কাছে এর সত্যতা জানতে চেয়ে এক লোক চিঠি লিখেছিল। তিনি উত্তরে লিখেছিলেন–

یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اور اس کا واضع ملعون ہے۔

'নির্জলা মিথ্যা। এ ঘটনা যে বানিয়েছে সে অভিশপ্ত।' –ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/১৫৮।

জিলানী রহ.এর জন্ম ৪৭০হি.। মেরাজের রাতে তিনি পৃথিবীতে আসবেন কোত্থেকে?

উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা আব্দুল কাদের জিলানী রহ.কে অনেক কারামত দান করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর জীবনীতে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই কারামত কিছু মানুষের জন্য ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বড় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রবণতা মানুষের একটি স্বভাবজাত দুর্বলতা। ব্যক্তিত্বের বিশালতার সঙ্গে যখন কারামতের মতো অলৌকিক বিষয় যোগ হয় তখন বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। জিলানী রহ.এর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। কিছু লোক তাঁর নামে অনেক কারামতের ঘটনা বানিয়ে প্রচার করেছে। বিচক্ষণ ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন। এখানে আমরা তিনজন হাদীসবিশারদ ও ইতিহাসবেত্তার বক্তব্য উল্লেখ করছি।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ وَمُكَاشَفَاتٌ، وَلِأَتْبَاعِهِ وَأَصْحَابِهِ فِيْهِ مَقَالَاتٌ، وَيَذْكُرُوْنَ عَنْهُ أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا وَمُكَاشَفَاتٍ أَكْثَرُهَا مُغَالَاةٌ.

"তাঁর (আবদুল কাদের জিলানীর) অনেক 'আহওয়াল' ও কাশফ-ইলহাম রয়েছে। (যা প্রমাণিত, কিন্তু) তাঁর ভক্তরা (এগুলো ছাড়াও) আরও অনেক কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও কাশফ-ইলহামের কথা উল্লেখ করেছে এবং তাঁর সম্পর্কে তাদের এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে যার অধিকাংশই বাড়াবাড়ি।" –আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১৪/১৮১

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

لَيْسَ فِيْ كِبَارِ الْمَشَايِخِ مَنْ لَهُ أَحْوَالٌ وَكَرَامَاتٌ أَكْثَرُ مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهَا لَا يَصِحُّ، وَفِيْ بَعْضِ ذٰلِكَ أَشْيَاءُ مُسْتَحِيْلَةٌ.

"পীর-মাশায়েখের মধ্যে আবদুল কাদের জিলানী রহ.এর চেয়ে বেশি কারামত-কাশফ-ইলহাম আর কারও নেই। কিন্তু (যা বলা হয়) তার অনেকগুলোই সহীহ না। কিছু কিছু ঘটনায় তো এমন কিছু বিষয়েরও উল্লেখ আছে, যা বাস্তবে ঘটা কিছুতেই সম্ভব নয়।" –সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/১৮৮-১৮৯

তিনি আরও বলেন–

جَمَعَ الشَّيْخُ نُوْرُ الدِّيْنِ الشَّطْنُوْفِيُّ الْمُقْرِئُ كِتَابًا حَافِلًا فِيْ سِيْرَتِهٖ وَأَخْبَارِهٖ فِيْ ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ، أَتَى فِيْهِ بِالْبَرَّةِ وَأُذُنِ الْجَرَّةِ، وَبِالصَّحِيْحِ وَالْوَاهِيْ وَالْمَكْذُوْبِ، فَإِنَّهُ كَتَبَ فِيْهِ حِكَايَاتٍ عَنْ قَوْمٍ لَا صِدْقَ لَهُمْ.

"নুরুদ্দীন শাতনুফী আবদুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে সত্য-মিথ্যা, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য সব ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সত্য ঘটনা যেমন আছে তেমনি অসত্য, দুর্বল-অগ্রহণযোগ্য অনেক ঘটনাও আছে। কিছু মিথ্যাবাদী কর্তৃক বর্ণিত অনেক ঘটনা তিনি এতে উল্লেখ করেছেন।" –তারীখুল ইসলাম ১২/২৬৩

হাফেয ইবনে রজব রহ. বলেন–

وَلَهُ مَنَاقِبُ وَكَرَامَاتٌ كَثِيْرَةٌ. وَلٰكِنْ قَدْ جَمَعَ الْمُقْرِئُ-أَبُو الْحَسَنِ الشَّطْنُوْفِيُّ الْمِصْرِيُّ فِيْ أَخْبَارِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَمَنَاقِبِهٖ ثَلَاثَ مُجَلَّدَاتٍ، وَكَتَبَ فِيْهَا الطَّمَّ وَالرَّمَّ، وَكَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ هٰذَا الْكِتَابِ، وَلَا يَطِيْبُ عَلٰى قَلْبِيْ أَنْ أَعْتَمِدَ عَلٰى شَيْءٍ مِمَّا فِيْهِ، فَأَنْقُلَ مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مَشْهُوْرًا مَعْرُوْفًا مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْكِتَابِ، وَذٰلِكَ لِكَثْرَةِ مَا فِيْهِ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ الْمَجْهُوْلِيْنَ، وَفِيْهِ مِنَ الشَّطْحِ، وَالطَّامَّاتِ، وَالدَّعَاوٰى، وَالْكَلَامِ الْبَاطِلِ، مَا لَا يُحْصٰى وَلَا يَلِيْقُ نِسْبَةُ مِثْلِ ذٰلِكَ إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ رَحِمَهُ اللهُ.

ثُمَّ وَجَدْتُ الْكَمَالَ جَعْفَرَ الأُدْفُوِيَّ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّطْنُوْفِيَّ نَفْسَهُ كَانَ مُتَّهَمًا فِيْمَا يَحْكِيْهِ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ بِعَيْنِهٖ.

"তাঁর (আবদুল কাদের জিলানী রহ.এর) অনেক কারামত রয়েছে। কিন্তু আবুল হাসান শাতনুফী তাঁর জীবনী সম্পর্কে তিন খণ্ডে যে কিতাব রচনা

করেছে তাতে সে সত্য-মিথ্যা, নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ঘটনা উল্লেখ করেছে। (যাচাই বাছাই ছাড়া) যে কোনো শোনা কথা বলে দেওয়া কারও মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[১]

এ কিতাবের কিছু অংশ আমি দেখেছি। এর কোনো কথাই আমার কাছে নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি যে, আমি তা উল্লেখ করব। (কিছু ঘটনা এমন আছে যা এ কিতাব ছাড়াও অন্যান্য নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে, সেগুলোর কথা ভিন্ন।) কারণ হল, এতে উল্লেখকৃত প্রচুর ঘটনা পরিচয় জানা যায় না– এমন লোককর্তৃক বর্ণিত। এ ছাড়া রয়েছে অগণিত মিথ্যা, বাতেল, আজগুবি কথা-বার্তা, দাবি-দাওয়া, কিচ্ছা-কাহিনী, যা কিছুতেই আবদুল কাদের জিলানী রহ.এর দিকে সম্বন্ধ করা যায় না।

এ লেখাটি লেখার পর কামালুদ্দীন জাফর উদফুয়ীর একটি লেখা আমার চোখে পড়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'এই কিতাবে উল্লেখকৃত ঘটনাবলি শাতনুফী নিজেই বানিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।" –যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা ১/২৪৬-২৪৭

সুতরাং বিষয়টি সতর্কতার দাবিদার। যাচাই-বাছাই ছাড়া, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাত ছাড়া অবদুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে (বরং যেকোনো বুযুর্গ সম্পর্কে) প্রচারিত কোনো কথা, বাণী, উপদেশ বা ঘটনা গ্রহণ করা উচিত নয়।

আরও দেখুন, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৫৪৪-৫৫২, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/১৫৫-১৫৮

---

[১] এটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত (ক্রমিক নং ৫) একটি হাদীসের অনুবাদ। এটি উল্লেখ করে ইবনে রজব রহ. ইঙ্গিত করেছেন যে, এ গ্রন্থে যাচাই-বাছাই ছাড়া অনেক কথা ও অনির্ভরযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

দুআ-দরূদ

দরূদ পাঠের নির্দিষ্ট ফযীলত

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৩২] আদম আ. ও হাওয়া আ.এর বিয়ের মোহর ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশবার দরূদ পাঠ করা।

দরূদ পাঠের ফযীলত বয়ান করতে গিয়ে অনেকে এ কথাটি বলে থাকেন। কথাটির কোনো সূত্র (সনদ) খুঁজে পাওয়া যায় না। দশম শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেছেন–

وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِهِ «سَلْوَةُ الْأَحْزَانِ» قِصَّةً طَوِيْلَةً لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا مُسْنَدَةً فِيْ تَزْوِيْجِ أَبِيْنَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِحَوَّاءَ، وَأَنَّهُ لَمَّا رَامَ الْقُرْبَ مِنْهَا طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ، فَقَالَ يَا رَبِّ! مَاذَا أُعْطِيْهَا؟ قَالَ: يَا آدَمُ! صَلِّ عَلَى صَفِيِّيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عِشْرِيْنَ مَرَّةً...

অর্থাৎ ইবনুল জাওযী 'সালওয়াতুল আহযান' কিতাবে এটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি এর সনদ পাইনি। –আলকাওলুল বাদী ১৩১

অনেক তালাশ করে আমরাও এর কোনো সনদ খুঁজে পাইনি। আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাস্তাল্লানী 'আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া'-এ (১/৭৬) এটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনিও এর কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া-এর ভাষ্যকার মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকীও শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া (১/১০০-১০১)-এ এর কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। আর আহলে ইলমগণ তো জানেন, সনদ ছাড়া এ ধরনের কথা গ্রহণ করা যায় না।

সহীহ হাদীসে দরূদ পাঠের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। সনদহীন উক্ত কথাটি না বলে সহীহ হাদীসে দরূদ পাঠের যেসব ফযীলতের কথা এসেছে সেগুলো বলেই দরূদ পাঠে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব এবং এটাই কর্তব্য।

ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার ভিন্ন ভিন্ন দুআ

[হাদীসে নেই-৩৩] কোনো কোনো ওযিফার বইয়ে ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার ভিন্ন ভিন্ন দুআ উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুআগুলো নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রমাণিত নয়।[১] তাই এ দুআগুলোকে 'মা'ছূর দুআ' (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত) মনে করা যাবে না। তবে দুআগুলোর অর্থ যেহেতু ভালো তাই কেউ যদি 'ভালো দুআ' হিসেবে ওযুর সময় বা অন্য কোনো সময় অর্থের দিকে লক্ষ করে পড়ে তাহলে তা নাজায়েযও হবে না। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এগুলো হাদীসের দুআ নয়।

ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার দুআগুলো সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

ইমাম নববী রহ. বলেছেন–

أَمَّا الدُّعَاءُ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ فَلَمْ يَجِئْ فِيْهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

"ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় পড়ার মতো কোনো দুআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।"

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন–

وَأَحَادِيْثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ كُلُّهَا بَاطِلٌ، لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ يَصِحُّ.

"ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার দুআগুলো সবই ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে কোনো দুআই প্রমাণিত নয়।"

ইমাম আবু আমর ইবনুস সালাহ, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মুহাম্মদ ইবনে আল্লান মক্কী, মুহাম্মদ শাওকানী, সিরাজুদ্দীন হিন্দী, যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম, উমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম মিসরী, আহমদ ইবনে ইসমাঈল তাহতাভী, আলাউদ্দীন মারদাভী রহ. প্রমুখও দুআগুলো প্রমাণিত নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

–আলআযকার ৩৫, আলমানারুল মুনীফ ১২০, যাদুল মাআদ ১/১৮৭-১৮৮, আলওয়াবিলুস সায়্যিব ৩৮৪; নাতায়িজুল আফকার ১/২৫৬-২৬০, আততালখীসুল হাবীর ১/২৬১, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৩৭৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/৭১,

---

[১] দুআগুলো জানার জন্য দেখুন, নাতায়িজুল আফকার ১/২৫৬

তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩১-৩২, আলফুতূহাতুর রব্বানিয়া ২/২৭-৩০, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১৩, আলমাজরূহীন ২/১৬৪, আলইলালুল মুতানাহিয়া ১/৩৩৮, আন্নাহরুল ফায়েক ১/৫০, আলইনসাফ, মারদাভী ১/১৩৭-১৩৮, আলবাহরুর রায়েক ১/৫৮, হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৬, হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাদ দুররিল মুখতার ১/৭৫, শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ, মুগলাতায় ১/৪২২

দুটি বিষয়

১. এ দুআগুলো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় অনেকে ভেবেছেন, এগুলোর হয়তো 'ভিত্তি' আছে। এই ভাবনা ভুল। শাস্ত্রীয় মাপকাঠিতে সূত্রগুলো এতটাই দুর্বল যে, এগুলোর উপর কিছুতেই নির্ভর করা চলে না। হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন–

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا مَا يَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ، لَا مُنْفَرِدًا وَلَا مُنْضَمًّا بَعْضُهُ بَعْضًا.

"...কারণ এ সূত্রগুলোর কোনোটিই আমলযোগ্য নয়, না ভিন্ন ভিন্নভাবে, না সামষ্টিক বিচারে।" –আলফুতূহাতুর রব্বানিয়া ২/২৮-২৯

তিনি আরও বলেন–

وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ جَمِيْعَ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ لَا تَخْلُوْ عَنْ كَذَّابٍ وَمُتَّهَمٍ بِهِ، وَحِيْنَئِذٍ فَقَدْ بَانَ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (اَلْإِمَامُ النَّوَوِيُّ).

"আমি উপরে যা উল্লেখ করেছি তা থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন, এই দুআগুলোর সবগুলো সূত্রেই হয় 'মিথ্যাবাদী' কিংবা 'মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত' ব্যক্তি রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, লেখকের (ইমাম নববীর) কথাই ঠিক। (অর্থাৎ দুআগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়)।" –আলফুতূহাতুর রব্বানিয়া ২/২৮-২৯

২. এ দুআগুলো হয়তো কোনো বুযুর্গ মনীষী পড়তেন। এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি মনে রাখা প্রয়োজন– কোনো বুযুর্গ বা মনীষীর কথা, উক্তি, বাণী বা দুআর অর্থ 'ভালো' হলেই তাকে হাদীস বলা যায় না। হাদীস হতে হলে নির্ভরযোগ্যসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হতে হয়। তবে কোনো বিষয় হাদীস না হলেই তা বলা যাবে না– এমন নয়। 'বুযুর্গের দুআ' কিংবা 'মনীষীর উক্তি' হিসেবে তা বলা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে, কেউ যেন এগুলোকে 'হাদীস' মনে না করে বসে।

যেসব দুআ প্রমাণিত

[সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব দুআ উল্লেখ করা হয়নি]

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ، وَفِيْهِ: «تَوَضَّؤُوْا بِسْمِ اللهِ».

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢٠٥٣٥) وَأَحْمَدُ (١٢٦٩٤) وَالنَّسَائِيُّ ٦١/١ (٧٨)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١٤٤) وَابْنُ حِبَّانَ (٦٥٤٤).

[সহীহ হাদীস] "আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে ওযু করো।" –মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস ২০৫৩৫, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২৬৯৪, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৭৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৪৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৫৪৪

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣٤)

[সহীহ হাদীস] "উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যখন ভালোভাবে ওযু করে এই দুআ পড়ে–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়। সে যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

দুআটির অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، طُبِعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابِعٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَمْ تُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِيْ «عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (٨١، ٨٢، ٨٣) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي«الدُّعَاءِ» (٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١) مَرْفُوْعًا وَمَوْقُوْفًا، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ الْوَقْفَ، وَمَعَ هٰذَا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، قَالَ الْحَافِظُ فِيْ «نَتَائِجِ الْأَفْكَارِ» ١/٢٤٦: «... فَهٰذَا مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيْهِ، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ». وَقَالَ فِيْ ١/٢٤٥: «هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ -الْمَوْقُوْفَةِ-».

[সহীহ হাদীস] "আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু করে এই দুআ পড়ে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

আল্লাহ তার এই দুআকে মোহরাঙ্কিত করে দেন। এরপর তা আরশের নিচে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কেয়ামত পর্যন্ত তা খোলা হয় না।"

দুআটির অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার অভিমুখী হচ্ছি।

–আমালুল য়াওমি ওয়াল-লাইলা, নাসায়ী, হাদীস ৮১-৮৩, আদ্‌দুআ, তবারানী, হাদীস ৩৮৮-৩৯১, উজালাতুর রাগিবিল মুতামান্নি ফী তাখরীজি কিতাবি আমালিল য়াওমি ওয়াল-লাইলা, ইবনুস্ সুন্নী ৭৩-৭৫ (৩১)

[গ্রহণযোগ্য আছার] বিশিষ্ট তাবেঈ সালিম ইবনে আবিল জা'দ রহ. বলেন, আলী রা. ওযু শেষ করে এ দুআ পড়তেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ «مُصَنَّفِهِ» ١/٢٣٢ (٢٠).

দুআটির অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/২৩২ (২০)

উল্লেখ্য, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনুস্ সুন্নী কর্তৃক রচিত আমালুল য়াওমি ওয়াল-লাইলা (একই নামের দুই গ্রন্থ) গ্রন্থে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে আছে–

[সহীহ হাদীস] আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করে এই দুআটি পড়লেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

দুআটির অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করুন। আমার রিযিকে বরকত দিন।

এই রেওয়ায়েতটিই মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, মুসনাদে আহমদ, ইমাম তবারানী কর্তৃক রচিত আদ-দুআ ইত্যাদি গ্রন্থে এভাবে এসেছে-

"আবু মুসা আশআরী রহ. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওযুর পানি আনলাম। **তিনি ওযু করে নামায পড়লেন। এরপর এই দুআটি পড়লেন...।**"

এতে অনুমিত হয়, প্রথম রেওয়ায়েতটি দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সংক্ষিপ্ত রূপ। যা হোক এটি যদিও নামাযের পরের দুআ,[1] তবে কেউ ওযুর পর এ দুআ পড়তে চাইলে পড়তে পারে।

দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১৫/২০২-২০৩, মুসনাদে আহমদ ৩২/৩৪৪ (হাদীস ১৯৫৭৪) আদদুআ, তবারানী, হাদীস ৬৫৬, আমালুল য়াওমি ওয়াল-লাইলা, নাসায়ী, হাদীস ৮০, আমালুল য়াওমি ওয়াল-লাইলা, ইবনুস সুন্নী, হাদীস ২৮, ইতহাফুল খিয়ারা ১/৪৬৯ (হাদীস ১৭৮) মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭২৩৬

ওযুর শুরুতে পড়ার দুআ

اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ، اَلْإِيْمَانُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৩৪] "আলইসলামু হাক্কুন, ওয়াল-কুফ্‌রু বাতিলুন, আলঈমানু নূরুন, ওয়াল-কুফ্‌রু যুলমাতুন।"

---

(1) هٰذَا الْحَدِيْثُ مَدَارُهُ عَلٰى مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، رَوَاهُ عَنْهُ: ١- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَ٢- عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ كِلَاهُمَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الدُّعَاءِ» (٦٥٦)، وَ٣- مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ فِيْ «مُسْنَدِهِ» كَمَا فِيْ إِتْحَافِ الْبُوْصِيْرِيِّ ١/٤٦٩(١٧٨)، وَ٤- ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَ٥- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِيْ «عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ص١٧٢(٨٠) وَابْنِ السُّنِّيِّ ص٢٩(٢٨)؛ فَفِيْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلٰى وَابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ عِنْدَ أَبِيْ يَعْلٰى (٧٢٣٦): «فَتَوَضَّأَ» فَقَطْ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ، وَأَبِي النُّعْمَانِ، وَمُسَدَّدٍ، وَابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ فِي «الْمُصَنَّفِ» ١٥/٢٠٢: «فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ قَالَ ...».

ওযুর শুরুতে এ দুআটি পড়ার কথা বলতে শোনা যায়। প্রসিদ্ধ কোনো হাদীসগ্রন্থে দুআটি আমরা খুঁজে পাইনি।

হিযবুল বাহ্‌র

[হাদীসের দুআ নয়-৩৫] يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيْمُ، يَا حَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، أَنْتَ رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ، فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّيْ، وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِيْ، تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ، نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَالْكَلِمَاتِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ، مِنَ الظُّنُوْنِ وَالشُّكُوْكِ، وَالْأَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوْبِ عَنْ مُطَالَعَةِ الْغُيُوْبِ، فَقَدِ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا، وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُوْرًا، فَثَبِّتْنَا وَانْصُرْنَا، وَسَخِّرْ لَنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ. . .

বিভিন্ন অযিফার বইয়ে 'হিযবুল বাহ্‌র'[১] নামে একটি দীর্ঘ দুআ উল্লেখ করা হয়। এ দুআটি হাদীসের দুআ নয়, সপ্তম শতকের একজন বুযুর্গ (আবুল হাসান শাযিলী, জন্ম ৫৯১ হি. ইন্তেকাল ৬৫৬ হি.)[২] কর্তৃক রচিত। দুআটিতে বিক্ষিপ্তভাবে কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াত এবং হাদীসের বিভিন্ন দুআ থাকলেও গোটা দুআ এক সঙ্গে কিংবা দুআর সব শব্দ-বাক্য হাদীসে নেই।

দুআটির বিভিন্ন উপকারিতার কথাও বলা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। এগুলো হয়তো পীর-মাশায়েখ নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন। দুআ-ই যেহেতু হাদীসের নয় তাই স্পষ্টতই হাদীসে এর কোনো ফযীলত বা উপকারিতার কথা থাকবে না। এটিকে হাদীসের দুআ মনে করা কিংবা এই দুআর কোনো উপকারিতার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মনে করা ঠিক নয়।

---

[১] পূর্ণ দুআটি জানতে দেখুন, আলওয়াফী বিল-ওফায়াত ২১/১৪২

[২] তাঁর সম্পর্কে জানতে দেখুন, তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ১৪/৭২৯, আলওয়াফী বিল-ওফায়াত ২১/১৪১-১৪২, আলআ'লাম, যিরিক্‌লী ৪/৩০৫, আররদ্দু আলাশ শাযিলী ফী হিযবাইহী, ইবনে তাইমিয়া ২২-৩০ (মুকাদ্দিমাতুল মুহাক্কিক)

প্রসঙ্গত, যে কোনো মা'ছূর দুআ (কুরআন হাদীসে উল্লেখিত দুআ) গায়রে মা'ছূর দুআর (কুরআন হাদীসে উল্লেখিত হয়নি এমন দুআর) তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

যে দুআ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারকে উচ্চারিত হয়েছে তার সঙ্গে অন্য কোনো দুআর তুলনাই চলে না। তাই হিযবুল বাহ্রসহ আরও যেসব গায়রে মা'ছূর দুআ আছে সেগুলোর তুলনায় মা'ছূর দুআ-দরূদের প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন–

...احادیث وقرآن مجید میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کا رتبہ اور اثر اس سے (حزب البحر) کہیں اعلی ہے، خوب یاد رکھو، لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔

"কুরআন মজীদ ও হাদীসে নববীতে যেসব দুআ উদ্ধৃত হয়েছে তার মর্যাদা ও প্রভাব-ক্রিয়া এর (হিযবুল বাহ্র) চেয়ে অনেক বেশি। বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে লোকেরা বড় ধরনের ভুলের শিকার হয়।"[১]

এই ভুলের প্রভাব অনেক সময় ভক্তি-বিশ্বাসে গিয়েও পড়ে। তাই তিনি কামালাতে আশরাফিয়ায় কিছুটা কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন–

عام طور پر قلوب میں اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقعت ہے کہ ادعیہ ماثورۃ کی وہ وقعت نہیں، اور اس کا غلو ہونا ظاہر ہے، بس اس کا ورد قابل ترک و منع ہے۔

"হিযবুল বাহ্র সম্পর্কে যে গাঢ়-বিশ্বাস মানুষের মনে রয়েছে, মা'ছূর দুআ (কুরআন হাদীসে বর্ণিত দুআ) সম্পর্কেও তা নেই। স্পষ্টতই এটি বাড়াবাড়ি। তাই এর (হিযবুল বাহ্র) অযিফা বন্ধ রাখা উচিত।" –কামালাতে আশরাফিয়া ৪১, আরও দেখুন, তারবিয়াতুস সালিক ২/৮৭৯

এখানে এ কথাও উল্লেখ করে দেওয়া আবশ্যক, কোনো গায়রে মা'ছূর দুআ-দরূদে (কুরআন হাদীসে অবর্ণিত দুআ-দরূদে) আপত্তিকর কোনো কথা না থাকলে সুন্নত মনে না করে তা পাঠ করাতে দোষের কিছু নেই। আপত্তিকর কথামুক্ত গায়রে মা'ছূর দুআ-দরূদ পাঠ করা সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আছে।

---

[১] মুনাজাতে মকবুল-এর সঙ্গে সংযুক্ত হিযবুল বাহ্র-এর মুখবন্ধ ২১৩

দুআয়ে ইবরাহীম

[হাদীসের দুআ নয়-৩৬] مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَزِيْدِ، وَالصُّبْحِ الْجَدِيْدِ، وَالكَاتِبِ الشَّهِيْدِ، يَوْمُنَا هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ، اُكْتُبْ لَنَا فِيْهِ مَا نَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الْحَمِيْدِ الْمَجِيْدِ، الرَّفِيْعِ الْوَدُوْدِ، الْفَعَّالِ فِيْ خَلْقِهِ مَا يُرِيْدُ. أَصْبَحْتُ بِاللهِ مُؤْمِنًا، وَبِلِقَاءِ اللهِ مُصَدِّقًا، وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا، وَمِنْ ذَنْبِيْ مُسْتَغْفِرًا، وَلِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ خَاضِعًا، وَلِسِوَى اللهِ جَاحِدًا، وَإِلَى اللهِ تَعَالٰى فَقِيْرًا، وَعَلَى اللهِ مُتَوَكِّلًا، وَإِلَى اللهِ مُنِيْبًا.

أُشْهِدُ اللهَ وَأُشْهِدُ مَلٰئِكَتَهٗ وَأَنْبِيَاءَهٗ وَرُسُلَهٗ وَحَمَلَةَ عَرْشِهٖ وَمَنْ خُلِقَ وَمَنْ هُوَ خَالِقٌ بِأَنَّ اللهَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، وَالْحَوْضَ حَقٌّ، وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ، وَمُنْكَرًا وَنَكِيْرًا حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَوَعْدَكَ حَقٌّ، وَوَعِيْدَكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ، عَلٰى ذٰلِكَ أَحْيَا، وَعَلَيْهِ أَمُوْتُ، وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا رَبَّ لِيْ إِلَّا أَنْتَ...

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. রচিত মুনাজাতে মকবুলের কোনো কোনো সংস্করণের শেষে 'দুআয়ে ইবরাহীম' নামে উপরোক্ত দুআটি ছাপা হয়েছে। এ দুআটি হাদীসের দুআ নয়। বরং তা প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.এর দুআ। ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইবরাহীম ইবনে বাশ্‌শার রহ. বলেন, তিনি প্রতি জুমাবার সকাল-সন্ধ্যায় দশবার দুআটি পড়তেন। –হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/৩৯-৪০

উল্লেখ্য, এ দুআটি মুনাজাতে মকবুলেরও অংশ নয়। কোনো কোনো প্রকাশক নিজস্ব উদ্যোগে মুনাজাতে মকবুলের শেষে তা ছেপে দিয়েছে। একসঙ্গে ছাপা হওয়ায় অনেকে এটিকে মুনাজাতে মকবুলের অংশ মনে করেন এবং মুনাজাতে মকবুলের অনেক দুআর মতো এ দুআকেও হাদীসের দুআ মনে করেন। এ ধারণা ঠিক নয়।

দুআয়ে ক্বাদাহ

[হাদীসের দুআ নয়-৩৭] بِاسْمِ اللهِ، بِاسْمِهِ الْمُبْتَدِئْ، رَبِّ الْأٰخِرَةِ وَالْأُوْلٰى، اَلَّذِيْ لَا غَايَةَ لَهُ، وَلَا مُنْتَهٰى لَهُ، لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى، اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى، لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى، وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى، اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى، اَللهُ الْعَظِيْمُ، عَظِيْمُ الْعُظَمَاءِ، دَائِمُ النُّعَمَاءِ، قَاهِرُ الْأَعْدَاءِ، اَلرَّحْمٰنُ الْعَاطِفُ عَلٰى خَلْقِهِ بِرِزْقِهِ، اَلْمَعْرُوْفُ بِلُطْفِهِ . . .

এ দুআটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. দুআটির উৎস : হাদীস, তাফসীর, সীরাত, শামায়েল, তারীখ ইত্যাদি শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থে দুআটি পাওয়া যায় না। মোল্লা আলী কারী রহ. এটি একটি ভিত্তিহীন দুআ বলে মত দিয়েছেন তাঁর লিখিত 'শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার' গ্রন্থে। –শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার ৪৪৫

কোত্থেকে অযিফার বইগুলোতে এই দুআটির অনুপ্রবেশ তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে শিয়া ইমামিয়া ফেরকার একজন লেখকের[১] একটি গ্রন্থে (মুহাজুদ দাআওয়াত ওয়া-মানহাজুল ইবাদাত ১১৭) আমরা দুআটি পাই। কিন্তু সেখানেও শিয়াদের কোনো উৎসগ্রন্থের বরাত উল্লেখ করা হয়নি। তথ্য যাচাইয়ের নির্ভরযোগ্য কোনো মানদণ্ড না থাকায় শিয়াদের লেখা গ্রন্থাবলি (এমনকি উৎসগ্রন্থাবলিও) মুসলিম মনীষীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। উৎসগ্রন্থেরই যেখানে গ্রহণযোগ্যতা নেই সেখানে সপ্তম শতকের একটি গ্রন্থে পাওয়া সনদহীন, উৎসগ্রন্থের বরাতহীন কোনো দুআ গৃহীত হতে পারে না।

খ. দুআটির সনদ : অনেক খোঁজাখুঁজির পরও এর (যয়ীফ বা মওযূ) কোনো সনদও (বর্ণনাসূত্র) পাওয়া যায়নি। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেছেন, এই দুআটির একটি সনদ তৈরি করেছে হাদীস জালকারীরা। কিন্তু সেই জাল সনদটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোল্লা আলী কারী রহ.এর বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল।

---

[১] রযিউদ্দীন আবুল কাসেম আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তাউস আলহাসানী আলহুসাইনী, জন্ম ৫৮৯, মৃত্যু ৬৬৪

হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

وَقَدْ يَذْكُرُ (اَلْوَاضِعُ) كَلَامًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، كَمَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ التَّعَاوِيْذِ فِيْ إِسْنَادِ دُعَاءِ الْقَدَحِ وَنَحْوِهِ، فَيَذْكُرُ لَهُ إِسْنَادًا جُلُّ رِجَالِهِ مِنْ أَعَاظِمِ الْمُحَدِّثِيْنَ، مُنْتَهِيًا إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَكَابِرِ أُمَّتِهِ كَالْخَضِرِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ، وَقَدْ يَذْكُرُ فِيْ آخِرِهِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِيْ هٰذَا كَفَرَ. بِاسْمِ اللهِ، بِاسْمِهِ الْمُبْتَدِيْ.

অর্থাৎ হাদীস জালকারী কখনও ভিত্তিহীন কোনো কথার সঙ্গে একটি জাল সনদ যুক্ত করে দেয়, যেমন দুআয়ে ক্বাদাহ-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে ...। –শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার ৪৪৫

আলহিযবুল আ'যমের ভূমিকায় তিনি বলেন–

وَوَجَدْتُ بَعْضَ الْعَوَامِّ يَتَقَيَّدُوْنَ بِقِرَاءَةِ دُعَاءِ نَحْوِ الْقَدَحِ، وَيَذْكُرُوْنَ فِيْ إِسْنَادِهِ مَا لَا شُبْهَةَ فِيْهِ مِنَ الْوَضْعِ.

"অনেক সাধারণ মানুষকে দেখলাম দুআয়ে ক্বাদাহের মতো দুআ পড়ে এবং তার এমন সনদ উল্লেখ করে, যা 'জাল' হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।" –আলহিযবুল আ'যম ৯

গ. দুআটির (বানোয়াট) প্রেক্ষাপট ও ফযীলত : দুআটির একটি 'বানোয়াট' প্রেক্ষাপটও উল্লেখ করা হয়। উদ্ভট ও আজগুবি কথাবার্তা সম্বলিত বর্ণনাটি পড়লেই সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে তার অসারতা ধরা পড়বে।

[জাল বর্ণনা] "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাতে আমি যখন ঊর্ধ্বাকাশে তখন একটি ভাসমান পাত্র (ক্বাদাহ) দেখতে পেলাম। পাত্রটির নূরের আলোয় আকাশমণ্ডলী আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। পাত্রটিতে সবুজ কালিতে একটি দুআ লেখা। আমি যখন আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হলাম, তিনি বললেন, তুমি কি পাত্রটি দেখেছ মুহাম্মদ?

: হ্যাঁ।

: শোন, এ পাত্রটি আমি তোমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমার জন্যই তা সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমান-জমিন সৃষ্টির পাঁচ শ বছর আগে আমার কুদরতি কলমে এ দুআটি আমি লিখেছি। যদি এ দুআর নূর না থাকত তাহলে জমিন স্থির থাকত না।

আল্লাহর দরবার থেকে ফিরে এসে আমি জিবরাঈল আ.কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দুআর ফযীলত কী?

তিনি বললেন, এ দুআর ফযীলত এত বেশি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তা বলে শেষ করতে পারবে না। জিন-ইনসান এর ফযীলত গুণে শেষ করতে পারবে না। মুহাম্মদ! আপনার জন্য সুসংবাদ। এ দুআ আপনারই জন্য। আপনার উম্মতের কেউ যদি জীবনে একবার মুসলমানদের কবরে গিয়ে এ দুআ পড়ে, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে! যে ব্যক্তি এ দুআর ফযীলত অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে!

কেউ যদি কোথাও বন্দি হয়ে থাকে আর খালেস নিয়তে দুআটি পড়ে তাহলে আল্লাহ্ তার বিপদ দূর করে দেবেন। কেউ যদি সফরে বের হয়ে এ দুআ পড়ে তাহলে সে আর ক্লান্ত হবে না, যদিও সে হাজার 'ফারসাখ' পথ হাঁটে!! কোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা পড়া হলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। কেউ যদি নিয়মিত তা পড়ে অথবা তা লিখে সঙ্গে রাখে তাহলে সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে অসীম মর্যাদার অধিকারী হবে, যদিও সে পাপাচারী হয়!!!...কারও কাফনে দুআটি লিখে দিলে আল্লাহ্ তার আযাব মাফ করে দেবেন, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন!... ।"

জঘন্য মিথ্যাচার! মেরাজ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলার কোনোটিতেই এ ঘটনার উল্লেখ নেই। এতে উল্লেখকৃত বেশ কিছু কথা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কিছু কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবাস্তব। এগুলো বিশ্বাস করা, বলা, শোনা ও প্রচার করা সম্পূর্ণ হারাম।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, খোদ শিয়াদের স্বীকৃতি অনুসারে (যারা এই বানোয়াট প্রেক্ষাপটসহ দুআটি প্রচার করে এবং তা পড়ার জন্য জোর উৎসাহ প্রদান করে) শিয়াদের উৎসগ্রন্থসমূহেও এই প্রেক্ষাপটের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১]

---

[১] قَالَ صَالِحٌ الْكِرْبَاسِيُّ (عَالِمٌ شِيْعِيٌّ رَافِضِيٌّ): «وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّوَايَةِ الْمَنْسُوْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِخُصُوْصِ فَضَائِلِ دُعَاءِ الْقَدَحِ، فَنَقُوْلُ: إِنَّهُ لَا تُوْجَدُ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ مَصَادِرِنَا الْمُعْتَبَرَةِ، وَبَعْضُ أَلْفَاظِهَا لَايَتَنَاسَبُ مَعَ الْمَأْلُوْفِ مِنْ نَهْجِ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُوْرَةِ، وَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ الْمَذْكُوْرَةَ لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِهٰذَا الدُّعَاءِ أَصْلًا».

اُنْظُرْ: https://www.islam4u.com/ar/almojib

মোটকথা, দুআটি ভিত্তিহীন। এর ফযীলতে যা বলা হয় তার সবই জাল-বানোয়াট। দুআটি পড়া, পড়তে উৎসাহিত করা, অযিফার বইয়ে লিখে প্রচার করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা জরুরি।

দুআয়ে জামিলা

[হাদীসের দুআ নয়-৩৮] يَا جَمِيْلُ يَا اَللهُ، يَا قَرِيْبُ يَا اَللهُ، يَا عَجِيْبُ يَا اَللهُ، يَا رَؤُوْفُ يَا اَللهُ، يَا مَعْرُوْفُ يَا اَللهُ، يَا لَطِيْفُ يَا اَللهُ، يَا حَنَّانُ يَا اَللهُ، يَا مَنَّانُ يَا اَللهُ، يَا مُجِيْبُ يَا اَللهُ، يَا عَظِيْمُ يَا اَللهُ، يَا دَيَّانُ يَا اَللهُ، يَا بُرْهَانُ يَا اَللهُ، يَا سُبْحَانُ يَا اَللهُ، يَا سُلْطَانُ يَا اَللهُ، يَا مُسْتَعَانُ يَا اَللهُ، يَا مُحْسِنُ يَا اَللهُ، يَا رَحْمٰنُ يَا اَللهُ، يَا مُتَعَالِيْ يَا اَللهُ. . .

এটি মা'ছূর (কুরআন হাদীসে বর্ণিত) দুআ নয়। বাজারি অযিফার বইগুলোতে এর যে ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয় তার কোনো ভিত্তি নেই।

আহাদনামা

[হাদীসের দুআ নয়-৩৯] اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ تُقَرِّبْنِيْ إِلَى الشَّرِّ، وَتُبَاعِدْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ. . .

বাজারি একটি অযিফার বইয়ে লেখা হয়েছে– "কেউ যদি সারা জীবন আহাদনামা পাঠ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহর রহমতে সে ঈমানের সঙ্গে ইন্তেকাল করবে এবং বেহেশতবাসী হবে।

মানুষের শরীরে তিন হাজার রোগ রয়েছে। তার মধ্যে এক হাজার রোগের ওষুধ চিকিৎসকগণ জানেন এবং তারা সেসব রোগেরই চিকিৎসা করে থাকেন। আর বাকি দু'হাজার রোগের ওষুধ কেউই জানে না। যে ব্যক্তি এ আহাদনামা পাঠ করবে এবং তাবিজ বানিয়ে নিজের সঙ্গে রাখবে মহান আল্লাহ তাকে ওই তিন হাজার রোগ থেকে মুক্ত রাখবেন। চীনা মাটির

বর্তনের উপর লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সে পানি পান করলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।"[১]

কথাগুলো বানোয়াট। এ রকম কোনো ফযীলতের কথা হাদীসে নেই। এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.কে আহাদনামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

...اس (عہد نامہ) کا ثواب جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔

"আহাদনামা-এর যে সওয়াবের কথা লেখা হয় তা গলত।" –ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/৩৭৯

হাফতে হাইকাল

[হাদীসের দুআ নয়-৪০] أُعِيْذُ نَفْسِيْ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ. أُعِيْذُ نَفْسِيْ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে একত্র করে দুআটি তৈরি করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসগ্রন্থে এভাবে দুআটি পাওয়া যায় না। এর ফযীলতে যা উল্লেখ করা হয় তা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

দুআয়ে হাবীবী

[হাদীসের দুআ নয়-৪১]

قُمْ قُمْ يَا حَبِيْبِيْ كَمْ تَنَامُ
عَجَبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَنَامُ
قُمْ قُمْ يَا حَبِيْبِيْ كَمْ تَنَامُ

---

[১] সহীহ (?) নূরানী মাজমূআয়ে অযায়েফ শরীফ, ইয়াকুব ফারুকী, আলইসলাম প্রকাশনী, ঢাকা, ৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

طَالِبُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُ

قُمْ قُمْ يَا حَبِيْبِي كَمْ تَنَامُ

خَالِقُ اللَّيْلِ لَا يَنَامُ

قُمْ قُمْ يَا حَبِيْبِيْ كَمْ تَنَامُ

خَالِقُ الْخَلْقِ لَا يَنَامُ

قُمْ قُمْ يَا حَبِيْبِيْ كَمْ تَنَامُ

اَلْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ لَا يَنَامُ

দুআটির যে ফযীলত উল্লেখ করা হয় তার কোনো ভিত্তি নেই। এর ভাষা-মর্ম একেবারেই মাধুর্যহীন। অর্থের দিকে লক্ষ করলে এটি কোনো দুআ বলেই মনে হয় না।

মুনাজাতে আবু বকর রা.

[ভিত্তিহীন দুআ-৪২]

خُذْ بِلُطْفِكَ يَا إِلٰهِيْ مَنْ لَهُ زَادٌ قَلِيْلٌ

مُفْلِسًا بِالصِّدْقِ يَأْتِيْ عِنْدَ بَابِكَ يَا جَلِيْلُ

ذَنْبُهُ ذَنْبٌ عَظِيْمٌ فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ

إِنَّهُ شَخْصٌ غَرِيْبٌ مُذْنِبٌ عَبْدٌ ذَلِيْلٌ

مِنْهُ عِصْيَانٌ وَنِسْيَانٌ وَسَهْوٌ بَعْدَ سَهْوٍ

مِنْكَ إِحْسَانٌ وَفَضْلٌ بَعْدَ إِعْطَاءٍ جَزِيْلٍ

طَالَ يَا رَبِّيْ ذُنُوْبِيْ مِثْلَ رَمْلٍ لَا تُعَدُّ

فَاعْفُ عَنِّيْ كُلَّ ذَنْبٍ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ

كَيْفَ حَالِيْ يَا إِلٰهِيْ لَيْسَ لِيْ خَيْرُ الْعَمَلِ

سُوْءُ أَعْمَالِيْ كَثِيْرٌ زَادُ طَاعَتِيْ قَلِيْلٌ

عَافِنِيْ عَنْ كُلِّ دَاءٍ وَاقْضِ عَنِّيْ حَاجَتِيْ . . .

কিছু কিছু অযিফার বইয়ে 'মুনাজাতে আবু বকর' শিরোনামে এ দুআটির উল্লেখ আছে। এটি আবু বকর রা.এর মুনাজাত হিসেবে প্রমাণিত নয়। আবু

বকর রা.এর মুনাজাত হিসেবে নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন–

یہ مشہور مناجات حضرت صدیقؓ سے ثابت نہیں۔

"এই প্রসিদ্ধ মুনাজাতটি আবু বকর রা. থেকে প্রমাণিত নয়।" –ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৯০

অল্প কয়েকজন সাহাবী ছাড়া প্রায় সব সাহাবীই ছিলেন খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত। তাঁদের ভাষার মানও ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। অনেকটা কবিতার মতো করে লেখা এই মুনাজাতটির ভাষার মান এত অনুন্নত যে, কিছুতেই তা আবু বকর রা. কিংবা অন্য কোনো সাহাবী কর্তৃক রচিত বলা চলে না। বাহ্যত এ মুনাজাতটি কোনো অনারব কর্তৃক রচিত।

আবু বকর রা. কর্তৃক রচিত মুনাজাত মনে না করে 'একটি সাধারণ মুনাজাত' হিসেবে কেউ এটি পড়তে চাইলে পড়তে পারে। তবে একজন সাহাবীর দুআর ঐশ্বর্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে উচ্চারিত মুনাজাতের 'নূর ও বরকত' এ মুনাজাতে পাওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, তিরিমিযী শরীফের একটি রেওয়ায়েতে এসেছে–

[সহীহ হাদীস] "আবু বকর রা. (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, **আপনি আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাযে পড়ব।** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি এ দুআটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

"হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, তুমি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তুমি নিজের তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি অসীম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৩১

অন্য একটি হাদীসে এসেছে–

[সহীহ হাদীস] "আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার জন্য একটি

দুআ শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতে ঘুমানোর সময় এই দুআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قَالَ: قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

"হে আল্লাহ! হে আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! হে দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত সত্তা! হে সকল সৃষ্টিজীবের মালিক ও পালনকর্তা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তান ও তার শিরক থেকে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯২

যদি কোনো দুআ বা মুনাজাতকে 'দুআয়ে আবু বকর রা.' বা 'মুনাজাতে আবু বকর রা.' বলতেই হয় তো এ দুআ দু'টিকে বলা যেতে পারে। –দেখুন, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৫/৬৭

নববী দুআর 'নূর ও বরকত' তো আছেই, এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ একটি বিষয়– এগুলো শ্রেষ্ঠ নবীর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ সাহাবীকে শেখানো দুআ। সন্দেহ নেই, এ বিষয়টি দুআ দু'টিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

প্রসঙ্গত, ইমাম গাযযালী রহ. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে (১/৪৫৮) 'দুআয়ে আবু বকর রা.' শিরোনামে একটি দুআ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সনদ সহীহ নয়। যে সনদে তা বর্ণিত হয়েছে তাতে আবদুল মালিক ইবনে হারুন ইবনে আনতারা নামক একজন রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। যার ব্যাপারে হাদীস জাল করার অভিযোগ আছে। দেখুন, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৫/৬৬-৬৭, লিসানুল মীযান ৫/২৭৬-২৭৮

দুআয়ে গঞ্জুল আরশ

[হাদীসে নেই-৪৩]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، لَا إِلٰهَ

إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ الْقَدِيْرِ الْاٰخِرِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ...

এ দুআ মা'ছূর নয়। নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসগ্রন্থে দুআটি পাওয়া যায় না। এর কোনো ফযীলত বা কার্যকারিতার কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বেহেশতী জেওর (১০/৫২)-এ আছে–

دعا گنج العرش، عہد نامہ یہ دونوں کتابیں اور بہت سی ایسی ہی کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی دعائیں تو اچھی ہیں مگر ان میں جو سندیں لکھی ہیں اور ان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بڑے لمبے چوڑے ثواب لکھے ہیں وہ بالکل گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔

"দুআয়ে গঞ্জুল আরশ, আহাদনামা এবং এ ধরনের আরও কিছু পুস্তিকায় যেসব দুআ উদ্ধৃত হয়েছে (দুআ হিসেবে তো) তা ভালো, কিন্তু এগুলোয় যে সনদ উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে যে লম্বা-চওড়া সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট।"

দরূদে তাজ

[হাদীসে নেই-৪৪]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعِلْمِ، شَافِعِ الْمَحْشَرِ، وَصَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، وَسَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ، اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ...

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. (১২৪৪-১৩২৩ হি.)কে এক লোক এ দরূদটি সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। তিনি এর প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব লিখেছিলেন। এখানে তা হুবহু তুলে দেওয়া হল। (প্রশ্নকারীর চিঠিটি ছিল ফার্সিতে লেখা, তাই জবাবও ফার্সিতে লেখা হয়েছিল।)

جواب: آنچہ فضائل درود تاج کہ بعض جہلہ بیان کنند غلط است، وقدر آں بجز بیان شارع علیہ السلام معلوم شدن محال، وتالیف ایں درود بعد مرور صدہا سال واقع شد، پس چگونہ ورد ایں صیغہ را موجب

ثواب قرار دادہ شود، آنچہ در احادیث صحاح صیغہائے درود وارد شدہ آں را ترک کردن و ایں را موعود
بثواب جزیل پنداشتن و ورد ساختن بدعت ضلالت ہست، و چوں آنکہ در آں کلمات شرکیہ مذکور اند
اندیشہ خرابی عقیدہ عوام است، لہذا ورد آں ممنوع ہست پس تعلیم درود تاج ہمانا سم قاتل بعوام سپردن
ست کہ صدہا مردم بفساد عقیدہ شرکیہ مبتلا شوند و موجب ہلاکت ایشاں گردد، فقط واللہ تعالی اعلم۔

"কিছু মূর্খলোক 'দরূদে তাজ'-এর যে ফযীলত বয়ান করে তা আগাগোড়াই গলত। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা ছাড়া কোনো কিছুর ফযীলত জানা অসম্ভব।**

(অথচ) এ দরূদ রচিতই হয়েছে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের) শত শত বছর পরে। সুতরাং এ দরূদের অযিফা পাঠে সওয়াব হওয়ার কথা বলা কীভাবে সম্ভব?

সহীহ হাদীসে যেসব দরূদ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে এই দরূদের অযিফা পাঠ করা এবং তা পাঠ করলে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) অসীম সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে–এমনটি মনে করা বেদআত ও গোমরাহি।

আর এ দুআটিতে যেহেতু শিরকি কথাও রয়েছে তাই এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আকীদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং এর অযিফা পাঠ করা নিষিদ্ধ। এ দুআ সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া তাদের হাতে বিষ তুলে দেওয়ার সমতুল্য। কারণ এর মাধ্যমে শত শত মানুষ শিরকি আকীদায় লিপ্ত হয় এবং তা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।" –ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/২৩৮

বোঝা গেল–

ক. কোনো দুআ বা দরূদের ফযীলত জানার একমাত্র উৎস হল কুরআন মজীদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। তবে কুরআন মজীদে কোনো দুআর নির্দিষ্ট কোনো ফযীলতের উল্লেখ নেই।

খ. যেসব দুআ-দরূদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর রচিত হয়েছে সেগুলোর নির্দিষ্ট কোনো ফযীলত বলা ঠিক নয়। (অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনো দুআর নির্দিষ্ট কোনো উপকারিতার কথা প্রমাণিত হলে সেটা ভিন্ন কথা। সেটা শুধুই অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তি-মতামত হিসেবে বিবেচিত হবে। সেগুলোকে ফযীলত বলা যাবে না কিংবা এমনভাবে উপস্থাপন করা যাবে না, যাতে তা শরীয়তের পক্ষ থেকে স্বীকৃত ফযীলত

বলে ভ্রম হয়। মনে রাখতে হবে, 'অভিজ্ঞতা-নির্ভর উপকারিতা' আর 'শরয়ী ফযীলত' এক কথা নয়।)

গ. পরবর্তী সময়ে রচিত কোনো দুআ-দরূদে শিরকি কোনো কথা থাকলে তা পাঠ করা হারাম। আরও দেখুন, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২/৮২-৮৬

দরূদে হাজারি

[হাদীসে নেই-৪৫] اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الرَّحْمَةُ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ، وَصَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ، وَصَلِّ عَلٰى صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّوَرِ، وَصَلِّ عَلٰى اسْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ، وَصَلِّ عَلٰى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِي النُّفُوْسِ. . .

দরূদে হাজারি হাদীসে বর্ণিত দরূদ নয়। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে এ দরূদ পাওয়া যায় না। বাজারি কিছু অযিফার বইয়ে এ দরূদ পাঠের যে ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। এ দরূদটি ফযীলতসহ লিফলেটে লিখে প্রচার করতেও দেখা যায় কখনও কখনও। 'বানোয়াট' ফযীলতসহ এভাবে দরূদটি প্রচার করা সম্পূর্ণ হারাম।

দরূদে শেফা

[হাদীসে নেই-৪৬] اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِفَاءٍ.

দরূদে শেফা নামে প্রসিদ্ধ এ দরূদটি মা'ছূর দরূদ (কুরআন হাদীসে বর্ণিত) নয়। এর নির্দিষ্ট কোনো ফযীলত বা কার্যকারিতার কথা কুরআন হাদীসে নেই।

দরূদে তুনাজ্জিনা/দরূদে নাজিয়া

[হাদীসে নেই-৪৭] اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلٰى

الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

এ দরূদটিও মা'ছূর (কুরআন হাদীসে বর্ণিত) দরূদ নয়। এর যে কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করা হয় তা কুরআন হাদীসে নেই।

দরূদে আকবর
[হাদীসে নেই-৪৮]

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللهِ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللهِ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَجِيَّ اللهِ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَارَهُ اللهُ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَّفَهُ اللهُ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللهُ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَرَّمَهُ اللهُ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ.
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ...

এ দরূদটিও মা'ছূর দরূদ নয়। এরও কোনো ফযীলত বা কার্যকারিতার কথা কুরআন হাদীসে নেই। দরূদটি সম্বোধনসূচক। সম্বোধনসূচক দরূদ পাঠের

ক্ষেত্রে শর্ত হল, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে এ দরূদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে পৌঁছে দেবেন–এই আকীদা রেখে পড়া। নবীজী সরাসরি শুনতে পাচ্ছেন এমন আকীদা পোষণ করে সম্বোধনসূচক দরূদ পাঠ করা হারাম। তবে তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম পেশ করার বিষয়টি ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করাই নিয়ম।

দরূদে নারিয়া

[হাদীসে নেই-৪৯] اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً، وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا، عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ.

দরূদে নারিয়া নামে এটি প্রসিদ্ধ। এটিও হাদীসের দরূদ নয়। কোনো বুযুর্গ কর্তৃক রচিত। এর যে কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করা হয় তাও হাদীসে নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কেউ তা বলেছেন। সুতরাং তা একটি অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বিষয় বলেই বিবেচিত হবে।

প্রসঙ্গত, এ দরূদটির সঠিক নাম হল দরূদে তাযিয়া। শায়খ ইবরাহীম তাযী-এর নামে এর নামকরণ। বানান বিভ্রাট ঘটে তাযিয়া (تازية) শব্দটি নারিয়া (نارية) হয়ে গেছে। ইউসুফ নাবহানী 'সা'আদাতুদ দারাইন'-এ (পৃ. ৩৭০) বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৪২৬ হি. বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা দারুল ফিকর থেকে সা'আদাতুদ দারাইন-এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাযিয়া (تازية) শব্দটি নাযিয়া (نازية) লেখা হয়েছে। এটিও ভুল।

দরূদে লাখী

[হাদীসে নেই-৫০] اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَحْمَةِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ فَضْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ خَلْقِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ عِلْمِ اللهِ...

এটিও হাদীসে বর্ণিত দরূদ নয়। এর কোনো ফযীলত বা কার্যকারিতার কথাও কুরআন হাদীসে নেই।

জরুরি জ্ঞাতব্য

"এখানে কারও সংশয় হতে পারে যে, দুআ একটি ইবাদত। শরীয়ত দুআর ব্যাপারে এ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে যে, দুআর ধারা ও আদব বজায় রেখে যে কোনো শব্দে মানুষ দুআ করতে পারে। এরপরও এ তাহকীকের কী অর্থ হতে পারে যে, অমুক দুআ হাদীসে নেই?

এ সংশয়ের সমাধান এই যে, অবশ্যই এ কথা ঠিক– দুআর ধারা ও আদব বজায় রেখে মানুষ যে কোনো ভাষায় যে কোনো শব্দে দুআ করতে পারে। তবে দুআর মৌলিক নীতিমালায় নিম্নোক্ত তিনটি ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

১. যে সব স্থানে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সহীহ হাদীসে দুআ বর্ণিত আছে, যাকে 'দুআয়ে মা'ছূর বা 'মা'ছূর দুআ' বলা হয়, সেখানে মা'ছূর দুআর প্রতি যত্নবান হওয়াই সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত দুআ পরিত্যাগ করে অন্যসব দুআ অবলম্বন করা আদৌ ঠিক নয়; বরং তা পরিত্যাজ্য। –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/৫২৫, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৫/৫৭৮, মুনাজাতে মকবুল ৮৮-৮৯

২. মা'ছূর দুআগুলো যে শব্দে বর্ণিত সেগুলোতে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা ছাড়া হুবহু সেভাবেই রেখে আমল করা শ্রেয়। নিজের পক্ষ থেকে যদিও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ আছে, কিন্তু এরূপ করা অনুত্তম। –ফাতহুল বারী ১১/১১৬, লামেউদ দারারী ৩/৩৫২, মুনাজাতে মকবুল ৮৮-৮৯

৩. মা'ছূর দুআয় যদি কেউ কোনো বাক্য বৃদ্ধি করে তাহলে অতিরিক্ত বাক্যকে মা'ছূর দুআর অংশ মনে করা নাজায়েয। অর্থাৎ এরূপ মনে করা যে, এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন এ অংশটুকু তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ অংশটুকু তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। তাই একে তাঁর তালীমের অংশ সাব্যস্ত করা কীভাবে সহীহ হবে?

ভালোভাবে বিষয়টি বুঝাতে হবে। এক হল মা'ছূর দুআর মধ্যে কোনো বাক্য বাড়িয়ে পড়ে নেওয়া, আরেক হল বর্ধিত অংশকে মা'ছূর দুআর অন্তর্ভুক্ত মনে করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দিয়েছেন বলে জ্ঞান করা– উভয়টি এক নয়। প্রথমটি যদিও অনুত্তম, তথাপি তা জায়েয; কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা হয়। এ জন্যই দেখা যায়, উলামা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম নিজ নিজ রচনাবলিতে এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান যে, যে সব দুআ মা'ছূর নয় কিংবা কোনো শব্দ বা বাক্য মা'ছূর তথা হাদীসে বর্ণিত নয়, সেগুলোর মা'ছূর না হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কথা প্রমাণভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন। যাতে দ্বীনের সবকিছুই হুবহু সে আঙ্গিকেই সংরক্ষিত থাকে যে আঙ্গিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন। বস্তুত এ লক্ষ্যেই এ অধ্যায়ে কিছু দুআ-দরূদ সম্পর্কে তাহকীক পেশ করা হয়েছে।"
–প্রচলিত জাল হাদীস ১৬০-১৬১

বিভিন্ন আমল

ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে দু'রাকাত নামায আদায়ের নির্দিষ্ট সওয়াব

[জাল বর্ণনা-৫১] যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে ফজরের নামায আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে, সূর্যোদয়ের পর আল্লাহর প্রশংসা করে, এরপর দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে হাজার মহল দান করবেন। প্রতি মহলে হাজার হুর থাকবে, প্রতি হুরের সঙ্গে হাজার গোলাম থাকবে। সে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বর্ণনাটি জাল। জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মুহাম্মদ শাওকানী রহ. প্রমুখ এটি জাল বলে মত দিয়েছেন।

–যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৪২২, তানযীহুশ শরীয়া ২/১২৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৪৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৮৩

এ বিষয়ে আমলযোগ্য হাদীস

[حَدِيْثٌ صَالِحٌ لِلْعَمَلِ] عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥٨٦) وَقَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ»(١).

---

(١) وَلِبَعْضِهِمْ رِسَالَةٌ سَمَّاهَا: «اَلْحُجَّةُ بِضَعْفِ حَدِيْثِ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ»، وَلَوْ سُلِّمَ مَا ذُكِرَ، لَا يَنْحَطُّ الْخَبَرُ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ فِيْ بَابِ الْعَمَلِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

[আমলযোগ্য হাদীস] "আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতে ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। সূর্যোদয় হলে উঠে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তাআলা তাকে একটি পূর্ণ হজ ও একটি পূর্ণ উমরা করার সওয়াব দান করেন।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৮৬

নামাযের পর নামাযের স্থানে বসে থাকার নির্দিষ্ট ফযীলত

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫২] যখন কোনো লোক মসজিদে প্রবেশ করে তখন ফেরেশতারা তার গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ গোনাহসহ মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে। নামায শেষ হওয়ার পর যদি লোকটি নামাযের স্থানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করে (যিকির-আযকার করে, দুআ-দরূদ পড়ে কিংবা এমনিতেই মসজিদে বসে থাকে) তখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। তারা তখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, হে আল্লাহ! তার গোনাহের বোঝা মাথায় রাখতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার ঘরে অবস্থান করছে, তার গোনাহ রাখার দরকার নেই, তোমরা এগুলো সমুদ্রে ফেলে দাও।

বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে এটি পাওয়া যায় না। মসজিদে প্রবেশের সময় গোনাহের বোঝা বাইরে থেকে যাওয়ার যে ধারণা এ বর্ণনায় দেওয়া হয়েছে, তা শুধু অমূলকই নয়, একটি উদ্ভট ধারণাও বটে। কুরআন সুন্নাহর একাধিক দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, মানুষের আমল তার সব সময়কার সঙ্গী। ভালো কিংবা মন্দ যে আমলই মানুষ করুক, তা কখনও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

উল্লেখ্য, নামায শেষে নামাযের স্থানে বসে থাকা একটি নেক আমল। এ বিষয়ে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। (কয়েকটি সহীহ হাদীস নিচে উল্লেখ করা হবে।) ভিত্তিহীন বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে এ বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলো বলেই আমলটির প্রতি উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহীহ হাদীস

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ».

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায শেষে ওযু অবস্থায় যতক্ষণ নামাযের স্থানে বসে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দুআ করতে থাকে– 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, তাকে দয়া কর।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৫

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: أَبْشِرُوْا ، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ ، يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلٰئِكَةَ، يَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلٰى عِبَادِيْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ أُخْرٰى.

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের নামায পড়লাম। নামাযের পর কিছু লোক বেরিয়ে গেল, কিছু লোক মসজিদে রয়ে গেল। (একটু পর) নবীজী দ্রুত আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ তাআলা আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন, তোমাদের নিয়ে গর্ব করে তিনি ফেরেশতাদের বলছেন, দেখ, আমার বান্দারা এক ফরয আদায় করে আরেক ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে।" –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৭৫০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮০১

তাকবীরে তাশরীকের প্রেক্ষাপট

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৩] ইবরাহীম আ. যখন শিশু ইসমাঈল আ.কে কুরবানি করার জন্য কাত করে শোয়ান তখন আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আ.কে ফিদয়া নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আসতে আসতেই কুরবানি হয়ে যায় কি না এ ভয়ে তিনি 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' (اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ) বলে আওয়াজ দেন। তাঁর আওয়াজ শুনে ইবরাহীম আ. আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, জিবরাঈল আ. ফিদয়া নিয়ে আসছেন। তখন তিনি বলে উঠেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ)। ইসমাঈল আ. উঠে

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে বলেন, 'আল্লাহু আকবার ওয়া-লিল্লাহিল হামদ' (اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ)। তিনজনের দুআর সমষ্টিই হল নিচের দুআ (তাকবীরে তাশরীক)–

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

এরপর থেকেই এ দুআটি পড়ার রীতি চালু হয়।

বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। ইবনুল হুমাম রহ. এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন–

لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ ذٰلِكَ.

'হাদীস বিশারদদের মতে এটি প্রমাণিত নয়।'

ইবনে নুজাইম ও ইবনে আবেদীন শামী রহ. তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।

قَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ: «كَذَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ كَمَا فِي «الْفَتْحِ». (بَحْرٌ). أَيْ هٰذِهِ الْقِصَّةُ لَمْ تَثْبُتْ أَمَّا التَّكْبِيْرُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ» اِنْتَهٰى كَلَامُ ابْنِ عَابِدِيْنَ.

–ফাতহুল কাদীর ২/৮২, আলবাহরুর রায়েক ২/২৮৮, রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী) ৩/৬২

ঘটনাটি প্রমাণিত না হলেও এ দুআটি প্রমাণিত। সাহবায়ে কেরাম এ দুআটি পড়তেন। আর যিলহজের নয় তারিখ ফজর থেকে তের তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের বিধান তো সবারই জানা। দেখুন, নাসবুর রায়াহ ২/২২৪

মসজিদে বাতি জ্বালানোর ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৫৪]

مَنْ أَسْرَجَ فِيْ مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ مَا دَامَ فِيْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْؤُهُ.

যে মসজিদে বাতি জ্বালাবে তার জন্য ফেরেশতারা মাগফেরাত কামনা করবে, যতক্ষণ সে বাতি মসজিদে জ্বলবে।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বর্ণনাটি মওযূ (জাল) বলে মত দিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর কথা মৌন সমর্থন করেছেন।

–মীযানুল ইতিদাল ১/৫৬৮, লিসানুল মীযান ৩/২৫৫, আরও দেখুন, কিতাবুল আরশ ওমা রুবিয়া ফীহি ৬৭ (৩৪) (টীকা), আদ্দুররুল মানছূর ৭/২৬৭ (টীকা)

যোহরের নামাযের পর সূরা 'ফাত্হ' এবং আসরের নামাযের পর সূরা 'নাবা' পড়া

[হাদীসে নেই-৫৫] সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. লিখেছেন–

میں نے عرض کیا کہ بعد ظہر اِنَّا فَتَحْنَا پڑھنا چاہئے؟ ارشاد ہوا کہ حدیث میں نہیں آیا، پھر عرض کیا کہ بعد عصر عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ پڑھنا چاہئے؟ ارشاد ہوا کہ یہ بھی حدیث میں نہیں آیا مگر میں کبھی بعد عصر اور کبھی قبل عصر پڑھ لیتا ہوں۔

"আমি আরয করলাম, যোহরের পর সূরা 'ফাত্হ' পড়া উচিত? তিনি (ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.) বললেন, হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এরপর আরয করলাম, আসরের পর সূরা 'নাবা' পড়া উচিত? তিনি বললেন, এটিও হাদীসে নেই। তবে আমি কখনও আসরের পর কখনও আসরের আগে পড়ে নিই।" –ইরশাদে রহমানী,[১] সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ২৮-২৯, তাযকেরায়ে ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী, আবুল হাসান আলী নদবী ৫১

হাদীসে নেই বলেই যোহর ও আসরের পর এ সূরা দুটি পড়া যাবে না–এমন নয়। কুরআন মজীদের যেকোনো অংশ যেকোনো সময় তেলাওয়াত করা যায়। কিন্তু বিশেষ কোনো আয়াত বা বিশেষ কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের নির্ধারিত আমল সাব্যস্ত করার জন্য দলিলের প্রয়োজন, যা এখানে আমাদের জানামতে অনুপস্থিত। তাই এগুলোকে হাদীসে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের আমল মনে না করে সাধারণ তেলাওয়াত হিসেবে কেউ যদি এ আমল করে তাহলে তা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে।

চার হাজার দিনার সদকা দিয়া ঘুমাইবেন...

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৬]

১. চার হাজার দিনার সদকা দিয়া ঘুমাইবেন।
২. এক খতম কোরআন শরীফ পড়িয়া ঘুমাইবেন।
৩. জান্নাতের মূল্য দিয়া ঘুমাইবেন।
৪. উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া ঘুমাইবেন।
৫. এক হজ করিয়া ঘুমাইবেন।

---

[১] এ কিতাব সম্পর্কে জানতে দেখুন, সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ., মুহাম্মদ আলহাসানী ৩৯৮-৪০৩

হযরত আলী রা. বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কাজ আমার জন্য বড়ই কঠিন। আমি কী করিয়া এই কাজ করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

১. চার বার সূরা ফাতিহা পড়িয়া ঘুমাইলে চার হাজার দিনার সদকা করার সওয়াব তোমার আমলনামায় লিখা হইবে।

২. তিনবার সূরা ইখলাস পড়িয়া ঘুমাইলে এক খতম কোরআন পড়ার সওয়াব পাইবে।

৩. তিনবার দরূদ শরীফ পড়িয়া ঘুমাইলে জান্নাতের মূল্য আদায় হইয়া যাইবে।

৪. দশবার ইসতিগফার পড়িয়া ঘুমাইলে উভয়ের বিবাদ মিটানোর সওয়াব পাইবে।

৫. দশবার কালেমায়ে তামজীদ পড়িয়া ঘুমাইলে এক হজের সওয়াব পাইবে।

বিভিন্ন মসজিদের বারান্দায় এ কথাগুলো লিখে টাঙিয়ে রাখতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন নানাভাবে তালাশ করেও এর কোনো ভিত্তি আমরা খুঁজে পাইনি। কোত্থেকে এ বর্ণনাটি প্রসার লাভ করল তার উৎস উদ্ধার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বর্ণনাটিতে যে নির্দিষ্ট ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিশ্বাস না রেখে কেউ যদি এ দুআ-দরূদ, সূরা ও তাসবীহগুলো ঘুমানোর আগে পড়ে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। ঘুমানোর আগে সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ইখলাস[১] ও ইস্তেগফার[২] পড়ার কথা সহীহ হাদীসে স্পষ্টই আছে। শাস্ত্রীয় বিচারে 'যয়ীফ' (সূত্র দুর্বল) একটি বর্ণনায় ঘুমের আগে সূরা ফাতেহা পড়ার কথাও আছে।[৩] ঘুমের আগে দরূদ পড়ার কথা আমরা কোনো সহীহ হাদীসে পাইনি। তবে দরূদ সবসময়ই পড়া যায়, ঘুমের আগের সময়ও এর ব্যতিক্রম নয়। কালেমায়ে তামজীদের কথাও আমরা কোনো সহীহ হাদীসে পাইনি। আপত্তিকর কিছু না থাকায় এ দুআটি পড়তেও কোনো সমস্যা নেই।

---

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৭

[২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৫৪, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৬২০, কিতাবুদ দুআ, তবারানী, হাদীস ২৫৮, নাতায়েজুল আফকার ৩/৮০

[৩] মুসনাদে বাযযার ১৪/১২ (৭৩৯৩), মাজমাউয যওয়ায়েদ ১০/১৬৫ (১৭০৩০), মীযানুল ইতিদাল ৩/৩২৪, আলকামেল, ইবনে আদী ৭/১১৩-১১৬ (গাস্‌সান ইবনে উবাইদ-এর জীবনী)

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে আবারও উল্লেখ করা হচ্ছে– শরীয়তের নীতিমালার আলোকে কোনো দুআ-দরূদ বা তাসবীহ পড়া মুবাহ হওয়া আর সেই দুআ-দরূদ ও তাসবীহের নির্দিষ্ট কোনো ফযীলত থাকা–এক কথা নয়। এমনিভাবে কোনো দুআ-দরূদ বা তাসবীহ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেই সেগুলোর নির্দিষ্ট কোনো ফযীলত থাকা জরুরি নয়। নির্দিষ্ট ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র ও নির্ভরযোগ্য দলিল প্রয়োজন।

আপত্তিকর কোনো কিছু না থাকায় এবং কোনো কোনো দুআ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় উপরিউক্ত বর্ণনায় উল্লেখকৃত দুআ-দরূদ ও তাসবীহগুলো ঘুমের আগে পড়তে অসুবিধা যেমন নেই, তেমনি নির্ভরযোগ্য সূত্র না থাকায় বর্ণনাটিতে দুআগুলোর যে নির্দিষ্ট ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বিশ্বাস করারও সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, এ দুআগুলো ছাড়াও ঘুমের আগে পড়ার বেশকিছু দুআ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হল না। একত্রে দুআগুলো জানার জন্য দেখুন, আলআযকার, ইমাম নববী ৮৬-৯২, দুআগুলোর ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রীয় মান জানতে দেখুন, নাতায়েজুল আফকার ৩/২৪-৯৮, আলফুতূহাতুর রব্বানিয়া ৩/১৩৫-১৭২

দানশীলতার ফযীলত

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৭] اَلْكَرِيْمُ/اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا

দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্র, যদিও সে ফাসেক হয়।

এটি হাদীস নয়। একটি ভিত্তিহীন কথা। কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী। ফাসেক কীভাবে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়? ফাসেক তো জালেম। আর কুরআনে আছে– (তরজমা) 'আল্লাহ জালেমদের ভালোবাসেন না।'[১]

---

(١) قَالَ الْمُلَّا عَلِيٌّ الْقَارِئُ فِي «الْأَسْرَارِ الْمَرْفُوْعَةِ» ص١٧٤ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلٰى خَبَرِ «اَلْكَرِيْمُ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْكَانَ فَاسِقًا وَالْبَخِيْلُ عَدُوُّ اللهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا»: «لَا أَصْلَ لَهُ بَلِ الْفِقْرَةُ الْأُوْلٰى مَوْضُوْعَةٌ، لِمُعَارَضَتِهَا لِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالٰى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ﴾ [سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مِنَ الآيَةِ:٢٢٢] ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ﴾ [سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ، مِنَ الآيَةِ:١٤٠] وَالْفَاسِقُ إِمَّا مِنَ الظَّالِمِيْنَ أَوْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ».

প্রসঙ্গত, কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ফাসেক বলা হয় কাফেরকে কিংবা যে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে চলেছে তাকে।

বর্ণনাটি সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞদের মতামত

হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেছেন–

لَا أَصْلَ لَهُ

'এর কোনো ভিত্তি নেই।'

আবুল মাহাসিন কাউকজী রহ.ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন–

لَا أَصْلَ لَهُ بَلِ الْفِقْرَةُ الْأُوْلٰى (يَعْنِيْ بِهَا هٰذَا الْخَبَرَ الْمَبْحُوْثَ عَنْهُ) مَوْضُوْعَةٌ.

'এর কোনো ভিত্তি নেই, এটি জাল-বানোয়াট।' –আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৮৬, ৫০৫, আলমাসনূ ১৩৪, আলআসরারুল মারফূআ ১৭৪, আললু'লুউল মারসূ ৫৯, কাশফুল খাফা ২/১০১

উল্লেখ্য, অনেকে বাক্যটি এভাবেও বলে থাকে–

اَلْكَرِيْمُ/اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا.

'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্র, যদিও সে কাফের হয়।'

এটি উপরিউক্ত জাল বর্ণনার ভিন্ন ও জঘন্যতম রূপ। আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী কাফের কিছুতেই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে না। কথাটি যে ঈমান বিধ্বংসী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের কথা বলা সম্পূর্ণ হারাম।

দৈনিক বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করার সওয়াব

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৫৮] যারা দৈনিক বিশবার মৃত্যুর স্মরণ করবে, মৃত্যুর পর তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।[১]

হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন, আমি এর কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ.ও এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাননি। –আলমুগনী আন হামলিল আসফার ৪/৪০২, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া ৬/৩৭৫, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২১৩, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/৩৩৬

---

[১] মকছুদোল মোমেনীন ১৭৮-১৭৯

মৃত্যুর স্মরণ একটি নেক আমল। একটি সহীহ হাদীসে বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণকারী মুমিনকে অধিক বুদ্ধিমান মুমিন বলা হয়েছে। ভিত্তিহীন বর্ণনাটি না বলে সহীহ হাদীস বলে মৃত্যু-স্মরণে উৎসাহিত করা কর্তব্য।

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٠٧)، وَالنَّسَائِيُّ (١٨٢٤)، وَابْنُ مَاجَهْ (٤٢٥٨)، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ».

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল স্বাদ-আস্বাদের বিনাশকারী (মৃত্যুকে) তোমরা বেশি বেশি স্মরণ কর।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩০৭, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৮২৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২৫৮

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، أُولٰئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ٣١٨/١٢ (١٣٥٣٦)، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِيْ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» ٣٠٩/١٠: «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ».

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত ... এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর নবী, সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে? তিনি বললেন, যারা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। দুনিয়া আখেরাতের মর্যাদা তাদেরই জন্য।" –তবারানী ১২/৩১৮ (১৩৫৩৬) মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৩০৯

দৈনিক বিশজনকে সালাম প্রদানের ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৫৭] কেউ যদি দিনে বিশজন লোককে সালাম দেয় আর সেদিন সে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ শাওকানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী রহ. প্রমুখের মতে বর্ণনাটি মওযূ (জাল)।

–যাইলুল লাআলী ১/৪১১, তানযীহুশ শরীয়া ২/ ১১৯, আলফাওয়ায়িদুল মাজমূআ ২৩৫, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৬৪

দৈনিক বিশজনকে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে নয়, বরং 'সালামের প্রসার' ঘটানোর ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে দু'টি সহীহ হাদীসে। নিচে হাদীস দু'টি উল্লেখ করা হল–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ]...«أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. থেকে বর্ণিত ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও। (আল্লাহর বান্দাদের) খাবার খাওয়াও। লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে (রাতে) তখন নামায পড়, তাহলে তোমরা নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৮৫

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، أَوَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালো না বাসলে তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের বলে দেব, কী করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৪

বোঝা গেল, সালামের প্রচার-প্রসার ঘটানো জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল। 'বিশজনকে সালাম দেওয়া'র জাল বর্ণনাটি না বলে এই সহীহ হাদীস দু'টি বলা উচিত।

এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে সালামের আরও অনেক ফযীলতের কথা আছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى أَهْلِ بَيْتِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٩٨) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

[সহীহ হাদীস] "আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন– হে প্রিয় ছেলে, যখন পরিবারের লোকজনের কাছে যাবে তখন তাদের সালাম দেবে। এ সালাম তোমার ও তোমার ঘরের লোকজনের জন্য বরকতের কারণ হবে।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৯৮

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (٥١٩٧) وَسَكَتَ عَنْهُ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ «رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ» ص ٢٩٢: «رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ».

[সহীহ হাদীস] "যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৯৭

সালাম প্রদানে নব্বই নেকি আর উত্তরে দশ নেকি

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৬০] সালাম প্রদান করলে নব্বই নেকি পাওয়া যায়, আর সালামের উত্তর দিলে দশ নেকি পাওয়া যায়।

কথাটি আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর কোনো ভিত্তি আমরা খুঁজে পাইনি। অনেক তালাশ করেও নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে তা পাওয়া যায়নি।[১] তবে কিছুটা ব্যতিক্রম শব্দে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যাতে আছে, "দুই মুসলমান একত্র হয়ে যদি পরস্পরকে সালাম দেয় এবং মুসাফাহা করে তাহলে তাদের মধ্যে যে অধিক হাসিমুখে থাকে আল্লাহ তাকে বেশি পছন্দ করেন। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের উপর একশ রহমত নাযিল হয়। আগে সালাম প্রদানকারী ও মুসাফাহাকারীর উপর নব্বই আর পরে সালাম প্রদানকারীর উপর দশটি 'রহমত' নাযিল হয়।"[২]

---

[১] তাফসীরে জালালাইনের টীকাগ্রন্থ 'হাশিয়াতুস সাবী'তে (২/৫০) কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এর কোনো সনদ উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি কোনো গ্রন্থের বরাতও (Reference) দেওয়া হয়নি। আহলে ইলমগণ জানেন, সনদ বা দলিল ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া মুহাক্কিক আলেমদের অজানা নয়, 'হাশিয়াতুস সাবীতে' কী পরিমাণ 'মুনকার' কথা ও 'মুনকার' বর্ণনা রয়েছে।

[২] বর্ণনাটির আরবী পাঠ এই–

«إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَتَصَافَحَا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ تَعَالَى أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا لِصَاحِبِهِ، وَنَزَلَتْ بَيْنَهُمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ: لِلْبَادِيْ تِسْعُوْنَ، وَلِلْمُصَافِحِ عَشْرٌ».

–মুদারাতুন্ নাস, ইবনে আবিদ দুনিয়া [৬৫] (মাওসূআতু ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ৭/৫৩০০), শুআবুল ঈমান ৬/২৫৩, মুস্নাদুল ফারুক ২/৬৫২
কিন্তু এর সনদ (বর্ণনাসূত্র) খুবই দুর্বল। এতে 'ওমর ইবনে আমের' নামে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছে, যার ব্যাপারে একটি 'বাতেল' রেওয়ায়েত বর্ণনা করার অভিযোগ রয়েছে। দেখুন, আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৮/৩৯, মীযানুল ইতিদাল ৩/২০৯, লিসানুল মীযান ৬/১১৯

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহীহ হাদীস

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِشْرُوْنَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ:«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ». فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«ثَلَاثُوْنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٩٩٤٨)، وَأَبُوْ دَاوُدَ (٥١٩٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٨٩) وَقَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ».

[সহীহ হাদীস] "ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী নবীজীর নিকট এসে বলল, আস্সালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দশ। (অর্থাৎ সে দশ নেকি পেল)। (একটু পর) আরেক সাহাবী এসে বলল, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিশ (নেকি)। (কিছুক্ষণ পর) আরেক সাহাবী এসে বলল, আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়া-বারাকাতুহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ত্রিশ (নেকি)।" –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৯৯৪৮, সুনানে আবু দাউদ ৫১৯৫, জামে তিরমিযী ২৬৮৯

বোঝা গেল, সালামে শুধু 'আস্সালামু আলাইকুম' বললে দশ নেকি, 'ওয়া-রাহমাতুল্লাহ'সহ বললে বিশ নেকি এবং 'ওয়া-বারাকাতুহু'সহ পুরো সালাম বললে ত্রিশ নেকি পাওয়া যায়। 'নব্বই' নেকির কথাটি না বলে এই সহীহ হাদীসটি বলা কর্তব্য।
প্রসঙ্গত, পুরো সালাম বলার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট যত্নবান নই। বিষয়টি গুরুত্বের দাবিদার।

মাস, দিন, তারিখ ইত্যাদি বিষয়ক

কোন্ দিন কী সৃষ্টি হয়

[জাল বর্ণনা-৬১] শনিবার ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের দিন। এ দিন কুরাইশের লোকেরা দারুন নদওয়ায় বসে আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। রবিবার শস্যবপন ও ঘর-বাড়ি নির্মাণের দিন। এ দিনই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছে। সোমবার ব্যবসা-বাণিজ্য ও সফরের দিন। এ দিন হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম সফর ও ব্যবসা শুরু করেছিলেন। মঙ্গলবার ঝগড়া-বিবাদ ও রক্তপাতের দিন। এ দিন প্রথম হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামের ঋতুস্রাব হয়। এ দিনই আদম সন্তান (কাবিল) তার ভাই (হাবিল)কে হত্যা করে। বুধবার অশুভ দিন। এ দিন ফেরাউন-সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারা হয়। আদ ও ছামুদ জাতিকে এ দিনই ধ্বংস করা হয়। বৃহস্পতিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিন। রাজা-বাদশার দরবারে যাওয়ার দিন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ দিন নমরুদের দরবারে গিয়েছিলেন। এ দিনই হযরত হাজেরা আলাইহাস সালামকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জুমার দিন খুতবা পাঠ ও বিয়ের দিন। অধিকাংশ নবী-রাসূল এ দিনে বিয়ে করেছেন।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেছেন– هَذَا كَذِبٌ অর্থাৎ বর্ণনাটি মিথ্যা।

ইবনুল জাওযী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মুহাম্মদ শাওকানী রহ. প্রমুখের মতে এটি একটি জাল বর্ণনা। –কিতাবুল মাওযূআত ২/৩৪৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৫৩৬, তালখীসুল মাওযূআত, যাহাবী ১/৯৮ (৩৬৬) আরও দেখুন, মীযানুল ইতিদাল ৪/৩৯১, লিসানুল মীযান ৮/৪৫৭, আসনাল মাতালিব, মুহাম্মদ বিন দরবেশ হূত ৩৩৫

বর্ণনাটির বক্তব্যেও এমন কিছু বিষয় আছে, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী। এমন কিছু বিষয়ও আছে, যা সহীহ হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন–

১. বুধবার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দিনটি অশুভ দিন।' এ কথাটি ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী। কোনো কিছুকে 'অশুভ' মনে করার অবকাশ ইসলামে নেই। জাহেলি যুগে আরবের মুশরেকদের মধ্যে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল। ইসলাম এসে এই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

[সহীহ হাদীস] لَا طِيَرَةَ অর্থাৎ অলক্ষুণে বলতে কিছু নেই। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৭২ [আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত]

২. বুধবার অশুভ হওয়ার কারণ বলা হয়েছে, 'এ দিন ফেরাউন ধ্বংস হয়েছিল।' অথচ কাফের ফেরাউন আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়ার দিনটি 'অশুভ' না হয়ে 'শুভ' হওয়ার কথা। কারণ সেদিন আল্লাহর নবী মুসা আ. এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বনী ইসরাঈল আল্লাহর এ দুশমনের কবল থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। সহীহ হাদীসে বিষয়টি এভাবেই আছে। সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে–

[সহীহ হাদীস] "ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে এ দিনটিতে (সে দিন ছিল দশই মহররম, আশুরা) মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীরা শোকরানা রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামও এ দিন রোযা রাখতেন।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৪ [আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত]

৩. সোমবার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এই দিন ব্যবসা-বাণিজ্য ও সফরের দিন।' অথচ **সহীহ হাদীসে আছে,** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতেন। এ দিনে সফরে বের হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন। বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনো দিন খুব কমই তিনি সফরে বেরিয়েছেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৪৯-২৯৫০ [কা'ব বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত]

সফরের জন্য শরীয়তে যদিও কোনো বিশেষ দিন নির্ধারিত নেই, কিন্তু সোমবারের যে এ ব্যাপারে কোনো বিশেষত্ব নেই–এতেও কোনো সন্দেহ নেই। মোটকথা, বর্ণনাটি জাল।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহীহ্ হাদীস

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيْ فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيْ آخِرِ الْخَلْقِ، فِيْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٨٩)

[সহীহ্ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শনিবার আল্লাহ তাআলা জমিন সৃষ্টি করেছেন। রবিবার তাতে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। সোমবার সৃষ্টি করেছেন গাছপালা। মঙ্গলবার অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টি করেছেন। বুধবার 'নূর' সৃষ্টি করেছেন। বৃহস্পতিবার জমিনে জীব-জন্তু ও প্রাণীকূল সৃষ্টি করেছেন। জুমার দিন আসরের পর আল্লাহ তাআলা আদম আ.কে সৃষ্টি করেছেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৮৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬১৬১, (আলআনওয়ারুল কাশেফা, মুআল্লিমী ১৮৮-১৯৩)

এই একটি হাদীসই আমরা পেয়েছি, যাতে একই সঙ্গে সপ্তাহের সাত দিন সম্পর্কে আলোচনা আছে। এ ছাড়া আলাদা আলাদাভাবে সপ্তাহের বিভিন্ন দিন সম্পর্কে কিছু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

জুমার দিন

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٥٤) وَالتِّرْمِذِيُّ (٤٨٨).

[সহীহ্ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম দিন হল জুমার দিন। এ দিন আদম আ.কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। এ

দিনই তিনি জান্নাত থেকে বের হন। এ দিনই কেয়ামত হবে।” –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৪, জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৮৮

সোমবার

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ (أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ) فِيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١١٦٢)

[সহীহ হাদীস] “আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার রোযা রাখার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ দিনই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এ দিনই আমাকে নবুওয়ত দান করা হয়।” –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

সোমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছান। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯০৫-৩৯০৬ [আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত]

সোমবার ও বৃহস্পতিবার

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا».

[সহীহ হাদীস] “আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। (অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়।) যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে না তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যারা পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের ব্যাপারে (ফেরেশতাদের) বলা হয়, সমঝোতার আগ পর্যন্ত এদের বিষয় স্থগিত রাখ।” –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرّٰى صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ». قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: «حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ».

[সহীহ হাদীস] "হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৫

আইয়ামে বীয নামকরণের কারণ

[জাল বর্ণনা-৬২] নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর আদম আ.এর পুরো শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তখন তাঁকে চৌদ্দ, পনেরো ও ষোলো এই তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তিন দিন রোযা রাখার পর তাঁর গায়ের রং ফিরে আসে। তেরো তারিখের রোযায় এক তৃতীয়াংশ, চৌদ্দ তারিখের রোযায় আরেক তৃতীয়াংশ এবং পনেরো তারিখের রোযা রাখার পর বাকি অংশ সাদা হয়ে স্বাভাবিক হয়। এ কারণে এ দিনগুলোকে 'আইয়ামে বীয' বা 'শুভ্র দিনসমূহ' বলা হয়।

ইবনুল জাওযী রহ. বলেন-

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يُشَكُّ فِيْ وَضْعِهٖ ... وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ أَيَّامَ الْبِيْضِ لِأَنَّ اللَّيْلَ كُلَّهٗ يَبْيَضُّ بِالْقَمَرِ.

"কোনো সন্দেহ নেই, এটি জাল। বাস্তবতা হল, এ তিনদিনের রাত জোছনার আলোয় সাদা-শুভ্র থাকে। তাই এ দিনগুলোকে 'আইয়ামে বীয' (শুভ্র দিনসমূহ) বলা হয়।"

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ শাওকানী রহ. প্রমুখও এটি জাল বলে অভিমত দিয়েছেন।

-কিতাবুল মাওযূআত ২/৩৪৩, মীযানুল ইতিদাল ২/৪০৮, লিসানুল মীযান ৫/৪৬, তানযীহুশ শরীয়া ২/৫৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১২৫

আইয়ামে বীযে রোযার নির্দিষ্ট সওয়াব

[জাল বর্ণনা-৬৩] চান্দ্র মাসের তেরো তারিখ রোযা রাখলে তিন হাজার বছর, চৌদ্দ তারিখ রোযা রাখলে দশ হাজার বছর এবং পনেরো তারিখ রোযা রাখলে এক লাখ তেরো হাজার বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

এটি হাদীস নয়। ইমাম ইবনুল জাওযী, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনে আররাক কিনানী ও মুহাম্মদ শাওকানী রহ. বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন।

-কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৬৩, তালখীসুল মাওযূআত ২০৫ (মাকতাবাতুর রুশদ) তানযীহুশ শরীয়া ২/১৪৮, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ৯৫

এ সম্পর্কে যা প্রমাণিত

প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

[সহীহ্ হাদীস] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। –সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ১১৬০

[সহীহ্ হাদীস] আবু হুরায়রা রা. ও আবুদ দারদা রা.কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতে অসিয়ত করেছিলেন। –সহীহ্ বুখারী, হাদীস ১১৭৮, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ৭২১-৭২২

[সহীহ্ হাদীস] অন্য একটি হাদীসে এসেছে, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। –সহীহ্ বুখারী, হাদীস ১৯৭৯, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ১১৫৯

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত মাসের তেরো-চৌদ্দ-পনেরো এই তিনদিন রোযা রাখতেন।

[সহীহ্ হাদীস] আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তেরো-চৌদ্দ-পনেরো তারিখের রোযা ছাড়তেন না। ঘরে থাকতেও না, সফরে থাকতেও না। –সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৩৪৪

[সহীহ্ হাদীস] আবু যর রা. ও কাতাদা ইবনে মিলহান রা.কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসের এই তিনদিন রোযা রাখতে বলেছিলেন। –জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪/২২৩-২২৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭০৭-১৭০৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯

তাই এই তিনদিন রোযা রাখাই উত্তম। তবে মাসের অন্য কোনো সময় তিনদিন করে রোযা রাখলেও সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে।

এই হল আইয়ামে বীয বা তেরো-চৌদ্দ-পনেরো তারিখের রোযা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানিতে) প্রতি মাসে মাত্র তিনদিন রোযা রাখার বিনিময়ে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব প্রদানের ঘোষণা করেছেন। একে গনীমত মনে করে আমলটি পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আশুরার রোযার নির্দিষ্ট ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৬৪]

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ كَتَبَ اللهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّيْنَ سَنَةً بِصِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে রোযা রাখে আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় ষাট হাজার বছর রোযা রাখার এবং ষাট হাজার বছর রাত জেগে ইবাদত করার সওয়াব লিখে দেন।[১]

[জাল বর্ণনা-৬৫]

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمِ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشَرَةِ آلَافِ شَهِيْدٍ، وَثَوَابَ عَشَرَةِ آلَافِ حَاجٍّ.

যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তাকে দশ হাজার শহীদ এবং দশ হাজার হাজীর সওয়াব দান করবেন।[২]

[জাল বর্ণনা-৬৬] যে ব্যক্তি মহররম মাসের আশুরার তারিখে রোযা রাখে আল্লাহ পাক তাকে দশ হাজার ফেরেশতার সওয়াব দান করেন।[৩]

[জাল বর্ণনা-৬৭] যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোযা রাখে তা তার চল্লিশ বছরের গোনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।[৪]

[জাল বর্ণনা-৬৮] আশুরার তারিখে রোযা আদায়কারীর আমলনামায় সাত আসমান-জমিনের অধিবাসীদের সওয়াব লিখে দেওয়া হয়।[৫]

আশুরায় রোগীর সেবার ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৬৯] আশুরার তারিখে যে ব্যক্তি কোনো রোগীর শুশ্রূষা করল সে যেন সমস্ত আদম সন্তানের সেবা-শুশ্রূষা করল।[৬]

আশুরার নির্দিষ্ট নিয়মের নামাযের ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৭০] আশুরার দিন যে ব্যক্তি চার রাকাত নফল নামায পড়বে এবং তার প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে পঞ্চাশবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মোচন করে দেবেন এবং বেহেশতে ফেরেশতাদের থাকার এলাকায় তার থাকার জন্য নূর দ্বারা এক হাজার প্রাসাদ তৈরি করে রাখবেন।[৭]

---

(১) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৭
(২) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৮
(৩) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৬-৪২৭
(৪) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৮
(৫) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৮
(৬) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৮
(৭) মকছুদোল মোমেনীন ৪২৯-৪৩০

আশুরার দিন কেয়ামত সংঘটিত হওয়া

[জাল বর্ণনা-৭১] আশুরার দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে।

আশুরার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

[জাল বর্ণনা-৭২] আশুরার দিন আল্লাহ তাআলা হযরত ইদরীস আ.কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এ দিনই তিনি ইবরাহীম আ.কে অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছেন, মূসা আ.কে তাওরাত দিয়েছেন, ইসমাঈল আ.এর জন্য আসমান থেকে দুম্বা পাঠিয়েছেন, ইউসুফ আ.কে জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ দিনই ইয়াকূব আ. তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। এ দিনই আইয়ূব আ.কে আরোগ্য দান করা হয়, ইউনুস আ.কে মাছের পেট থেকে মুক্তি দান করা হয়। এ দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাপর সব গোনাহ ক্ষমা করা হয়। এ দিনই ইউনুস আ.এর কওমের তওবা কবুল করা হয়, ঈসা আ.কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সুলাইমান আ.কে রাজত্ব দান করা হয়। এ দিনই আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও সমুদ্ররাজি সৃষ্টি করা হয়। এ দিনই আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফূয ও কলম সৃষ্টি করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, এ দিন আল্লাহ তাআলা আদম আ. ও জিবরাঈল আ.কে সৃষ্টি করেছেন। এ দিনই ইবরাহীম আ. ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ দিনই দাউদ আ.এর গোনাহ ক্ষমা করা হয়। এ দিনই আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হন।

পর্যালোচনা

বহুল প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে আশুরা সম্পর্কিত এ বর্ণনাগুলো (শেষ বর্ণনার কিছু অংশ ব্যতীত) উল্লেখ করা হল। এগুলোর কোনোটিই হাদীস নয়, বরং দু'টি দীর্ঘ জাল রেওয়ায়েতের অংশবিশেষ। এগুলো বিশ্বাস করা জায়েয নয় এবং ওয়াযে বা বক্তৃতায়, বলায় কিংবা লেখায় উল্লেখ করাও ঠিক নয়। (তবে আশুরা সম্পর্কে কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে, তা থেকে কিছু হাদীস আমরা পরে উল্লেখ করব।)

যে সব মনীষী এ রেওয়ায়েত দু'টি (বা যেকোনো একটি) জাল বা ভিত্তিহীন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে আছেন– ইমাম ইবনে হিব্বান[১]

---

[১] قَالَ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ-: «هٰذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ، لَا أَصْلَ لَهُ».

ইবনুল জাওযী[১] হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, হাফেয ইবনুল কাইয়িম, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ শাওকানী, আবদুল হাই লাখনোভী[২] রহ. প্রমুখ।

–আলমাজরূহীন ১/২৬৫-২৬৬, আলমাওযূআত ২/৫৬৮-৫৭২, মীযানুল ইতিদাল ১/৪৫১-৪৫২, ৩/৬৫৬, লিসানুল মীযান ২/৫৪৬-৫৪৮, ৭/৩৭৫-৩৭৭, আল্লাআলিল মাসনূআ ২/১০৮-১১০, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৪৯-১৫১, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১২৯-১৩০, আলআছারুল মারফূআ ৯৪-৯৬; আরও দ্রষ্টব্য, আলমানারুল মুনীফ ৪৭, ৫২, আলআসরারুল মারফূআ ২৯৪, ৩০০

উল্লেখ্য, একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আশুরার দিন নূহ আ.এর নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থেমেছিল। কিন্তু রেওয়ায়েতটি দুর্বল। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. রেওয়ায়েতটিকে 'গারীব' বলেছেন।[৩]

---

[১] قَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَشُكُّ عَاقِلٌ فِيْ وَضْعِهٖ، وَلَقَدْ أَبْدَعَ مَنْ وَضَعَهٗ، وَكَشَفَ الْقِنَاعَ، وَلَمْ يَسْتَحْيِ وَأَتٰى فِيْهِ الْمُسْتَحِيْلَ، وَهُوَ قَوْلُهٗ: وَأَوَّلُ يَوْمٍ خَلَقَ اللهُ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَهٰذَا تَغْفِيْلٌ مِنْ وَاضِعِهٖ، لِأَنَّهٗ إِنَّمَا يُسَمّٰى يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ إِذَا سَبَقَهٗ تِسْعَةٌ، وَقَالَ فِيْهِ: خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ. وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ»، وَفِيْهِ التَّحْرِيْفُ فِيْ مَقَادِيْرِ الثَّوَابِ الَّذِيْ لَا يَلِيْقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيْعَةِ، وَكَيْفَ يَحْسُنُ أَنْ يَصُوْمَ الرَّجُلُ يَوْمًا فَيُعْطٰى ثَوَابَ مَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقُتِلَ شَهِيْدًا، وَهٰذَا مُخَالِفٌ لِأُصُوْلِ الشَّرْعِ، وَلَوْ نَاقَشْنَاهُ عَلٰى شَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ لَطَالَ، وَمَا أَظُنُّهٗ إِلَّا دُسَّ فِيْ أَحَادِيْثِ الثِّقَاتِ، وَكَانَ مَعَ الَّذِيْ رَوَاهُ نَوْعُ تَغَفُّلٍ، وَلَا أَحْسِبُ ذٰلِكَ إِلَّا فِي الْمُتَأَخِّرِيْنَ». وَقَالَ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرٰى-: «هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ بِلَا شَكٍّ». اِنْتَهٰى كَلَامُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى.

[২] قَالَ: «وَأَمَّا هٰذِهِ الْأَحَادِيْثُ الطِّوَالُ الَّتِيْ ذُكِرَ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ الْوَقَائِعِ الْعَظِيْمَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَا أَصْلَ لَهَا، وَإِنْ ذَكَرَهَا كَثِيْرٌ مِنْ أَرْبَابِ السُّلُوْكِ وَالتَّارِيْخِ فِيْ تَوَالِيْفِهِمْ، وَمِنْهُمُ الْفَقِيْهُ أَبُو اللَّيْثِ، ذَكَرَ فِيْ «تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ» حَدِيْثًا طَوِيْلًا فِيْ ذٰلِكَ، وَكَذَا ذَكَرَ فِيْ «بُسْتَانِهٖ»، فَلَا تَغْتَرَّ بِذِكْرِ هٰؤُلَاءِ، فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ لِنَقْدِ الرِّجَالِ، لَا لِمُجَرَّدِ ذِكْرِ الرِّجَالِ». اِنْتَهٰى كَلَامُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى.

[৩] قَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَلِبَعْضِهٖ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيْحِ». اِنْتَهٰى. أَشَارَ إِلٰى حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي «الصَّحِيْحِ» (٢٠٠٤)، وَفِيْهِ قِصَّةُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطْ.

দেখুন, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৭১৭ (টীকা), আনীসুস সারী ফী তাখরীজি ওয়া-তাহক্বীকি্ল আহাদীস আল্লাতী যাকারাহাল হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ফী ফাতহিল বারী ১০/৭১৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা হুদ, আয়াত ৪৪

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহীহ হাদীস

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠٠٢).

[সহীহ হাদীস] "আয়েশা রা. বলেন, জাহেলি যুগে কুরাইশরা আশুরার দিন রোযা রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোযা রাখতেন। মদীনায় আসার পরও এ দিন তিনি রোযা রাখেন এবং অন্যদের রোযা রাখতে বলেন। এরপর রমযানের রোযা ফরয হলে তিনি আশুরার রোযা রাখা ছেড়ে দেন। (অর্থাৎ ফরয রোযা হিসেবে আর আশুরার রোযা রাখেননি।) এরপর কেউ আশুরার রোযা রাখত, কেউ রাখত না।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০২, এ হাদীসের ব্যাখ্যা দেখুন, ফাতহুল বারী ৪/২৯১

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ؟ فَقَالُوْا: هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে দেখলেন, ইহুদিরা আশুরার দিন রোযা রাখে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তোমরা এ দিন রোযা রাখছ যে? তারা বলল, এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন। এ দিন আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে মারেন এবং মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের

ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেন। তাই শোকর আদায় করার জন্য মূসা আ. এ দিন রোযা রেখেছিলেন। আমরাও তাই এ দিন রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মূসা (আ.)এর বিষয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার। এরপর তিনি রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে বলেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩০

তবে ইহুদিদের সঙ্গে যেন সাদৃশ্য না হয় তাই দশ তারিখের সঙ্গে নয় বা এগারো তারিখও রোযা রাখা উচিত।

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُوْلُ: حِينَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١١٣٤)

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রাখার কথা বললে সাহাবায়ে কেরাম আরয করেন, এই দিনটিকে তো ইহুদি-খ্রিষ্টানরা সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বছর আমরা নয় তারিখও রোযা রাখব।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩৪

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ، صُوْمُوْا قَبْلَهٗ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهٗ يَوْمًا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢١٥٤)، اُنْظُرِ التَّعْلِيْقَ عَلَيْهِ. وَالْحَدِيْثُ مُحْتَمَلُ الضَّعْفِ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «وَهٰذَا الَّذِيْ أَمْلَيْتُ لِدَاوُدَ هُوَ عَامَّةُ مَا يَرْوِيْهِ، وَلَعَلَّهٗ لَا يَرْوِيْ غَيْرَ مَا ذَكَرْتُهٗ إِلَّا حَدِيْثًا أَوْ حَدِيْثَيْنِ وَعِنْدِيْ أَنَّهٗ لَا بَأْسَ بِرِوَايَاتِهٖ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ، فَإِنَّ عَامَّةَ مَا يَرْوِيْهِ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ»، وَقَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِيْهِ مِمَّا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আশুরার দিন রোযা রাখবে। (কিন্তু) রোযা রাখার ক্ষেত্রে ইহুদিদের বিপরীত করবে। আশুরার আগে একদিন বা পরে একদিন রোযা রাখবে।" –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২১৫৪

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠٠٦)

[সহীহ্ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার দিন এবং রমযান মাসে যেরূপ গুরুত্বের সঙ্গে রোযা রাখতে দেখেছি, সেরূপ অন্য কোনো সময় দেখিনি।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৬

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١١٦٢)

[সহীহ্ হাদীস] "আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আশাবাদী, আশুরার রোযার ওসিলায় আল্লাহ তাআলা অতীতের এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

আশুরার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে আরও হাদীস দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭

এ হাদীসগুলো থেকে বোঝা গেল–

ক. আশুরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন।

খ. এ দিন আল্লাহ তাআলা কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সমুদ্রের মধ্যে পথ করে দিয়ে মূসা আ. এবং তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু সেই পথ অতিক্রম করতে গিয়েই ফেরাউন ডুবে মরেছে।

গ. মূসা আ. এ দিন শোকরানা রোযা রাখতেন।

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা করতেন, এ দিনের রোযার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা বিগত এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

ঙ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বের সঙ্গে এ দিন রোযা রাখতেন। এ ছাড়া আশুরার দিনটি মহররম মাসের একটি দিন। কুরআন কারীম চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলে অভিহিত করেছে, মহররম মাস তার অন্যতম। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ: ٣٦)

"আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এই মাসসমূহে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।" –সূরা তওবা ৩৬

একটি হাদীসে মহররম মাসকে 'আল্লাহর মাস' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং রমযানের পর এ মাসের রোযাকে সর্বোত্তম রোযা বলা হয়েছে।

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١١٦٣)

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মহররমের রোযা।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

আলী রা.কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, রমযানের পর আর কোনো মাস আছে, যাতে আপনি আমাকে রোযা রাখতে বলেন? তিনি বললেন, ঠিক এই প্রশ্ন এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করেছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٧٤١) وَقَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ».

[সহীহ হাদীস] "রমযানের পর যদি তুমি রোযা রাখতে চাও, তবে মহররম মাসে রাখ। এ মাসে এমন একটি দিন আছে, যে দিনে আল্লাহ তাআলা একটি জাতির তওবা কবুল করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্যান্য জাতির তওবা কবুল করবেন।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪১

রজব মাসের রোযার নির্দিষ্ট ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৭৩] বেহেশতে রজব নামে একটি নদী আছে। যার পানি দুধের মতো সাদা। যে ব্যক্তি রজব মাসে রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন ওই নদীর পানি পান করাবেন এবং দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।[১]

---

[১] মকছুদোল মোমেনীন ২৪১ (রাহমানিয়া লাইব্রেরি)

বহুল প্রচলিত একটি পুস্তকে বর্ণনাটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এটি একটি জাল বর্ণনা।

দ্রষ্টব্য, আলইলালুল মুতানাহিয়া ২/৫৫৫, মীযানুল ইতিদাল ৪/১৭৩, লিসানুল মীযান ৮/১৭০, ফয়যুল কাদীর ২/৪৭০, আলমুগীর, আহমদ গুমারী ২৯, আলমুদাভী, আহমদ গুমারী ২/৩৬২

রজবের সাতাশ তারিখে রোযার ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৭৪] যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় ষাট মাস রোযা রাখার সওয়াব লিখে দেবেন।[১]

বর্ণনাটি প্রমাণিত নয় বলে শাস্ত্রজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন।

দেখুন, আলআবাতীল ওয়াল-মানাকীর ৩৪৬-৩৪৭, আহাদীসু মুখতারা মিন মাওযূআতিল জাওরাকানী ও ইবনুল জাওযী, যাহাবী ৭৮, আলইলালুল মুতানাহিয়া ১/২২৬, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/৬৮০-৬৮১, ১১/৭৪, তাবয়ীনুল আজাব ৩২, ৪২-৪৫, জুযউ ইবনে আসাকির ৩১৬, শুআবুল ঈমান ৩/৩৭৩

শবে ইস্তিফতাহ

[জাল বর্ণনা-৭৫] "পনেরো রজব রাতে যে ব্যক্তি চৌদ্দ রাকাত নামায আদায় করে– প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতেহা, এগারো বার সূরা ইখলাস, তিনবার সূরা নাস পাঠ করে; এরপর 'সুব্হানাল্লাহ', 'আলহাম্দুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ত্রিশ বার করে পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তার জন্য আকাশ থেকে এক হাজার ফেরেশতা পাঠান, যারা তার জন্য নেকি লিখতে থাকে। ... অবশেষে এক ফেরেশতা তার পিঠে হাত রেখে বলে, তুমি নতুন করে আমল শুরু কর, আল্লাহ তাআলা তোমার আগের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন করে আমল শুরু করার এই বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এই রাতের নাম রাখা হয়েছে, 'শবে ইস্তিফতাহ' বা 'প্রারম্ভের রাত'। এই বর্ণনাটিও জাল। ইবনুল জাওযী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী, আবদুল হাই লাখনোভী রহ. প্রমুখ এটিকে জাল বলেছেন।

---

[১] খোতবাতুল আহকাম ১৪৮

–কিতাবুল মাওযূআত ২/৪৩৮-৪৩৯, তাবয়ীনুল আজাব ২৭, আললাআলিল মাসনূআ ২/৫৭, তানযীহুশ শরীয়া ২/৯২, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৪৪, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ৫০, আলআছারুল মারফূআ ৬০

রজব মাস ও রজব মাসে পালনীয় নামায-রোযার ফযীলত সম্পর্কে আরও অনেক কথা বিভিন্ন বই-পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই ছাড়া এগুলো বিশ্বাস করা উচিত নয়। মৌলিক কথা হল, রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো নামায বা রোযা নেই। এ মাসে নির্দিষ্ট কোনো দিনে নফল নামায বা রোযা পালনের বিশেষ কোনো ফযীলতের কথাও হাদীসে নেই। অষ্টম শতকের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে রজব রহ. বলেছেন–

فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَمْ يَصِحَّ فِيْ شَهْرِ رَجَبَ صَلَاةٌ مَخْصُوْصَةٌ تَخْتَصُّ بِه.

অর্থাৎ রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো নামায প্রমাণিত নয়।

তিনি আরও বলেন–

وَأَمَّا الصِّيَامُ فَلَمْ يَصِحَّ فِيْ فَضْلِ صَوْمِ رَجَبَ بِخُصُوْصِه شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে নির্দিষ্টভাবে রজব মাসে রোযা রাখার কোনো ফযীলতের কথা প্রমাণিত নয়।" –লাতায়েফুল মাআরেফ ২২৮

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন–

لَمْ يَرِدْ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَجَبَ، وَلَا فِيْ صِيَامِهِ، وَلَا فِيْ صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٍ، وَلَا فِيْ قِيَامِ لَيْلَةٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْهِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ، وَقَدْ سَبَقَنِيْ إِلَى الْجَزْمِ بِذٰلِكَ الْإِمَامُ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ الْهَرَوِيُّ الْحَافِظُ، رَوَيْنَاهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَكَذٰلِكَ رَوَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِه.

"রজব মাসের ফযীলত, রজব মাসে রোযা রাখার ফযীলত বা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিন রোযা রাখার ফযীলত অথবা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো রাতে ইবাদত করার ফযীলত সম্পর্কে প্রমাণ হওয়ার উপযুক্ত কোনো হাদীস নেই।" –তাবয়ীনুল আজাব ১১, আরও দ্রষ্টব্য, ফাতহুল মুলহিম ৫/৩০৬-৩০৭ (দারুল কলম, ১১৫৭ নং হাদীসের অধীনে)

তবে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম উদ্ভাবন না করে এবং নির্দিষ্ট কোনো ফযীলতের কথা বিশ্বাস না করে অন্যান্য মাসের মতোই এ মাসে স্বাভাবিক নফল নামায ও রোযা রাখার অনুমতি আছে। শুধু অনুমতি নয়, বরং যেমনটি সামনে

আসছে– রজব মাস যেহেতু আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত, তাই এ মাসে বেশি বেশি নফল ইবাদত বিশেষত নফল নামায ও নফল রোযা রাখা ভালো।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহীহ বর্ণনা

কুরআন মাজীদ চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলে আখ্যায়িত করেছে। সেগুলোর মধ্যে মাহে রজব অন্যতম। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ.

"আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এই মাসসমূহে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।" –সূরা তওবা ৩৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ».

[সহীহ হাদীস] ... বারো মাসে বছর। তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি ধারাবাহিক– যিলকদ, যিলহজ ও মহররম। চতুর্থটি হল জুমাদাল উখরা ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী মাস রজব। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৬২

সম্মানিত এই চার মাসে যে কোনো নেক আমলের সওয়াব অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি। আবার এ মাসগুলোতে গোনাহের ক্ষতিও ভয়াবহ।

[সহীহ আছার] ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "আল্লাহ তাআলা এই চার মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এ মাসগুলোতে গোনাহের ক্ষতি বেশি। আবার এ সময়ে কৃত নেক আমলের আজর ও পুরস্কারও অধিক।"

[أَثَرٌ صَحِيْحٌ] خَصَّ مِنْ ذٰلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ حُرُمًا، وَعَظَّمَ حُرُمَاتِهِنَّ، وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيْهِنَّ أَعْظَمَ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمَ.

–তাফসীরে তাবারী ১১/৪৪৪, শুআবুল ঈমান ৩/৩৭০, লাতায়েফুল মাআরেফ ২২২

তাই মুমিনের কর্তব্য, 'আশহুরে হুরুম'এর সম্মান রক্ষা করা, এ মাসগুলোতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা।

রজব মাস যেহেতু আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভুক্ত, তাই এ মাসে নফল রোযা রাখা ভালো। রজব মাসের যে কোনো দিন এই নফল রোযা রাখা যাবে। কিন্তু (যেমনটি আগে বলা হয়েছে) নির্দিষ্ট কোনো দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব মনে করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট কোনো ফযীলতের বিশ্বাস রাখা যাবে না।

[সহীহ আছার] প্রসিদ্ধ তাবেঈ সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ.কে উসমান ইবনে হাকীম রহ. রজবের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (নফল) রোযা রাখতেন তখন এত রোযা রাখতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি রোযা রাখা বন্ধই করবেন না। আবার যখন (নফল) রোযা রাখা বন্ধ করতেন তখন মনে হত, এমনই চলতে থাকবে।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৭

সাঈদ ইবনে জুবায়ের বোঝাতে চেয়েছেন, রজব মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে স্বতন্ত্র কোনো বিধান নেই; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মাসেই রোযা রাখতেন। রজব মাসও নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম নয়। তাই রজব মাসেও অন্যান্য মাসের মতো নফল রোযা রাখা বাঞ্ছনীয়। –শরহু সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী ৮/৩৮, ফাতহুল মুলহিম ৫/৩০৬-৩০৭

২৭ রজব ইসরা ও মেরাজ সংঘটিত হওয়া

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৭৬] ২৭ রজব ইসরা ও মেরাজ সংঘটিত হয়।

কথাটির কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। একটি ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু তা আদৌ নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা নয়। ইমাম ইবনে কাসীর ও হাফেয ইবনে রজব রহ.-এর মতো হাদীস বিশারদ বলেছেন, বর্ণনাটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ নয়। ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেস্কিও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। হাফেয ইবনে রজব রহ. উল্লেখ করেছেন, তৃতীয় শতকের বিখ্যাত ইমাম ইবরাহীম হারবী রহ. ২৭ রজব মেরাজ হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।

বস্তুত, মেরাজের দিন-তারিখ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত কোনো হাদীস, সাহাবীর উক্তি বা ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় না। তাই মেরাজের দিন-তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা মুশকিল। দলিলবিহীন কোনো কিছু বলা থেকে বিরত থাকাই সতর্কতার দাবি।

নিঃসন্দেহে মেরাজের রাত একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাত। কিন্তু এ রাতে করণীয় বিশেষ কোনো আমল বা ইবাদত উম্মতের জন্য বিধিবদ্ধ হয়নি। তাই এর দিন-তারিখও সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকেনি।

আমাদের কর্তব্য, দিন-তারিখের পেছনে না পড়ে মেরাজের তত্ত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা, মেরাজের শিক্ষা ও নির্দেশনা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা। দ্রষ্টব্য, যাদুল মাআদ ১/৫৭-৫৯, লাতায়েফুল মাআরেফ, ইবনে রজব ২৩৩, জামিউল আছার, ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেস্কি ৩/১৬৫১, আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩/৩৪০ (দারু ইবনে কাসীর) আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, কাস্তাল্লানী ৩/১৪ (আলমাকতাবুল ইসলামী) শরহুল মাওয়াহিব ৮/১৭-১৯, ইসলাহী খুতুবাত, মুহাম্মদ তকী উসমানী ১/৪৮-৫৫

রমযান মাসের নির্দিষ্ট ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৭৭] তিন ধরনের খাবারের হিসাব নেওয়া হবে না– সাহরির খাবার, ইফতারের খাবার এবং যে খাবার মুসলমানের সঙ্গে খাওয়া হয়।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মুহাম্মদ শাওকানী রহ. প্রমুখ বলেছেন, বর্ণনাটি জাল।

–যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৪৭১-৪৭২, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৬৬, তাযকিরাতুল মাওযূআত ৭০, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১২৪

এ মর্মের আরেকটি জাল বর্ণনা

[জাল বর্ণনা-৭৮]

نَفَقَةُ الضَّيْفِ وَنَفَقَةُ الْمُتَعَلِّمِ وَنَفَقَةُ الْمُعَلِّمِ وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَنَفَقَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ لاَ يُحَاسِبُ اللهُ الْعَبْدَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

পাঁচ জিনিসের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় আল্লাহ তাআলা তার হিসাব নেবেন না– মেহমান, ইলমে দ্বীন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীর পেছনে ব্যয় এবং হজ ও রমযানে যে ব্যয় করা হয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন–

هٰذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ يُدْرِكُ ذٰلِكَ مَنْ لَهُ أَدْنٰى فَهْمٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ...

"এটি একটি স্পষ্ট বাতেল বর্ণনা। হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কে যার সামান্য ধারণা আছে সেও তা বুঝবে ...।" –লিসানুল মীযান ৪/৪১৬, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/১৮৮-১৮৯, তানযীহুশ শরীয়া ১/২৭৯

রমযানে অনেককেই বলতে শোনা যায়, 'খাও খাও, এ খাবারের হিসাব হবে না।' সম্ভবত উপরিউক্ত জাল বর্ণনাটিই এ ধারণার উৎস। বর্ণনাটির যেহেতু প্রামাণিক কোনো ভিত্তি নেই, তাই এ কথাটি বলা উচিত নয়।

রোযা ত্রিশ হওয়ার তাৎপর্য

[জাল বর্ননা-৭৯] আদম আ. জান্নাতে যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন তা ত্রিশ দিন তাঁর পেটে ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ত্রিশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তাঁর অনুকরণার্থে আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মতের উপরও ত্রিশ দিন রোযা রাখা ফরয করেছেন।

বর্ণনাটি মনগড়া। ইবনুল জাওযী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী রহ. প্রমুখ জাল বর্ণনা সম্পর্কে লিখিত স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

–কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৪৩, আললাআলিল মাসনূআ ২/৯৭, তানযীহুশ শরীয়া ২/৯৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১১৯

যিলহজ মাস

যিলহজের শেষ দিন এবং মহররমের প্রথম দিন রোযার ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৮০] যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের শেষ দিন আর মহররম মাসের প্রথম দিন রোযা রাখল সে বিগত বছরও শেষ করল রোযা দিয়ে, নতুন বছরও শুরু করল রোযা দিয়ে। এর বদৌলতে আল্লাহ তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

ইবনুল জাওযী, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী রহ. প্রমুখের মতে বর্ণনাটি জাল।

–কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৬৬, তালখীসুল মাওযূআত ২০৬ (৫০০) (মাকতাবাতুর রুশ্দ) আললাআলিল মাসনূআ ২/১০৮, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৪৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১৮, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১২৯

যিলহজের প্রথম দশদিনে রোযা রাখার নির্দিষ্ট ফযীলত

[জাল বর্ণনা-৮১] এক যুবকের অভ্যাস ছিল, যিলহজ মাসের চাঁদ উঠতেই সে রোযা রাখতে শুরু করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার

কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ দিনগুলোতে রোযা রাখ কেন? সে বলল, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কোরবান হোক, এ দিনগুলো পবিত্র হজের প্রতীক। হজ আদায়ের মুবারক সময়। হজ আদায়কারীদের সঙ্গে আমিও নেক আমলে শরিক হই এই আশায় যে, তাদের সঙ্গে আল্লাহ আমার দুআও কবুল করে নেবেন। নবীজী তার কথা শুনে বললেন, তোমার প্রত্যেকটি রোযার বিনিময়ে তুমি এক শ গোলাম আযাদ করার, এক শ উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার, যুদ্ধের সরঞ্জামে সজ্জিত এক শ ঘোড়া জিহাদের জন্য দান করার সওয়াব পাবে।

আর আটই যিলহজের রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার, এক হাজার উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার, যুদ্ধের সরঞ্জামে সজ্জিত এক হাজার ঘোড়া জিহাদের জন্য দান করার সওয়াব পাবে।

আর নয়ই যিলহজের রোযার বিনিময়ে দুই হাজার গোলাম আযাদ করার, দুই হাজার উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার, যুদ্ধের সরঞ্জামে সজ্জিত দুই হাজার ঘোড়া জিহাদের জন্য দান করার সওয়াব পাবে।

ঘটনাটি বানোয়াট। এ রকম কোনো ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি। ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তার কথা সমর্থন করেছেন। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

هٰذَا كَأَنَّهُ مَوْضُوْعٌ.

'মনে হচ্ছে বর্ণনাটি জাল।'

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর কথা উদ্ধৃত করে বলেন, এই বর্ণনা জাল না হলে পৃথিবীতে আর কোনো জাল বর্ণনা-ই নেই। (অর্থাৎ এই বর্ণনা জাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।) ইবনে আররাক কিনানী রহ. তাঁর কথা উদ্ধৃত করে মৌন সমর্থন করেছেন।

–কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৬৪, মীযানুল ইতিদাল ৩/৬৬৯, লিসানুল মীযান ৭/৪০৫, আললাআলিল মাসনূআ ২/১০৭, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৪৮, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১২

যিলহজ সম্পর্কে প্রমাণিত বিষয়

কুরআন কারীম চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলে আখ্যায়িত করেছে। যিলহজ্ব মাস তার অন্যতম। তাই এ মাসের প্রতিটি

দিনই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এ মাসেই হজ আদায় করা হয় এবং ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ করে যিলহজের প্রথম দশ দিন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একটি সহীহ হাদীসে এসেছে–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، قَالُوْا: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

[সহীহ হাদীস] অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিলহজের প্রথম দশদিনে কৃত নেক আমলের চেয়ে উত্তম নেক আমল আর নেই। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৬৯

অর্থাৎ এই দশদিনের নেক আমল বছরের অন্যান্য দিনের নেক আমলের তুলনায় অধিক ফযীলতপূর্ণ। এ দশদিনের রোযাও বছরের অন্যান্য দিনের চেয়ে (রমযানের রোযা ব্যতীত) ফযীলতপূর্ণ। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, (যিলহজের নয় তারিখ) আরাফার দিনের রোযার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা গত এক বছর এবং আগামী এক বছর মোট দু'বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ -فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ-: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨٠٣)

[সহীহ হাদীস] "আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আশা করি আরাফার দিনের রোযার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮০৩

যিলহজ মাসে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, এ মাসের সম্মান রক্ষা করা, সাধ্যানুযায়ী নেক আমল করার চেষ্টা করা কর্তব্য। বিশেষ করে যিলহজের প্রথম দশদিন যথাসম্ভব বেশি বেশি নেক আমল করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। তবে 'পঞ্চাশ বছরের গোনাহ ক্ষমা করে

দেওয়া' এবং 'উট, ঘোড়া ও গোলাম আযাদ করার সওয়াবের' কথা বিশ্বাস করা যাবে না। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বলেই নেক আমলে উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য।

নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী, পরিবার ও দাম্পত্য জীবন

নেককার নারী ও বদকার নারী

[জাল বর্ণনা-৮২] একজন নেককার নারী সত্তরজন ওলী-আল্লাহ্ পুরুষ থেকে উত্তম। আর একজন বদকার নারী হাজারও পুরুষের চেয়ে খারাপ।[১]

মুহাদ্দিস আহ্মদ বিন সিদ্দীক গুমারী রহ. বলেছেন, 'কোনো সন্দেহ নেই যে এটি মিথ্যা।' –আলমুগীর ৭৫

শারীরিক ও মানসিক কিছু প্রভেদের কারণে কিছু কিছু বিধানে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য থাকলেও নেক আমলের নেক প্রতিদান আর মন্দ আমলের মন্দ প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যে যেমন আমল করবে সে তেমনই ফল পাবে। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

"যে অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে (আমলনামায়) তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।" –সূরা যিলযাল ৭-৮

স্বামী-স্ত্রীর হাসি-খুশি দেখা-সাক্ষাতের সওয়াব

[জাল বর্ণনা-৮৩] স্বামী-স্ত্রী যখন হাসি-খুশি দেখা-সাক্ষাৎ করে তখন আল্লাহ তাআলাও তাদের উভয়ের প্রতি রহমতের নজর করেন।[২]

---

[১] মকছুদোল মোমেনীন ৩৬৯

[২] মকছুদোল মোমেনীন ৩৪০

বর্ণনাটি জাল। এর সনদে (বর্ণনাসূত্রে) ইসমাঈল বিন ইয়াহয়া আত্তাইমি নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছে, যার ব্যাপারে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। তাই আহমদ গুমারী রহ. বলেছেন– هٰذَا بَاطِلٌ مَوْضُوْعٌ.

অর্থাৎ বর্ণনাটি বাতেল মওযূ (জাল)।

দ্রষ্টব্য, লিসানুল মীযান ২/১৮১, আলমুদাভী ২/২৮৯

বর্ণনাটি যদিও জাল, কিন্তু বিষয়টি কুরআন সুন্নাহর ভিন্ন বক্তব্য দ্বারা স্বীকৃত। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

"তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে 'সুকূন' (প্রশান্তি) লাভ করতে পার। **তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন**। নিশ্চয়ই এর ভেতর চিন্তাশীল লোকদের জন্য সমূহ নিদর্শন রয়েছে।" –সূরা রূম ২১

স্বামী-স্ত্রীর মনে এই যে ভালোবাসা ও দয়া আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তার প্রকাশ নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতের কারণ। হাসি-খুশি অবস্থায় দেখা-সাক্ষাৎও যার অন্তর্ভুক্ত।

এ গ্রন্থে একাধিকবার এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বিষয় শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত হলেই সে বিষয়ে কোনো হাদীস থাকা জরুরি নয়। যে কোনো শরয়ী দলিল দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। আলোচ্য বিষয়টিও সে আওতাভুক্ত।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে দুর্ব্যবহার সহ্য করার সওয়াব

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৮৪] যে ব্যক্তি স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করবে আল্লাহ তাআলা তাকে আইয়ূব আ.এর মতো সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার সহ্য করবে আল্লাহ তাআলা তাকে আছিয়া আ. (ফেরাউনের স্ত্রী)এর মতো সওয়াব দান করবেন।

বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন–

لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلٰى أَصْلٍ.

"আমি এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি।"

হাফেয তাজুদ্দীন সুবকী রহ.ও এটি ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার মুরতাযা যাবীদী রহ. যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ.এর কথা সমর্থন করেছেন। –তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা ৬/৩১০, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৫/৩৫২, আরও দ্রষ্টব্য, আললাআলিল মাসনূআ ২/৩৬১-৩৭৩

আইয়ূব আ. বা আম্বিয়া আ.এর মতো সওয়াব পাওয়ার কথা তো হাদীসে নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নেক নিয়তে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরকে সহ্য করে তাহলে তারা অশেষ সওয়াবের অধিকারী হবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং একে অপরের মানবীয় দুর্বলতা সহ্য করা সুখী দাম্পত্য জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে বিভিন্ন হাদীসে এর প্রতি জোর তাগিদও করা হয়েছে। হাদীসের এ শিক্ষানুযায়ী আমল করা প্রত্যেক মুসলিম দম্পতির অবশ্য কর্তব্য।

পরিবারের জন্য নিজ হাতে আসবাব-পত্র বহনের সওয়াব

[জাল বর্ণনা-৮৫] পরিবারের জন্য নিজে জিনিসপত্র বহন করলে সত্তর বছরের পাপ মোচন হয়।[১]

এটি হাদীস নয়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, ইবনে হাজার হাইতামী, মুহাম্মদ শাওকানী রহ. প্রমুখ বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন।

–যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৫০৬-৫০৭, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৯৭, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১৫৩, আলহাভী লিল ফাতাওয়া ২/১৮৭, আলফাতাওয়াল হাদীসিয়া, ইবনে হাজার হাইতামী ৩১৩, কাশফুল খাফা ২/২৫

বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়, কিন্তু কাজটি যথার্থই সওয়াবের এবং তা স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ। তালেবে ইলম ভাইদের দেখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে, ইসলাহী খুতুবাত ১৭/২৫২-২৬৯ (گھر کے کام خود انجام دینے کی فضیلت)

স্বামীর কাপড় ধুয়ে দেওয়ার সওয়াব

[জাল বর্ণনা-৮৬] যে স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর কাপড় ধুয়ে দেবে আল্লাহ তাআলা তার আমলনামা থেকে দু'হাজার গোনাহ কেটে দেবেন। আসমান-জমিনের

[১] মকছুদোল মোমেনীন ৩৪০

ফেরেশতারা তার জন্য নেক দুআ করতে থাকবে।[১]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেছেন, এটি একটি 'বাতেল' বর্ণনা। ইবনে হাজার হাইতামী রহ. বলেছেন, এটি জালকৃত। ইসমাঈল আজলূনী রহ. তাঁদের কথা সমর্থন করেছেন। –আলহাভী লিল-ফাতাওয়া ২/১৮৭ (১৮৩-২০৮) আলফাতাওয়াল হাদীসিয়া, ইবনে হাজার হাইতামী, ৩১২-৩১৫, কাশফুল খাফা ১/৯২

তবে স্বামীর সহযোগিতা বা 'ইকরাম'-এর নিয়তে কোনো স্ত্রী এ কাজটি করলে সে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে সময়-সুযোগে স্বামীও যদি ঘরোয়া কাজে স্ত্রীর সহযোগিতা করে তাহলে সেও সওয়াবের অধিকারী হবে।

ডিমের গুণাগুণ

[জাল বর্ণনা-৮৭] এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার সন্তান নেই। নবীজী তাকে ডিম খেতে বললেন।

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেছেন, 'কোনো সন্দেহ নেই যে এটি জাল। এ ধরনের কথা কিতাবাদিতে উল্লেখ করা জায়েয নয়।'

ইবনুল জাওযী, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর কথা সমর্থন করেছেন। ইবনুল কাইয়িমও বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন। –আলমাজরূহীন ২/৩০৮, কিতাবুল মাওযূআত ৩/১৫৬-১৫৭, মীযানুল ইতিদাল ৪/৬২, লিসানুল মীযান ৭/৫৭৫, আলমানারুল মুনীফ ৬৪, আরও দ্রষ্টব্য, তানযীহুশ শরীয়া ২/২৫২, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১৭৫-১৭৬ (টীকাসহ)

দাম্পত্য মিলনের বিধিনিষেধ

[জাল বর্ণনা-৮৮] বিবির শরমগাহের (স্ত্রীলিঙ্গের) দিকে দেখে দেখে ছোহবত (সঙ্গম) করলে এবং তাতে সন্তান জন্ম নিলে সেই সন্তান বে-তমিজ ও বেআদব হবে অথবা অন্ধও হতে পারে।

প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উপরিউক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হল। বর্ণনাটি জাল। ইমাম আবু হাতেম রাযী, ইমাম ইবনে হিব্বান বুস্তী, ইবনুল জাওযী রহ. বর্ণনাটি মওযূ (জাল) বলে মত দিয়েছেন। হাফেয যাহাবী, জামালুদ্দীন যাইলাঈ ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আবু হাতেম রাযী রহ.এর

[১] মকছুদোল মোমেনীন ৩৫১

কথা উল্লেখ করে তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

–ইলালু ইবনে আবি হাতেম (২৩৯৪) আলমাজরূহীন ১/২০২, কিতাবুল মাওযূআত ৩/৬৮, তালখীসুল মাওযূআত ২৩৩ (৫৯৩) [মাকতাবাতুর রুশ্‌দ] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৫২৫, নাসবুর রায়াহ ৪/২৪৮, আত্‌তালখীসুল হাবীর ৫/২২৫১, আরও দ্রষ্টব্য, আলকামেল ফিয যুয়াফা ২/২৬৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/২১৬, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ২/৫২৪-৫২৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৬৬-১৬৭ (টীকা)

এ বিষয়ের আরও দু'টি জাল বর্ণনা

[জাল বর্ণনা-৮৯] আলী! চান্দের ১৫ই তারিখে বিবির সঙ্গে কখনও ছোহবত করো না। কেননা ওই তারিখে শয়তান লোকের নিকট উপস্থিত হয়ে থাকে।

[জাল বর্ণনা-৯০] হযরত আলী রা. 'অছয়া' কিতাবে লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তি চান্দের প্রথম, মধ্যম ও শেষ তারিখে স্ত্রী সঙ্গম করে এবং তাতে সন্তান জন্মলাভ করে, তবে সে সন্তান নিশ্চয়ই কোন না কোন দোষে দোষী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

তিনি আরও বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে অথবা সফরে যাওয়ার রাতে ছোহবত করে এবং তাতে সন্তান জন্মে, তবে নিশ্চয়ই সে সন্তানও কোন না কোন দোষে দোষী হবে।

তিনি আরও লিখেছেন, সোমবার দিনে বা রাতে ছোহবতে যে সন্তান জন্মলাভ করবে খোদার ফজলে সে সন্তান ক্বারী হবে। মঙ্গলবারের ছোহবতে সন্তান জন্মলাভ করলে সেই সন্তান সুখী হবে। বৃহস্পতিবারের ছোহবতে সন্তান জন্মলাভ করলে সে সন্তান আলেম ও মুত্তাকী হবে এবং উক্ত দিন দ্বিপ্রহরের আগে ছোহবত করলে তাতে যে সন্তান জন্মলাভ করবে সে আলেম ও হাকীম হবে। আর জুমার রাতে বা নামাযের আগের ছোহবতে সন্তান জন্ম নিলে নেক-বখত ও মুখলেস হবে। আর বুধবার ও রবিবারের ছোহবতে সন্তান জন্ম নিলে তারা ভাগ্যহীন হবে।

এ বর্ণনা দুটোও পূর্বোক্ত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোও মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.কে এই অসিয়ত করেননি। 'অসায়া আলী' বা আলী রা.এর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত নামের এই গোটা পুস্তিকাটিই জাল। ইমাম বাইহাকী, ইবনুল জাওযী, হাসান বিন মুহাম্মদ সাগানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মদ শাওকানী ও আবুল মাহাসিন কাউক্‌জী রহ. প্রমুখ এ পুস্তিকাটিকে জাল সাব্যস্ত করেছেন।

-দালায়েলুন নুবুওয়া ৭/২২৯, আলমাওযূআত ৩/৪৪৭-৪৪৯, রিসালাতুস সাগানী ২, আললাআলিল মাসনূআ ২/৩৭৪, তানযীহুশ শরীয়া ২/৩৩৯, আলমাসনূ ২৩৬, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ৪২৫, আল্লু'লুউল মারসূ ১০৪

ইসলামে দাম্পত্য মিলনের এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ নেই। যেকোনো দিন, যেকোনো সময়, শরীয়ত সমর্থিত যেকোনো পদ্ধতিতে দাম্পত্য মিলনের অনুমতি আছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দেখার ব্যাপারেও (যেকোনো অঙ্গই হোক না কেন) কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সন্তানের শারীরিক গড়ন বা মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও এর কোনো প্রভাব নেই। কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ দেখার কারণে সন্তানের মানসিক কিংবা শারীরিক গঠনে প্রভাব পড়ার যে কল্পিত ধারণা উপরিউক্ত জাল বর্ণনায় দেওয়া হয়েছে, তার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই।

এমনিভাবে সন্তান জন্মের, সন্তান ভাগ্যবান-ভাগ্যহীন হওয়ার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কোনো দিন বা তারিখের প্রভাব নেই। উপরিউক্ত জাল বর্ণনাটিতে সন্তান জন্মলাভে, সন্তানের চরিত্র গঠনে এবং সন্তান ভাগ্যবান-ভাগ্যহীন হওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিনে দাম্পত্য মিলনের যে প্রভাবের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইসলামী আকীদা বিরোধী। এসব বিশ্বাস করা নাজায়েয।

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের পুরস্কার

[জাল বর্ণনা-৯১] যে স্ত্রী স্বামীর ঘরের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ঘরের কোনো বস্তু যথাস্থানে তুলে রাখে তার জন্য তাকে একটি নেকি দান করা হয়, একটি পাপ ক্ষমা করা হয়, তাকে উচ্চ মর্তবা দান করা হয়। যে স্ত্রী স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হয় সে দিনভর রোযা রাখার, রাতভর ইবাদত করার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সওয়াব পায়। তার প্রসব বেদনা শুরু হলে প্রত্যেক বারের বেদনার জন্য একজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব পায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের প্রত্যেক ঢোক দুধের বিনিময়ে সে একজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব পায়। শিশুর দুধ ছাড়ানো হয়ে গেলে আসমান থেকে আওয়াজ দিয়ে বলা হয়, তোমার কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন বাকি কাজের জন্য প্রস্তুত হও।

বর্ণনাটি জাল। যিয়াদ ইবনে মায়মূন নামে এক মিথ্যাবাদী দাগাবাজ এটি জাল করেছে। ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী রহ. বলেছেন, এটি একটি বাতেল বর্ণনা। কাযী ইয়ায রহ. বলেছেন, এটি প্রমাণিত নয়। ইবনুল জাওযী রহ.

বলেছেন, এটি জাল-বানোয়াট। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এবং ইবনে আররাক কিনানী রহ. তার কথা সমর্থন করেছেন।
-কিতাবুল মাওযূআত ৩/৬৭, ইকমালুল মু'লিম ১/১৫১, আললাআলিল মাসনূআ ২/১৭০, তানযীহুশ শরীয়া ২/২০৫, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৬৫

এ মর্মের আরেকটি জাল বর্ণনা

[জাল বর্ণনা-৯২] স্ত্রী স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হলে গর্ভধারণের সময় থেকে নিয়ে প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত দিনে রোযা রাখার আর রাতভর নফল নামায পড়ার সওয়াব পায়। যখন তার প্রসব বেদনা শুরু হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন পুরস্কার গচ্ছিত রাখেন আসমান জমিনের কেউ যা জানতে পারে না। সন্তান প্রসবের পর থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত প্রতি ঢোক দুধের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে একটি করে নেকি দান করেন। এ সময়ের মধ্যে সে মারা গেলে তাকে শহীদের মর্যাদা দান করা হয়। সন্তানের জন্য যদি তাকে কোনো রাত জাগতে হয় তাহলে ওই রাত জাগার বিনিময়ে তাকে সত্তরটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব দেওয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলে দিলেন, এই সওয়াবসমূহ কেবল তাদেরই দেওয়া হবে, যারা আল্লাহর হুকুম ও স্বামীর নির্দেশ মেনে 'আওরাতে হাসীনার' অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। আল্লাহ ও স্বামীর হুকুম অমান্যকারী স্ত্রীদের এই সওয়াব দেওয়া হবে না।[১]

ইমাম ইবনে হিব্বান বুসতী রহ. বলেছেন, বর্ণনাটি জাল। আমর বিন সাঈদ নামে এক লোক তা জাল করেছে। ইবনুল জাওযী, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী রহ. প্রমুখ তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। গত শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আহমদ আলগুমারী রহ. বলেছেন, যে মনে করে যে, এ ধরনের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সে হাদীসশাস্ত্রের ঘ্রাণও শুঁকেনি। বর্ণনাটির জাল হওয়ার বিষয়টি এত স্পষ্ট যে, সুস্থ রুচিবোধসম্পন্ন কারও এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

-আলমাজরূহীন ২/৬৮, মীযানুল ইতিদাল ৩/২৫৩, লিসানুল মীযান ৬/২০৯, কিতাবুল মাওযূআত ৩/৭৩, তানযীহুশ শরীয়া ২/২০৪, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৭২, আলমুগীর ২৬-২৭

---

[১] মকছুদোল মোমেনীন ৩৫১-৩৫২

উল্লেখ্য, একটি সহীহ্ হাদীসে আছে–

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٧٣)

হাদীসটির মর্মার্থ হল, একজন মুমিন বান্দা শারীরিক বা মানসিক যে কোনো কষ্টের সম্মুখীন হোক না কেন, তার যথাযথ প্রতিদান সে পাবে।[১]

দীর্ঘদিন ধরে একটি শিশুসন্তানকে গর্ভে ধারণ করে যাওয়া এবং এক সময় প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করে তাকে পৃথিবীর বুকে প্রসব করা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কষ্টের কাজগুলোর একটি। গর্ভধারিণী মা অবশ্যই এর যথাযোগ্য প্রতিদান পাবেন। খোদ কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এ কষ্টের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। **তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টে এবং প্রসবও করেছে কষ্টে।** তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ মাস।"[২] –সূরা আহকাফ ১৫

অন্য এক স্থানে আবারও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে এই নির্দেশ দিয়েছি– তুমি আমার ও তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় কর, **তার মা তাকে প্রচণ্ড কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে** এবং তার দুধ ছাড়াতেও লেগেছে দু'বছর।" –সূরা লুকমান ১৪

গর্ভধারিণী মায়ের ফযীলতের জন্য কুরআনের এ মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিই যথেষ্ট।

---

[১] আরও দেখুন, সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৭০, ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৪, ২৫৭৫

[২] মানব শিশুর জীবিত জন্মগ্রহণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হল ছয় মাস আর দুধ পান করানোর সর্বশেষ মেয়াদ দু'বছর। এভাবে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছরকাল শিশুর জন্য মাকে অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়। –তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, সূরা আহকাফ ১৫

প্রবাদ-প্রবচন ও উক্তি

[হাদীস নয়-৯৩] تَعَاشَرُوْا كَالْإِخْوَانِ وَتَعَامَلُوْا كَالْأَجَانِبِ

আচার-আচরণ কর ভাইয়ের মতো, লেনদেন কর অপরিচিতের মতো।

এটি হাদীস নয়। একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী। বিভিন্ন হাদীসের শিক্ষার আলোকে কোনো বিজ্ঞজন কথাটি বলেছেন। এক সময় তা প্রবাদে পরিণত হয়। হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. একটি চিঠিতে এটি 'বড়দের উক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন।

দেখুন, আত্তামছীল ওয়াল-মুহাযারা, ছা'লাবী ১৯৯, মাজমাউল আমছাল, মায়দানী ১/২৬৬, আলমুস্তাতরাফ ফী কুল্লি ফান্নিন মুস্তাযরাফ ৪৫, আলকাশকুল, বাহাউদ্দীন আমিলী (মৃত্যু ১০৩১ হি.) ১/৩৪৬, মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম (হযরত মাদানী) ২/১৬১

প্রবাদটির মর্ম হল, রক্ত সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে মানুষ যে অকৃত্রিম, আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে সব মানুষের সঙ্গেই তেমনি করা উচিত। কিন্তু লেনদেনের বিষয়টি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, দু'জন অপরিচিত লোক যে স্বচ্ছতা ও সতর্কতা রক্ষা করে লেনদেন করে সেভাবে লেনদেন করা। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠজন, একান্ত আপনজন যার সঙ্গেই লেনদেন করা হোক, সর্বাবস্থায় তাতে স্বচ্ছতা রক্ষা করা কর্তব্য। নিকটজন বা আপনজন হওয়ার কারণে এতে শিথিলতা করা ঠিক নয়।

কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামের শিক্ষা। বিভিন্ন হাদীসে এর প্রতি জোর তাগিদ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাক্যটিকে সরাসরি হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। কারণ বাক্যের মর্মবাণী বিভিন্ন হাদীসের নির্দেশনা দ্বারা সমর্থিত হলেও হুবহু এ

বাক্যে কথাটি হাদীসে পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ কোনো হাদীসগ্রন্থে আমরা এটি খুঁজে পাইনি।

[হাদীস নয়-৯৪] اِتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ/التُّهَمِ

অপবাদের জায়গা থেকে দূরে থাক।

এটি হাদীস নয়। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন-

لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلاً.

'আমি এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি।'

হাফেয তাজুদ্দীন সুবকী রহ.ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। মুরতাযা যাবীদী রহ. যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ.এর কথা উল্লেখ করে মৌন সমর্থন করেছেন।[১]

-আলমুগনী আন হামলিল আসফার ৩/৫৩, তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা ৬/৩৩২, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৭/২৮৩

তবে সন্দেহ নেই, এটি একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী এবং এ মর্মে ওমর রা.এর একটি উক্তিও রয়েছে। তিনি বলেছেন-

مَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمِ فَلَا يَلُوْمَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.

[গ্রহণযোগ্য আছার] "যে ব্যক্তি অপবাদের স্থানে যায়, তার প্রতি কেউ খারাপ ধারণা করলে সে যেন তাকে দোষ না দেয়।"

-আয্যুহ্দ, ইমাম আবু দাউদ ৯৯-১০০ (দারুল মিশকাত) আয্যুহ্দ, ইবনে আবি আসেম ৫১ (৯২) আস্সম্ত ওয়া-হিফযুল লিসান, ইবনু আবিদ দুনিয়া ৩১৩ (৭৪৭) মাকারিমুল আখলাক, খারায়িতী ৩/১০০৫ (টীকাসহ) আলমুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক, খতীব বাগদাদী ২/৩০৪[২]

[হাদীস নয়-৯৫] ظُنُّوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا

মুমিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করবে।

---

[১] আবদুর রউফ মুনাভী রচিত কুনূযুল হাকায়েক গ্রন্থে (পৃ. ৮) এটি আত্তারীখুল কাবীর-এ আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আত্তারীখুল কাবীর-এ এটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী যুগের মুসলিম মনীষীদের অভিমত হল (এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত) বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কুনূযুল হাকায়েক-এ বেশ ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেছে। তাই শুধু কুনূযুল হাকায়েক-এর বরাতের উপর ভিত্তি করে এটি আত্তারীখুল কাবীর-এ আছে বলে দাবি করা মুশকিল। দেখুন, দিরাসাতুন হাদীসিয়্যাতুন মুকারানাহ, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা ২৮০-২৮১

[২] এখানে যে উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনো কোনোটির সনদ শাস্ত্রীয় বিচারে 'যয়ীফ', তবে সামষ্টিকভাবে কথাটি ওমর রা. থেকে প্রমাণিত বলেই মনে হয়।

এটি হাদীস নয়। নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো হাদীসগ্রন্থে এটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই এ শব্দ-বাক্যে কথাটি হাদীসে আছে এমন ধারণা পোষণ করা যাবে না। তবে কুরআন-সুন্নাহর একাধিক বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়টি স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ⑫

"হে মুমিনগণ, অনেকরকম ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা গোনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না। তোমাদের একে যেন অন্যের গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" –সূরা হুজুরাত ১২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন–

[সহীহ আছার] আল্লাহ মুমিনদের অপর মুমিন সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন–

نَهَى اللهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَّظُنَّ بِالْمُؤْمِنِ شَرًّا.

–তাফসীরে তবারী ২১/৩৭৪, তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম ১০/৩৩০৫, শুআবুল ঈমান ৫/৩১০ (৬৭৫৪) (আত্তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরূন, মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী ১/৫৩-৫৪)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلَا تَجَسَّسُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

[সহীহ হাদীস] "তোমরা (মন্দ) ধারণা থেকে দূরে থাকবে। কারণ ধারণা 'বড়' মিথ্যা। তোমরা পরস্পরে ছিদ্রান্বেষণ করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরকে এড়িয়ে চলবে না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই বনে যাও।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৪৩, ৬০৬৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৩

'ধারণা' সম্পর্কে শরীয়তের নীতিমালা জানতে পড়ুন, মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমের প্রবন্ধ 'ধারণা : কিছু নীতি, কিছু বিধান, কিছু উদাহরণ' মাসিক আলকাউসার, সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ঈ.

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-৯৬] اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'নামায মুমিনের মেরাজ।'

ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভের কারণে অনেকে কথাটিকে হাদীস মনে করেন, কিন্তু হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে এটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো সাহাবী বা তাবেঈর উক্তি হিসেবেও কথাটি আমরা পাইনি।

মেরাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সকল নবী-রাসূলের মধ্যে একমাত্র আমাদের নবীজীকেই আল্লাহ তাআলা এই সম্মানে ভূষিত করেছেন। মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তাআলা নবীজীকে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ অনেকগুলো বিষয় দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একান্তে কথা বলা।

একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, মুমিন যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে। মেরাজ রজনীতে প্রাপ্ত অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয়ে ('আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একান্তে কথা বলা') মেরাজের সঙ্গে নামাযের মিল আছে। তবে নবীজীর একান্তে কথা বলা আর নামাযে দাঁড়িয়ে বান্দার একান্তে কথা বলা এক নয়। একটি বাস্তবার্থে, অন্যটি কিছুটা রূপকার্থে। তাই এ বিষয়টিতে মেরাজের সঙ্গে নামাযের খানিকটা মিল থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ মিল বলা যায় না। কারণ (যেমনটি উল্লেখ করা হল) একটির ক্ষেত্রে যা বাস্তবিক অন্যটির ক্ষেত্রে তা রূপক। মেরাজের সঙ্গে নামাযের এই আংশিক মিলের কারণেই হয়তো কেউ 'নামায মুমিনের মেরাজ' বাক্যটি বলেছেন।

মেরাজ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য,[১] তাই 'নামায মুমিনের মেরাজ' বলে নামাযকে মেরাজের সঙ্গে তুলনা না করাই ভালো। তাছাড়া প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে অনেকে বাক্যটিকে হাদীস মনে করে বসে। তাই সতর্কতার দাবি হল, বাক্যটি না বলা। সর্বোপরি বাক্যটি বলে সাধারণত নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়,

---

(١) مُعْجِزَةٌ مِنْ مُعْجِزَاتِهٖ وَخَصِيْصَةٌ فَاضِلَةٌ مِنْ خَصَائِصِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নামাযে দাঁড়ালে মুমিন বান্দা আল্লাহর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারে– এই অভাবিত নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য হয়, সেটা যেহেতু সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবেই আছে, তাই সরাসরি সহীহ হাদীস বলেই নামাযের প্রতি আগ্রহান্বিত করা সম্ভব এবং সেটা করাই কর্তব্য। এ বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস নিচে উল্লেখ করা হল–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ...».

[সহীহ হাদীস] "আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।" –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৩

[হাদীস নয়-৯৭] مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ

যে অপরকে নিয়ে হাসাহাসি করে সে নিজেও হাসির পাত্র হয়।

এটি হাদীস নয়। একটি অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি। এক লোক এটি হাদীস হিসেবে উল্লেখ করলে মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রহ. তার উপর আপত্তি করে বলেন, 'এর সহীহ সূত্র উল্লেখ করা উচিত।' –মাজমূয়ায়ে রাসায়েলে শাহজাহানপুরী ৪৫১

সাবধানতা

কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও উক্তি এমন আছে, যা আমাদের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন ও উক্তি হিসেবেই প্রসিদ্ধ। সাধারণত এগুলোকে হাদীস মনে করা হয় না এবং বাস্তবে এগুলো হাদীস নয়ও। কিন্তু বেশি বেশি আলোচিত হওয়ার কারণে কেউ কেউ এগুলোকে হাদীস মনে করে বসে। এ ধরনের কিছু উক্তি বা প্রবাদ এখানে উল্লেখ করা হল। উদ্দেশ্য, না-জেনে কেউ এগুলোকে হাদীস মনে করে থাকলে তার ভুল ধারণা দূর করা :

১. حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَةٌ لِلْمُقَرَّبِيْنَ (নেককারদের জন্য যা ভালো কাজ, অনেক সময় তা-ই নৈকট্যশীলদের জন্য মন্দ কাজ বলে বিবেচিত হয়।)

২. كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ (সব কিছুই তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।)

৩. مَوْتُ الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَالَمِ (আলেমের মরণ যেন জগতের মরণ।)

৪. كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ (প্রত্যেক পাত্র থেকে তা-ই নিঃসরণ হয়, যা ওই পাত্রে থাকে।)

৫. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ (যা সবটা পাওয়া যায় না, তার সবটা ছাড়তেও হয় না।)

৬. مَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ بِئْرًا فَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ (অপরের জন্য ফাঁদ পাতলে নিজেই তাতে পড়তে হয়।)

বিবিধ

সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগৎ

[হাদীস নয়-৯৮] আঠারো হাজার মাখলুকাত

কথাটি ভিত্তিহীন। এ সম্পর্কে আমরা কোনো হাদীস খুঁজে পাইনি। তাফসীরে তাবারী (১/১৪৬-১৪৭) ও তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম (১/২৭)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবেঈ আবুল আলিয়া রহ. বলেছেন, 'জিন ও মানুষ ছাড়া আরও আঠারো হাজার কিংবা চৌদ্দ হাজার মাখলুক রয়েছে।' সম্ভবত এই উক্তিই 'আঠারো হাজার মাখলুক'-এর ধারণাটির উৎস। কিন্তু কথাটি দলিল-নির্ভর নয়। বাহ্যত, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতেই তিনি কথাটি বলেছেন। কিংবা হয়তো নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বোঝাতে নয়, আধিক্য বোঝাতে তিনি তা বলেছেন। যাই হোক কথাটি দলিল-নির্ভর-নয়। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তাঁর কথা খণ্ডন করে বলেন–

وَهٰذَا كَلَامٌ غَرِيْبٌ، يَحْتَاجُ مِثْلُهُ إِلٰى دَلِيْلٍ صَحِيْحٍ.

"এটি একটি আজব কথা। এর জন্য যথার্থ দলিলের প্রয়োজন।"

বাস্তবতা হল, এই মহাবিশ্বে আল্লাহ তাআলা কত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট করে তার সংখ্যা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।[১]

---

[১] وَفِي «الْمِشْكَاةِ» ص٤٧١-٤٧٢ مَعْزُوًّا إِلَى الْبَيْهَقِيِّ فِي «الشُّعَبِ» ٧/٢٢٤-٢٢٥: «خَلَقَ اللهُ أَلْفَ أُمَّةٍ: سِتَّ مِائَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فِي الْبَرِّ»، وَهٰذَا الْخَبَرُ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ بِالْوَضْعِ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «الْمَوْضُوْعَاتِ»، فَتَعَقَّبَهُ السُّيُوْطِيُّ فِي «اللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةِ» ١/٨١-٨٢، وَلَمْ يَكُنْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى مُصِيْبًا فِيْ تَعَقُّبِهِ هٰذَا، وَالْخَبَرُ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُنْكَرًا. يُنْظَرُ «شُعَبُ الْإِيْمَانِ» ٧/٢٢٤-٢٢٥، وَ«الْمَجْرُوْحِيْنَ» =

কালেমায়ে তাইয়েবা ও আরশ

[জাল বর্ণনা-৯৯] আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.এর প্রতি ওহী পাঠালেন, হযরত মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের যে ব্যক্তিই তার সময়কাল পাবে তাকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে আদেশ কর। কেননা মুহাম্মদ না হলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং জান্নাত ও দোযখও সৃষ্টি করতাম না। আমি আরশকে পানির পৃষ্ঠে সৃষ্টি করলাম। তা দুলতে লাগল। যখন তাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখে দিলাম তখন তা স্থির হল।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালানী এটি জাল বলে অভিমত দিয়েছেন। –তালখীসুল মুস্তাদ্‌রাক ২/৬৭২, মীযানুল ইতিদাল ৩/২৪৬, লিসানুল মীযান ৬/১৮৯

[হাদীস নয়-১০০] আমার জন্ম হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসক 'নওশেরওঁয়া'র যুগে

এটি হাদীস নয়। হাকেম নিশাপুরী, হুসাইন বিন হাসান হালিমী, ইমাম বাইহাকী, হাসান বিন মুহাম্মদ সাগানী, হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী রহ. প্রমুখ বাক্যটি হাদীস নয় বলে মত দিয়েছেন। –শুআবুল ঈমান ৪/৩০৫, আলমাকাসিদুল হাসানা ৭০৭, আদদুরারুল মুন্‌তাসিরা ১৮৬, আলমাসনূ ২০৪, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৪১৪, কাশফুল খাফা ৩০৮

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব

[জাল বর্ণনা-১০১] যখন হিসাব-কিতাবের পালা আসবে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের হিসাব আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, আমি চাই না অন্য কেউ আমার উম্মতের হিসাব নিক, আর তার সামনে তারা লজ্জিত হোক।

= ٢/٢٥٦–٢٥٧، وَ«الْمَوْضُوْعَاتُ» لِابْنِ الْجَوْزِيِّ ٣/١٥٢، وَ«الْكَامِلُ فِيْ ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ» ٧/٥٧–٥٨ (تَرْجَمَةُ عُبَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ الْقَيْسِيِّ) وَ٧/٤٨٦–٤٨٨ (تَرْجَمَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسٰى) وَ«مِيْزَانُ الْاِعْتِدَالِ» ٣/٢٤، ٣/٦٧٧، وَ«لِسَانُ الْمِيْزَانِ» ٧/٤٢٥–٤٢٧، وَ«الْفَوَائِدُ الْمَجْمُوْعَةُ» مَعَ التَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ ٢/٥٦٤.

তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন– প্রিয় রাসূল আমার, আপনি যদি তাদের হিসাব নিতে যান তাহলে তাদের পাপগুলো আপনার চোখে ধরা পড়বে। তখন তো তারা আপনার সামনে লজ্জিত হবে। অথচ আমি আপনার উম্মতকে আপনার সামনেও লজ্জিত করতে চাই না। আমিই তাদের হিসাব নেব এবং গোপনে নেব।

বর্ণনাটি জাল। এর সূত্রে মুহাম্মদ বিন আইয়ূব রাযী এবং অপর বর্ণনাসূত্রে আবু বকর নাক্কাশ নামে দুই 'রাবী' (বর্ণনাকারী) রয়েছে। এরা দু'জনই ছিল চরম মিথ্যাবাদী। তাই জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক কিনানী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী, আহমদ বিন সিদ্দীক গুমারী রহ. প্রমুখ বর্ণনাটি জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ২/৭০৮-৭০৯, তানযীহুশ শরীয়া ২/৩৯, তাযকিরাতুল মাওযূআত ২২৭, আলমুগীর ৫৫-৫৬

[হাদীস নয়-১০২] اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র

বাক্যটি হাদীস নয়। হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে এটি খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণত নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্য বাক্যটি বলা হয়। এর মর্ম হল, দুনিয়াতে যে যেমন আমল করবে আখেরাতে সে তেমন ফল ভোগ করবে। এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং একাধিক সহীহ হাদীসে এ বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু 'দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র' ঠিক এই শব্দ-বাক্যে কথাটি কুরআন হাদীসে নেই। ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী, হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী ও শামসুদ্দীন সাখাবী রহ.এর মতো হাদীস বিশারদ ইমামগণ বলেছেন, 'আমরা বর্ণনাটি খুঁজে পাইনি।' হাসান বিন মুহাম্মদ সাগানী রহ. জাল হাদীস সম্পর্কে লিখিত তাঁর কিতাব 'তাযকিরাতুল মাওযূআত'-এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। –রিসালাতুস সাগানী ৮, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া ৬/৩৫৬, আলমুগনী আন হামলিল আসফার ৪/২৭, আলমাকাসিদুল হাসানা ৩৬০; আরও দ্রষ্টব্য, আলআসরারুল মারফূআ ১২৩, আলমাসনূ ১০১, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৭৪

একটি মৌলিক আলোচনা

ভিত্তিহীন বর্ণনা দুই প্রকার :

১. বর্ণনার শব্দ-বাক্য ও অর্থ-মর্ম দুই-ই ভিত্তিহীন।

২. বর্ণনার শব্দ-বাক্য ভিত্তিহীন। কিন্তু অর্থ-মর্ম ভিন্ন কোনো শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এ ধরনের বর্ণনা সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ অনেক সময় বলে থাকেন–

لَا أَصْلَ لَهُ وَلٰكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ.

'বর্ণনাটির শব্দ-বাক্য ভিত্তিহীন, কিন্তু অর্থ ভিন্ন দলিল দ্বারা প্রমাণিত।'

এ কথা বলে তাঁরা বোঝান, শব্দ-বাক্য ভিত্তিহীন হওয়ার কারণে হাদীস হিসেবে তো তা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এর মানে এও নয় যে, এর অর্থ-মর্মও ভিত্তিহীন; বরং মর্ম ভিন্ন দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

অনেকে মনে করেন, তাঁদের কথার অর্থ হল শব্দ-বাক্য ভিত্তিহীন হলেও অর্থ যেহেতু প্রমাণিত তাই এই শব্দ-বাক্যেই কথাটি হাদীস হিসেবে বলা যাবে। এই অনুধাবন ভুল। ভিন্ন দলিল দ্বারা মর্ম প্রমাণিত হলেও জাল বা ভিত্তিহীন কোনো বর্ণনা সরাসরি হাদীস হিসেবে বর্ণনা করার অবকাশ নেই। প্রচলিত জাল হাদীস প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (বর্তমান নাম 'এসব হাদীস নয়') এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা দেখতে পারেন।

উল্লেখ্য, 'দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র' এই ভিত্তিহীন বর্ণনাটি দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত। সুতরাং একে সরাসরি হাদীস হিসেবে বর্ণনা করার সুযোগ নেই।

সৎ-কাজের আদেশ অসৎ-কাজের নিষেধ

[হাদীস নয়-১০৩] اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ

হক কথা না বলে যে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান

কথাটি হাদীস নয়। পঞ্চম শতকের একজন মুসলিম মনীষী হাসান বিন আলী আবু আলী দাক্কাক রহ.এর বাণী। তাঁর শাগরেদ ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী রহ. এবং তাঁর বরাতে ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এ কথাটি হাসান বিন আলী আবু আলী দাক্কাক রহ.এর উক্তি। আবদুর রউফ মুনাভী ও ইবনুল ইমাদ রহ.ও বলেছেন যে, এটি তাঁর বাণী।

দ্রষ্টব্য, আররিসালাতুল কুশাইরিয়া ১২০, আলআযকার ২৯৪, শরহু সহীহি মুসলিম ২/১৯-২০, শাযারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ ৩/১৮০

উল্লেখ্য, কুরআন সুন্নাহর একাধিক দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, হক পন্থায় হক কথা বলা ঈমানের দাবি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হক ও সত্য সাক্ষ্য গোপন করা গোনাহ। উপরিউক্ত বাণীটি হাদীস নয়–এ কথা বলে এসব স্বতঃসিদ্ধ বিষয়

অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এই যে, হক কথা না বলে যে চুপ থাকে তাকে 'বোবা শয়তান' বলাটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১০৪] এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার ছেলে খুব বেশি মিষ্টি খায়, আপনি ওকে কিছু বলে দিন। নবীজী উত্তরে বললেন, ওকে কিছু দিন পর নিয়ে আসুন। কিছুদিন পর তারা এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে এত বেশি মিষ্টি খেতে নিষেধ করেন। ছেলেটি নবীজীর কথা শুনে মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দেয়। লোকটি তখন নবীজীকে বলল, আপনি ওকে সেদিন কেন নিষেধ করলেন না? তিনি বললেন, আমার নিজেরও বেশি মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস ছিল। কোনো কিছুতে নিজে অভ্যস্ত থাকলে অন্যকে নিষেধ করা যায় না। এ কয়দিনে আমি মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করেছি।

নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো হাদীসগ্রন্থে এ বর্ণনাটি আমরা পাইনি।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা

[জাল বর্ণনা-১০৫] প্রত্যেকের একটি পেশা থাকে। আমার পেশা দু'টি– জিহাদ ও দারিদ্র্য। যে এ দুটোকে ভালোবেসেছে, সে যেন আমাকেই ভালোবেসেছে। আর যে এ দুটোকে ঘৃণা করেছে, সে যেন আমাকেই ঘৃণা করেছে।

বর্ণনাটি জাল। হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও ইবনে আররাক কিনানী রহ. এটি জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১/৪৮৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৮২

[ভিত্তিহীন বর্ণনা-১০৬] ক্ষুধার সাহায্যে বেহেশতের দরজায় করাঘাত করতে থাক।[১]

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী ও হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন, এর কোনো ভিত্তি তাঁরা খুঁজে পাননি। মোল্লা আলী কারী, ইসমাঈল আজলূনী, মুরতাযা যাবীদী রহ. ইরাকী রহ.এর কথা উল্লেখপূর্বক তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।
–তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা ৬/২৯৯, আলমুগনী আন হামলিল আস্ফার ১/৩৩৭, আলমাসনূ ১০০, আলআসরারুল মারফূআ ১২১, কাশফুল খাফা ১/৩৬৭, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৭/৩৯০

---

[১] ওয়াজে নিসওয়ান ২৮১ [আলএছহাক প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০১২ ঈ.]

[জাল বর্ণনা-১০৭] ফকিরি (দারিদ্র্য) আমার গৌরব। আমি এর দ্বারা গৌরব বোধ করি।

এটি একটি জাল বর্ণনা। হাসান বিন মুহাম্মদ সাগানী রহ. তাঁর লিখিত 'জাল হাদীস'-এর কিতাবে বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

هُوَ كَذِبٌ مَوْضُوْعٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ بَاطِلٌ.

"বর্ণনাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন কেউ রাসূলের হাদীস হিসেবে তা বর্ণনা করেনি। কথাটি সঠিকও নয়।"

পরবর্তী যুগের মনীষীদের অনেকেই উপরিউক্ত দুই মনীষীর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ইমাম সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন আনসারী, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী, মুহাম্মদ তাহের পাটনী ও আবুল মাহাসিন কাউক্জী রহ. প্রমুখ।

–রিসালাতুল মাওযূআত ৭, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১১/১১৭, ১৮/১২৩, আলবাদরুল মুনীর ৭/৩৭১, আত্তালখীসুল হাবীর ৫/২১৩০, আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৮০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৭৮, আললু'লুউল মারসূ ৫৫

দারিদ্র্য বা ধনাঢ্যতা কোনোটিই মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা যাকে যতটুকু ইচ্ছা ধন-সম্পদ দান করেন। তাই এ দু'টির কোনোটি নিয়েই গর্ব করা চলে না। বিশেষত দারিদ্র্য নিয়ে তো নয়ই। দারিদ্র্য কোনো আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ও নয়। একটি হাদীস থেকে বোঝা যায়, দারিদ্র্য থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাওয়া উচিত।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাইতেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ... أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٨٠٥٣) وَأَبُوْ دَاوُدَ (١٥٤٤) وَابْنُ حِبَّانَ (١٠٣٠)

[সহীহ হাদীস] "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাই।"

–মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮০৫৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৪৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১০৩০

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে সচ্ছলতা প্রার্থনা করতেন–

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى، وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنٰى».

[সহীহ হাদীস] "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, সচ্চরিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করি।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২১

অভাবের তাড়নায় অনেক সময় মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে যায়। আল্লাহর উপর ভরসা হারিয়ে ফেলে। অনেকে অবৈধ উপার্জনের পথ ধরে। তাই এই 'পরীক্ষা' থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্য কোনো মন্দ বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে দরিদ্রতা দান করেন আর সে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করে, তাহলে সে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হবে। একটি সহীহ হাদীসে তো এমনও এসেছে যে, দরিদ্র মুসলমান ধনাঢ্য মুসলমানের পাঁচ শ বছর আগে জান্নাতে যাবে।[১] তাই দরিদ্রতা যেমন গর্বের বস্তু নয়, তেমনি তা দোষেরও কিছু নয়। দরিদ্র হওয়ার আশা করা যেমন ঠিক না, তেমনি দরিদ্রতাকে ঘৃণা করাও উচিত না। মুমিনের কর্তব্য দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাওয়া। এরপর আল্লাহ তাকে যা দান করেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করা।

উলামায়ে কেরাম দেখতে পারেন, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ১১/১২২-১৩২

আরবদের মর্যাদা

[জাল বর্ণনা-১০৮] তিন কারণে আরবদের ভালোবাসবে– আমি আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী, জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

বাক্যটি হাদীস নয়। এর নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। অনেক হাদীস বিশারদ ইমাম বর্ণনাটি জাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

---

[১] জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৫৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৭৬

তৃতীয় শতকের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয আবু হাতেম রাযী রহ. বলেছেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ كَذِبٌ

অর্থাৎ এটি হাদীস নয়।

ইমাম আবু জাফর উকাইলী রহ. বলেছেন–

مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

'কথাটি আপত্তিকর, এর কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই।'

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. তাঁর রচিত জাল হাদীসের কিতাবে বাক্যটি উল্লেখ করেছেন এবং উকাইলী রহ.এর কথা উদ্ধৃত করে মৌন সমর্থন করেছেন।

হাফেযে হাদীস শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

هٰذَا مَوْضُوْعٌ.

'এটি জাল-বানোয়াট।'

–ইলালু ইবনে আবি হাতেম (১৬৪১) আযযুয়াফাউল কাবীর ৩/৩৪৮, আলমাওযূআত ২/২৯২, মীযানুল ইতিদাল ৩/১০৩, আরও দ্রষ্টব্য, তানযীহুশ শরীয়া ২/৩১, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ২/৫০৭-৫০৮, আলআহাদীসু ওয়াল-আছারুল ওয়ারিদাতু ফী ফাযলিল লুগাতিল আরাবিয়্যা ওয়া-যাম্মিল লাহ্‌ন, ড. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ২৮-৪৫

এ বিষয়ক সহীহ হাদীস

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ، قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟، فَقَالُوْا: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ. قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٥٣٢) وَقَالَ: «هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ». وَأَحْمَدُ (١٧٨٨) و(١٧٥١٧)

[সহীহ হাদীস] "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে (সমবেত লোকদের) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি বললেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর মুহাম্মদ। আল্লাহ তাআলা সমগ্র

সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার পর আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর তাদেরকে দু'ভাগে (আরব ও অনারব) ভাগ করে আমাকে উত্তম ভাগে (আরবে) রেখেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্রে পাঠিয়েছেন। এরপর সে-গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে প্রেরণ করেছেন।" –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৭৮৮, ১৭৫১৭, জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৩২

[حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ».

[সহীহ হাদীস] "হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আলাইহিস সালামের) বংশধর থেকে 'কিনানা'কে মনোনীত করেছেন। এরপর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে মনোনীত করেছেন এবং কুরাইশের বংশধর থেকে বনী হাশেমকে মনোনীত করেছেন আর বনী হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৭৬

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ১/৩৭৪-৪১১

আকিক পাথর

[জাল বর্ণনা-১০৯] تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ، فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ

তোমরা আকিক পাথরের আংটি পর। এতে অভাব দূর হবে।

বর্ণনাটি জাল। ইবনুল জাওযী, জুরকানী, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. প্রমুখ স্পষ্টবাক্যে এটিকে জাল বলেছেন।

–কিতাবুল মাওযূআত ৩/২৩৫, আলআবাতীল ওয়াল-মানাকীর ৩১৯, মীযানুল ইতিদাল ১/৫৩০, লিসানুল মীযান ৩/১৪২, আল্লাআলিল মাসনূআ ২/২৭৩, আলআজবিবাতুল মারযিয়া, সাখাবী ১/১০৯, আলমাকাসিদুল হাসানা ১৮৪, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/২৪৩

تَخَتَّمُوْا بِالْخَوَاتِيْمِ الْعَقِيْقِ، فَإِنَّهُ لَا يُصِيْبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَا دَامَ عَلَيْهِ.

[জাল বর্ণনা-১১০] আকিক পাথরের আংটি ব্যবহার কর। এ আংটি হাতে থাকলে কেউ পেরেশান হবে না।

এ বর্ণনাটিও জাল। এর সনদে (বর্ণনাসূত্রে) দাউদ বিন সুলাইমান নামক এক মিথ্যাবাদী রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। –আলআজবিবাতুল মারযিয়া ১/১১০ (টীকাসহ)

আকিক পাথর সম্পর্কে আরও অনেক কথা প্রচলিত আছে। তার কোনোটিই প্রমাণিত নয়। হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেন–

لَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ.

'আকিক পাথর সম্পর্কে যত রেওয়ায়েত আছে সবগুলোই অনির্ভরযোগ্য।'

ইমাম আবু জাফর উকাইলী রহ. বলেছেন–

وَلَا يَثْبُتُ فِيْ هٰذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ.

'আকিক পাথর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কিছু প্রমাণিত নেই।'

অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে রজব রহ. আবু জাফর উকাইলী রহ.এর কথা সমর্থন করেছেন এবং নিজেও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য, আযযুআফাউল কাবীর, উকাইলী ৪/৪৪৯, আলমাকাসিদুল হাসানা ১৮৪, আলআজবিবাতুল মারযিয়া ১/১০৮, মাজমূউ রাসায়েল, হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী ৩/৩৭৭-৩৭৯, ফয়যুল কাদীর ৩/২৩৬

আকিক পাথরের আংটি ব্যবহারে শারীরিক-মানসিক, পার্থিব-অপার্থিব কোনো কল্যাণ বা উপকারিতার কথা হাদীসে নেই। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচারে আকিক পাথর ব্যবহারে কোনো উপকারিতার কথা প্রমাণিত হলে তা ভিন্ন ব্যাপার।

জাল পুস্তিকা

জাল পুস্তিকা ও জাল গ্রন্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন পুস্তিকা বা গ্রন্থ যা সম্পর্কে দাবি করা হয় যে, এটি অমুক মনীষী কর্তৃক রচিত, কিন্তু বাস্তবে তা সেই মনীষী কর্তৃক রচিত নয়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, জালিয়াতি করে সেই মনীষীর নামে তা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও এমনও হয়, এ নামে সেই মনীষীর একটি গ্রন্থ আছে ঠিক, কিন্তু সেই গ্রন্থ বাদ দিয়ে অন্য একটি গ্রন্থ নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে সেই মনীষীর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়।

জাল টাকার নোট, জাল সই-সাবুদ, জাল সনদ ইত্যাদির সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু হাদীসও যে জাল করা হতে পারে বা গোটা একটি পুস্তিকা ও গ্রন্থও যে জাল করা সম্ভব– এমন ধারণা আমাদের নেই। অনেকেই তাই 'জাল হাদীস' বা 'জাল পুস্তিকা' শুনলে চমকে উঠেন। 'জাল পুস্তিকা' অনেকটা জাল সইয়ের মতো। যার সই জাল করা হয়েছে সে নিজেও জানে না তার সই জাল হয়েছে। তেমনি যে মনীষীর নামে একটি জাল-পুস্তিকা ছাপানো হয় তার ভাবনায়ও থাকে না যে, তার নামে এক সময় একটি পুস্তিকা জাল করা হবে বা জাল করা হয়েছে।

কিছু অসতর্ক প্রকাশকের কারণে আরবী ও উর্দুতে এ রকম কিছু জাল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। (আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন!) আরবী ও উর্দুতে থাকায় এতদিন পর্যন্ত এগুলো সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু এখন কিছু কিছু জাল গ্রন্থ বা জাল পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ হওয়া শুরু হয়েছে। কতক অসতর্ক লোকের বদৌলতে আরবী-উর্দু জাল গ্রন্থগুলোর কোনো কোনোটি থেকে অনির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত বাঙালি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাই এ জাল গ্রন্থ বা পুস্তিকাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অধ্যায়ে এমন দু'টি পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

জাল পুস্তিকা-১

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত

২০০০ ঈ. সনে (পরবর্তী সময়ে ২০০৩ ঈ.-এ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকাটিতে দু'টি অসিয়তনামা উল্লেখ করা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যে, একটি অসিয়তনামা আলী রা.এর প্রতি কৃত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত। অন্যটি আবু হুরায়রা রা.এর প্রতি কৃত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত। এই দুই পুস্তিকা যথাক্রমে 'অসিয়্যতুন নবী লি-আলী ইবনে আবী তালেব' ও 'অসিয়্যতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি-আবী হুরায়রা' নামে দু'টি আরবী পুস্তিকার অনুবাদ। এ কথা উল্লেখ করার পর এ দাবিও করা হয়েছে যে, এ দুই পুস্তিকা প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কর্তৃক রচিত।

বাস্তবতা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রা. বা আলী রা.কে বিশেষভাবে কোনো অসিয়তনামা দিয়ে যাননি এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.এরও এ নামে কোনো পুস্তিকা নেই। তাহলে এ অসিয়তনামা এল কোত্থেকে? কীভাবে দু'টি 'জাল পুস্তিকা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়তনামা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে গেল? একটি প্রশ্নের উত্তরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছিলেন উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র মাসিক আলকাউসার (অক্টোবর '০৮ ঈ.)-এ লেখাটি প্রকাশিত হয়। কিছুটা পরিমার্জিতরূপে লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত' শীর্ষক পুস্তিকা : একটি প্রশ্নোত্তর

–মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রশ্ন : জনাব, কিছুদিন আগে আমি একটি পুস্তিকা পেয়েছি, যার নাম 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত।' প্রথম পৃষ্ঠায় আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান সুয়ূতী রহ.কে এর সংকলক বলা হয়েছে। পুস্তিকাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০ঈ.

এবং দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩ ঈ.। আমার কাছে দ্বিতীয় এডিশনের একটি কপি রয়েছে।

পুস্তিকাটির দু'টি অংশ : ১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা.এর উদ্দেশে।

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত হযরত আবু হুরায়রা রা.এর উদ্দেশে।

অনুবাদকের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ পুস্তকের 'মাখতূতা' (পাণ্ডুলিপি) মাকতাবাতুল হারামিল মক্কিয়িশ শরীফ মক্কা মুকাররমায় সংরক্ষিত আছে।

আমার প্রশ্ন এই যে, বাস্তবিকই এই অসিয়ত কি সুয়ূতী রহ. কর্তৃক সংকলিত? সুয়ূতী রহ. এই অসিয়ত কোথায় পেয়েছেন? এর শুরুতে বা শেষে কোনো সনদও পাইনি। তাছাড়া উভয় অসিয়তের মধ্যে যেমন ভালো কিছু কথা আছে, তেমনি কিছু কথা মুনকার ও আপত্তিকরও মনে হয়েছে। তাই সন্দেহ জাগছে, সম্ভবত অসিয়তটি উপরোক্ত দুই সাহাবীর নামে তৈরি করা হয়েছে। আশা করি, প্রকৃত বিষয়টি অনুসন্ধান করবেন এবং আমাদেরকে অবহিত করবেন।

আবু লুবাবা
চাঁদপুর
২০ এপ্রিল, ২০০৫ ঈ.

উত্তর : আপনার আগেও একজন এ পুস্তিকার ফটোকপি আমাকে দিয়েছিলেন এবং তিনিও একই প্রশ্ন করেছিলেন। 'উসূলে হাদীস' (হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা) এবং 'জায়েযায়ে মাখতূতাত' (পাণ্ডুলিপি-সমালোচনা)-এর নীতিমালার আলোকে সে সময়ই উত্তর দেওয়া যেত, কিন্তু আমি পুরো বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হওয়ার জন্য 'মাকতাবুল হারামিল মক্কী'তে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি সরাসরি দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। এজন্য উত্তর লিখতে দেরি হয়েছে। এখন আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিয়েছেন, মাকতাবাতুল হারামিল মক্কী, যা আযীযিয়াতে জামেয়া উম্মুল কুরার কাছে মুস্তাশ্ফাত তিউনিসীর উল্টো দিকে অবস্থিত, তাতে এই পাণ্ডুলিপি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একথা জেনে নেওয়া উচিত, এই দুই অসিয়তনামার কোনোটিই আবুল ফযল (জালালুদ্দীন) সুয়ূতী রহ.এর সংকলন বলে প্রমাণিত নয়। একে তাঁর সংকলন বলে দাবি করা পরিষ্কার ভুল। না

আলী রা. বা আবু হুরায়রা রা. এই অসিয়তনামা বর্ণনা করেছেন আর না রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এটা দান করেছেন। এটা সাহাবা-যুগের অনেক পরের বস্তু। কোনো মিথ্যুক বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু ভালো ভালো কথা সংগ্রহ করে, কিছু কথা সহীহ হাদীস থেকে চয়ন করে, আর কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা কিচ্ছা-কাহিনীকারদের থেকে নিয়ে কিংবা নিজে বানিয়ে একটা বিশেষ বিন্যাসে সংকলন করেছে। এরপর একে 'অসিয়্যতুন নবী লি-আলী ইবনে আবী তালেব' নামে চালিয়ে দিয়েছে। আরেক মিথ্যুক বা একই লোক এ রকম আরেক পুস্তিকা তৈরি করে 'অসিয়্যতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি-আবী হুরায়রা' নামে প্রচার করেছে।

এজন্য এই পুস্তিকার প্রচার-প্রসার এবং একে রাসূলের হাদীস বা নবীজীর অসিয়ত হিসেবে বর্ণনা করা হারাম। এ পুস্তিকায় বিদ্যমান আছে বলে কোনো কথাকে হাদীস মনে করা যাবে না, বরং আহলে ইলমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে যে, কথাটা কোনো সহীহ হাদীসে আছে কি না কিংবা কোনো শরয়ী দলিলের দ্বারা প্রমাণিত কি না।

পুস্তিকাটি জাল কেন?

এই পুস্তিকা জাল কেন– এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনা করতে গেলে অনেক কথা বলা যায় এবং অনেক দলিল পেশ করা যায়। সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতার স্বার্থে আপাতত কয়েকটি মৌলিক কথা পেশ করছি :

১. কোনো মাখতূতা (পাণ্ডুলিপি) অমুকের রচিত–এই দাবি করার জন্য যে শর্তগুলো অপরিহার্য তা এখানে অনুপস্থিত। যথা– পাণ্ডুলিপির লিপিকর 'ছিকা' (নির্ভরযোগ্য) হওয়া, পূর্ববর্তী কোন্ কপি থেকে এই কপি তৈরি হয়েছে তা জানা থাকা এবং সেই আদর্শ কপিটি নির্ভরযোগ্য হওয়া। স্বাক্ষরিক পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ রচয়িতার নিজ পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত এ কপির অবিচ্ছিন্ন সূত্র বিদ্যমান থাকা। প্রতিলিপি তৈরির পর আদর্শ কপির সঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে 'মুকাবালা' করা। এ শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। আরেকটি পদ্ধতি হল রচনাটি উক্ত রচয়িতার বলে তাওয়াতুরের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া কিংবা অন্তত আহলে ইলমের মধ্যে বিষয়টা স্বীকৃত হওয়া।

উপরিউক্ত মাখতূতায় (পাণ্ডুলিপিতে) এই শর্তগুলোর সবগুলোই অনুপস্থিত। লিপিকর ছিকা হওয়া তো দূরের কথা, তারাজিম ও তবাকাত বিষয়ক

গ্রন্থাদিতে তার কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। তবে পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা (colophon) থেকে অনুমিত হয় যে, সে একজন অনারব ব্যক্তি এবং আরবী ভাষার সঙ্গেও তার কোনোরূপ যোগসূত্র নেই। যেমন প্রথম অসিয়তের পুষ্পিকায় লেখা রয়েছে–

تَمَّتِ الْوَصِيَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ إِلَى حَضْرَتْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، عَلَى يَدِ شَيْخِ اَلْحَاجِّ مُحَمَّدٍ بَشْكَطَاش المَوْلَوِيِّ فِيْ أَوَاخِرِ شَهْرِ مُحَرَّمِ الْحَرَامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ وَمِئَةٍ وَأَلْفٍ.

আহলে ইলম বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন, এ বাক্যগুলোতে আরবী ভাষার উপর কীরূপ অত্যাচার করা হয়েছে। এখান থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, পাণ্ডুলিপিটির লিপিকাল হল ১১৩৫ হি., অথচ ফাউন্ডেশনের অনুবাদের ভূমিকায় লিপিকাল ১০৩৫ হিজরী বলে দাবি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অসিয়তের পুষ্পিকায় লেখা হয়েছে–

...سَلَخَ شَهْر مُحَرَّم الْحَرَام سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلْثِيْنَ وَمِئَةٍ وَأَلْفٍ، عَلَى يَدِ الْحَقِيْرِ الْفَقِيْرِ الْحَاجِّ شَيْخ مُحَمَّد الْمَوْلَوِيِّ ابْنِ عَلِيِّ الشَّيْخِ، فِيْ زَاوِيَةِ الْمَوْلَوِيَّةِ بِبَشْكَطَاشَ، غُفِرَ لَهُمَا وَعُفِيَ عَنْهُمَا.

দুটো উদ্ধৃতিই হুবহু পেশ করা হয়েছে। ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতিগুলোকে পাঠক যেন মুদ্রণের ভুল মনে না করেন।

এগুলো ছাড়াও পাণ্ডুলিপির শুরু বা শেষে কোথাও আদর্শ পাণ্ডুলিপির (Exemplar) নাম-পরিচয় নেই, স্বাক্ষরিক পাণ্ডুলিপি (Autograph) বা লেখকের কপি পর্যন্ত এ কপির সূত্র বিদ্যমান থাকার তো প্রশ্নই আসে না।

তাছাড়া পাণ্ডুলিপির কোথাও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.এর দিকে নিসবতের উল্লেখ নেই। শুধু এক কোণায় 'রিসালায়ে ইমাম সুয়ূতী' শব্দটি লিখিত আছে। কিন্তু এ শব্দ কার লেখা তা অজ্ঞাত। আলামত থেকে অনুমিত হয় যে, এটি কোনো সাধারণ পাঠকের প্রক্ষেপ বা সংযুক্তি। মোটকথা, এ বাক্যটি কার লেখা তা অজানা।

তাছাড়া উপরোক্ত বাক্যের অর্থ যদি এই হয় যে, অসিয়তটি সুয়ূতীর 'রিসালা', তাহলে এর মাধ্যমে লেখকের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। কেননা, এই অসিয়ত সুয়ূতী রহ.এর বর্ণনা হলে একে 'জুয' বলা হত, 'রিসালা' নয়। এরপর কীসের ভিত্তিতে একে সুয়ূতীর 'রিসালা' বলা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বক্তার নাম-পরিচয় অজানা, মন্তব্য অজ্ঞতাপূর্ণ এবং দাবি দলিলবিহীন। এভাবে কি কোনো পাণ্ডুলিপির রচয়িতার বা সংকলকের পরিচয় প্রমাণিত হয়?

এরপর 'তাওয়াতুর' ও 'তালাক্কি বিল-কবুল'-এর যে পন্থা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে সে পন্থায় উপরোক্ত দাবি প্রমাণিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না; বরং এর বিপরীতে আহলে ইলমের মাঝে এ বিষয়টিই স্বীকৃত যে, এই অসিয়তনামা সুয়ূতীর সংকলন হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুয়ূতী রহ. তাঁর রচনাবলির তালিকা নিজেই প্রস্তুত করে গেছেন এবং বিশেষজ্ঞরাও তা করেছেন। কোনো তালিকাতেই এই অসিয়তনামার উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, বরং খোদ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর রচিত 'আল-লাআলিল মাসনূআ ফিল আহাদীসিল মাওযূআ' গ্রন্থে (যা তিনি জাল বর্ণনাসমূহের স্বরূপ আলোচনার জন্য লিখেছেন) এই দুই অসিয়ত মওযূ ও জাল হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী 'আল-লাআলিল মাসনূআ' (খ. ২, পৃ. ৩৭৪, কিতাবুল মাওয়ায়িয ওয়াল-ওছায়া)-তে প্রথম অসিয়তনামার প্রথম দিকের বাক্যগুলো উল্লেখ করেছেন, যেখানে মুমিন, তাকাল্লুফকারী, রিয়াকার, জালেম, মুনাফিক ও অলস প্রভৃতি লোকদের তিনটি করে বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, এরপর অসিয়তনামার অন্যান্য বিষয়ের কিছু বাক্য উল্লেখ করে বলেন–

مَوْضُوْعٌ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ كَذَّابٌ وَضَّاعٌ.

অর্থাৎ এই অসিয়তনামা মওযূ। এ সম্পর্কে অভিযুক্ত হচ্ছে হাম্মাদ ইবনে আমর, যে একজন মিথ্যুক ও জাল বর্ণনা প্রস্তুতকারী।

এ প্রসঙ্গে সুয়ূতী রহ. ইমাম বাইহাকী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তিনিও এই অসিয়তনামাকে মওযূ বলেছেন।

৩. ইমাম বাইহাকী রহ.এর মন্তব্য তাঁর কিতাব 'দালায়েলুল নুবুওয়াহ'তে (৭/২২৯) রয়েছে। মূল আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

...عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِيْبِيِّ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ أَوْصَيْتُكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا، فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَاحَفِظْتَ وَصِيَّتِيْ يَا عَلِيُّ، يَا عَلِيُّ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: اَلصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ

وَالزَّكَاةُ، فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا فِي الرَّغَائِبِ وَالْآدَابِ، وَهُوَ حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ، وَقَدْ شَرَطْتُ فِيْ أَوَّلِ الْكِتَابِ أَلَّا أُخْرِجَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ حَدِيْثًا أَعْلَمُهُ مَوْضُوْعًا.

...يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو مِمَّنْ يَكْذِبُ وَيَضَعُ الْحَدِيْثَ...

বাইহাকী রহ.-এর উপরোক্ত মন্তব্যের সারকথা এই যে, এই অসিয়তনামায় যদিও আদাব ও ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে, তবু তা মওযূ। এর সনদে হাম্মাদ ইবনে আমর আননাসীবী নামক একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, সে হাদীসের নামে মিথ্যা কথাবার্তা তৈরি করে বর্ণনা করত। –দালায়েলুন নুবুওয়াহ ৭/২২৯

অসিয়তের অনুবাদের শুরুতে সনদের দু'একটি নাম উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপির ভুল সম্পর্কে অনুবাদক অবগত না থাকায় সেখানে 'খালেদ ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ' লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা হবে 'ছারী ইবনে খালেদ আন জাফর ইবনে মুহাম্মাদ'। প্রশ্ন এই যে, ছারী ইবনে খালেদ যে এটা বর্ণনা করেছেন– এই তথ্য কোথায় পাওয়া গেল? এই তথ্যটা দিচ্ছে হাম্মাদ ইবনে আমর, যার সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে একজন মিথ্যুক ও জাল বর্ণনা প্রস্তুতকারী।

মোটকথা, বাইহাকী রহ. ও সুয়ূতী রহ. যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সকল হাদীস বিশারদের সিদ্ধান্তও তাই।

বিস্তারিত জানতে দেখুন, আলমাসনূ ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওযূ', মোল্লা আলী কারী ২৩৪-২৩৭, তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ, ইবনে আররাক ২/৩৩৯, আলমাওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/৩৬২, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ, শাওকানী ৪২৪

৪. এ আলোচনাগুলো ছিল প্রথম অসিয়তনামা সম্পর্কে। দ্বিতীয় অসিয়তনামা সম্পর্কেও হাদীস বিশারদগণের সিদ্ধান্ত অভিন্ন। মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.) কিতাবুল মাওযূআত (২/৩৬৪-৩৬৫)-এ এই অসিয়তনামার কিছু বাক্য উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, "বর্ণনাকারী পুরো অসিয়ত বর্ণনা করেছে। এটি একটি দীর্ঘ বর্ণনা, যা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সনদে একাধিক 'মাজহূল' রাবী রয়েছে, যাদের কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায় না। এটি কোনো জাহেল কাহিনীকারের প্রস্তুতকৃত বর্ণনা। সনদ তৈরিতেও সে আশ্চর্য জগাখিচুরি পাকিয়েছে। সনদে পরিচিত রাবী হাম্মাদ ইবনে আমর। তবে সে হল ওই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. বলেছেন, 'এ লোক মিথ্যা বলত এবং মিথ্যা

হাদীস তৈরি করত।' ইবনে হিব্বান বলেছেন, 'ছিকা রাবীদের নামে সে মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করতে থাকত।''

সুয়ূতী রহ.ও একে মওযূ বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থ 'আললাআলিল মাসনূআ' (২/৩৭৭-৩৭৮)-এ উল্লেখ করেছেন এবং সংক্ষেপে ইবনুল জাওযীর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে তা বহাল রেখেছেন। আরও দেখুন, আলমাসনূ ফিল হাদীসিল মাওযূ ২/২০৯-২১১ (টীকা) 'তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ ২/৩৪০

মোটকথা, যখন খোদ আবুল ফযল সুয়ূতী রহ এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ উভয় অসিয়তনামাকে মওযূ বলছেন তখন কীভাবে সম্ভব যে, সুয়ূতী নিজেই তা নবীজীর অসিয়তনামা হিসেবে সংকলন করবেন এবং তা মানুষের সামনে পেশ করবেন?

৫. অনুবাদক অসিয়তনামার দ্বিতীয় অংশের শুরুতেও সনদের একটি অংশ উল্লেখ করেছেন। এটা দেখে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক হবে না। কেননা ওই সনদটিও জাল ও প্রস্তুতকৃত। এ প্রসঙ্গে হাদীসবিশারদদের মন্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পাণ্ডুলিপির ত্রুটির কারণে অনুবাদক সনদের নামগুলো সঠিকভাবে পড়তে পারেননি। যেমন একটি নাম লেখা হয়েছে 'হাম্মাদ ইবনে আতিয়্যা' অথচ প্রকৃত পাঠ 'হাম্মাদ ইবনে আমর।' ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সে একজন মিথ্যুক রাবী। আরেকজনের নাম এভাবে লেখা হয়েছে– 'সালামা ইবনে মীম মাকান শামী থেকে।' প্রকৃত কথাটা হবে– 'মাসলামা ইবনে আমর মাকহূল শামী থেকে।' দেখুন, কিতাবুল মাওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/৩৬৪, আললাআলিল মাসনূআ /৩৭৭

৬. প্রথম অসিয়তনামার অনুবাদে শেষের কয়েকটি বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই বাক্যগুলো অনুবাদ করা হয়নি। সেগুলো অনুবাদ করা হলে অসিয়তনামাটি জাল হওয়ার প্রসঙ্গ আরও পরিষ্কার হয়ে যেত। আহা! অনুবাদক যদি অন্তত ওই কথাগুলো থেকে, যেগুলো অনুবাদ করাও তিনি সমীচীন মনে করেননি, উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন যে, এটি নবীজীর অসিয়তনামা নয়, বরং পরের যুগের বানানো বস্তু!!

এখানে কারও এই প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় যে, এই দুই অসিয়তনামা যদি আগাগোড়া মওযূ ও জালই হয়ে থাকে তবে এর পাণ্ডুলিপি কেন সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে, উপরন্তু 'মাকতাবাতুল হারামিল মক্কী'র মতো কুতুবখানায়? কেননা, এটা খুব সহজ কথা যে, কোনো কুতুবখানায় কোনো পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত কিতাব সংরক্ষণ করার অর্থ এই হয় না যে, কিতাবটি বিশুদ্ধ বা সেই

কিতাবের সকল তথ্য নির্ভরযোগ্য। কুতুবখানায় জাদুঘরের মতো সব ধরনের বস্তুই সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত বস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে, যার আলোকে বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এ জন্য কুতুবখানায় জাল পুস্তিকাও থাকে, মুলহিদ ও বেদ্বীন লোকদের ইসলাম বিরোধী বইপত্রও সংরক্ষিত থাকে। জাল বর্ণনাসমূহের কোনো সংকলন যদি কেউ জেনে বা না জেনে তৈরি করে এবং তার কপি কোনো কুতুবখানার দায়িত্বশীলদের হস্তগত হয়, তবে অবশ্যই তারা তা সংরক্ষণ করবেন। এটা এজন্য নয় যে, প্রাপ্ত বস্তুটি তাদের দৃষ্টিতে একটি প্রমাণিত বস্তু বা এর তথ্যাবলি নির্ভরযোগ্য; বরং এজন্য যে, জালকারীর কর্মের দলিল হিসেবে এবং একে সহীহ মনে করে যারা এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করে তাদের মূর্খতার দলিল হিসেবে তা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব কোনো সাদাসিধে লোক যদি কোনো গ্রন্থশালায় এরূপ কোনো পাণ্ডুলিপি পেয়ে যায় এবং আগপিছ বিচার না করেই একে সহীহ মনে করে প্রকাশ করে, তবে এর দায় গ্রন্থশালার দায়িত্বশীলদের উপর বর্তায় না।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও কিছু মূর্খ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রকাশক প্রথম অসিয়তনামা আরবী ভাষায় প্রকাশ করেছে। আরবের মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করে লেখেন– (অনুবাদ) "সাইয়েদুনা আলী রা.এর সঙ্গে সম্বন্ধকৃত এই অসিয়তনামা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ, ... একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে এবং এখনও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। অসচেতন ও উদাসীন প্রকৃতির লোকেরা এটা সংগ্রহ করে থাকে। যে মিথ্যুক এটা প্রস্তুত করেছে সে পাপী, অভিশপ্ত! এর প্রকাশক পাপী, অভিশপ্ত! এর বিক্রেতা পাপী, অভিশপ্ত এবং একে যে সত্য মনে করে সেও পাপী, অভিশপ্ত! আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির মন্দ করুন, যে নিজের দ্বীন-ধর্ম ও বিচার-বুদ্ধির ব্যাপারে বোধহীন!" –আলমাসনূ ২৩৫ (টীকা)

একটি জরুরি সতর্কীকরণ

এই অসিয়তনামাকে 'মওযূ' বলার অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের কোনো অসিয়তনামা মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.কে বা হযরত আবু হুরায়রা রা.কে কিংবা অন্য কোনো সাহাবীকে প্রদান করেননি। আর না ওই দুই সাহাবী বা অন্য কোনো সাহাবী

বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শোনা নসীহতগুলো একত্রে সংকলন করেছেন। কোনোটাই হয়নি। এটা খায়রুল কুরূনের অনেক পরে কোনো মিথ্যুকের রচনার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তবে এই মিথ্যুক রচনাকার যেহেতু অনেক কথা সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করেছে এবং জ্ঞানী লোকদের কিছু জ্ঞানগর্ভ উক্তিও তাতে সংযুক্ত করেছে, তাই উভয় অসিয়তনামাতেই কিছু সঠিক কথা পাওয়া যাবে। কিছু জ্ঞানগর্ভ বাক্যমালা, যা সাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও শরীয়তের সাধারণ নীতিমালার আলোকে সঠিক, আর কিছু বিষয়, যা সরাসরি হাদীস শরীফে এসেছে। যেমন প্রথম অসিয়তনামার প্রথম বাক্যটি সহীহ হাদীসে আছে এবং ইমাম মুসলিম রহ. তা 'কিতাবুস সহীহ'তে বর্ণনা করেছেন। আরবী পাঠ এই–

أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

অর্থাৎ হারূন মূসার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তুমিও আমার পক্ষ থেকে তেমন দায়িত্ব লাভ করছ, তবে আমার পরে কোনো নবী নেই। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪০৪

এটি হচ্ছে অনেক প্রতারকের ব্যবহৃত একটি পুরনো কৌশল। তারা যখন কোনো 'জুয' প্রস্তুত করে তখন যেমন বিভিন্ন ভিত্তিহীন বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করে কিংবা নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথাবার্তা উদ্ধৃত করে, তেমনি জ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা কিংবা সহীহ হাদীস থেকেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে সেখানে সংযুক্ত করে। আলোচিত দুই অসিয়তনামার প্রস্তুতকারী মিথ্যুকরাও এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

পাঠকবৃন্দের করণীয় এই যে, তারা এই অসিয়তনামা পাঠ করা থেকে বিরত থাকবেন এবং কারও কাছে এর কোনো কপি থাকলে তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করবেন না। তবে উক্ত অসিয়তনামার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কথাকেই নির্দ্বিধায় ভুল বা ভিত্তিহীন বলে দেওয়াও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে করণীয় হল, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, এ বিষয়ে আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আপাতত এ কয়েকটি কথা পেশ করেই আলোচনা সমাপ্ত করছি। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং মাকবুলিয়াত দান করুন।

৯.৯.১৪২৯ হিজরী
১০.৯.২০০৮ ঈসায়ী

জাল পুস্তিকা-২

মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার

১২৭০ হিজরীতে এই জাল পুস্তিকাটি 'মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার' (مُنَبِّهَاتُ ابْنِ حَجَرٍ) নামে হিন্দুস্তানের মাতবায়ে মুস্তাফাই থেকে (আমাদের জানামতে) প্রথম প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পর এই নামেই প্রকাশিত হয় ইস্তাম্বুল থেকে। পরবর্তী সময়ে সেই একই পুস্তিকা 'আলইস্তিদাদ লি-য়াওমিল মাআদ' (اَلْإِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الْمَعَادِ) নামে প্রকাশিত হয় আরবের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে। এই ছাপাগুলোতে কিতাবের উপরে লেখক হিসেবে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে ভ্রম হয়, এটি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. কর্তৃক রচিত। এ থেকে অনেকেই বিভ্রান্ত হন। বিভিন্ন গ্রন্থে এর বরাতে তথ্যও উল্লেখ করা হতে থাকে। আমাদের জানা মতে ১৪১৫ হিজরীতে প্রথম বইটি বাংলাভাষায় অনূদিত হয়। বাংলায় নাম ছিল 'মোনাব্বেহাত'। পরবর্তী সময়ে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে এ বইটির অনুবাদ বের হয়। ২০১১-এর জানুয়ারিতে 'শেষ দিবসের প্রস্তুতি ও পরকাল ভাবনা' নামে, ২০১৪-এর নভেম্বরে 'সুন্দর জীবন'[১] নামে এবং ২০১৪-এর ডিসেম্বরে 'আলমুনাব্বিহাত'[২] নামে এই একই বইয়ের অনুবাদ বের হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে। এতে বোঝা যায়, অনেকেই এ পুস্তিকাটি ইবনে হাজার রহ. কর্তৃক রচিত মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং বাঙালি পাঠকের উপকার হবে ভেবে সরল মনে একটি জাল পুস্তিকার অনুবাদ ছেপে ফেলছেন।

আলোচিত পুস্তিকা ও হাফেয ইবনে হাজার রহ.

একটি রচনা অমুক লেখক কর্তৃক রচিত– এটি বলার জন্য কিছু শর্তের উপস্থিতি অপরিহার্য। উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

---

[১] এ লেখার কিছুদিন পর দেখতে পেলাম, এ নামেই এ বইটি ২০০২ ঈ.এর আগস্টে অন্য একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়েছিল। সে অনুবাদই এখন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছে।

[২] এ নামে যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুবাদটি বের হয়, তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে জানানোর পর তারা এর বিক্রয় বন্ধ করে দেন। আল্লাহ তাআলা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

দামাত বারাকাতুহুমের উপরোক্ত লেখায় (জাল পুস্তিকা-১) সেগুলোর আলোচনা এসেছে। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে যে, এই পুস্তিকায় সেই শর্তগুলো পাওয়া যায়নি; বরং পুস্তিকার মূল পাঠে এমন কিছু বিষয় আছে যা দ্বারা বোঝা যায়, এটি কিছুতেই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. কর্তৃক রচিত হতে পারে না।

এক. 'তালাক্কি বিল-কবুল' বা আহলে ইলমের মাঝে স্বীকৃত হওয়ার যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা একটি স্বভাবজাত বিষয়। একজন বিখ্যাত লেখকের রচনাবলি সম্পর্কে পরবর্তী যুগের সচেতন মুসলিম মনীষীগণ সম্যক অবহিত থাকেন। বিশেষ করে সেই লেখকের ভক্ত পাঠক ও বিশিষ্ট শাগরেদগণ তার রচনাবলি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান থাকেন। এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম ঘটবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর বিশিষ্ট শাগরেদ বিখ্যাত মুসলিম মনীষী হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. (৯০২হি.) তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম 'আলজাওয়াহের ওয়াদ-দুরার ফী তরজমাতি শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার'।

তিন খণ্ডের বৃহৎ কলেবরের (সূচিপত্রসহ ১৪০৪ পৃ.) এ গ্রন্থটিতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর জীবনের প্রায় সব দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এ গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর রচনাবলি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন (৬৫৯-৭৪৫)। প্রায় ৮৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ আলোচনায় তিনি মোট ২৭৩টি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং রচনাগুলো সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রদান করেছেন। কোন্ রচনা কতটুকু লিখেছেন, কো্নটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন, কোন্টি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, কোন্টি মুসাবিদা আকারে আছে, কোন্টির কিছু অংশ লিখে আর লেখেননি প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা আছে গ্রন্থটিতে। এমনকি তাঁর লেখা চিঠিপত্র এবং যেসব কিতাবের শুরুতে তিনি 'তাকরীয' (মতামত-মন্তব্য) লিখেছেন তার আলোচনাও আছে সেখানে। কিন্তু 'মুনাব্বিহাত' নামে কোনো রচনার কথা সেখানে নেই। তিনি তাঁর অপর একটি গ্রন্থ 'আয্যাওউল লামি'তেও (২/৩৬-৪০) ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর জীবনী আলোচনা করেছেন। সেখানেও এ নামে কোনো রচনার কথা উল্লেখ নেই।

প্রসঙ্গত, হাফেয সাখাবী রহ. ছিলেন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর সবচেয়ে নিকটতম শাগরেদ। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর প্রতি তাঁর গভীর মহব্বত ছিল।[১] তিনি সবসময় হাফেয ইবনে হাজার রহ.এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর ঘর হাফেয ইবনে হাজারের ঘরের খুব কাছে থাকায় তার জন্য তা সহজ ছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি কখনোই শায়খের মজলিসে অনুপস্থিত থাকতেন না। মুসাবিদা (খসড়াকপি) থেকে ইবনে হাজার রহ.এর বেশ কিছু কিতাবের চূড়ান্ত কপি (تَبْيِيْضٌ) তিনিই তৈরি করেছেন।[২] ৮৩৮ হিজরীতে প্রথম তিনি ইবনে হাজার আসকালানীর মজলিসে যান। হাফেয ইবনে হাজারের ইন্তেকাল পর্যন্ত (৮৫২ হি.) এই ধারা অব্যাহত থাকে।[৩]

---

[١] قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي «الضَّوْءِ اللَّامِعِ» وَهُوَ يَتَرْجِمُ لِنَفْسِهِ ٨/٥: «وَأَوْقَعَ اللهُ فِيْ قَلْبِهِ (اَلسَّخَاوِيِّ) مَحَبَّتَهُ (ابْنِ حَجَرٍ) فَلَازَمَ مَجْلِسَهُ، وَعَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ...». وَقَالَ فِي «التِّبْرِ الْمَسْبُوْكِ» ص٢٣٢: «كَانَ رَحِمَهُ اللهُ (ابْنُ حَجَرٍ) يَوَدُّنِي كَثِيْرًا، وَيُنَوِّهُ بِذِكْرِي فِيْ غَيْبَتِيْ، حَتّٰى قَالَ كَمَا بَلَغَنِيْ: لَيْسَ الْآنَ فِيْ جَمَاعَتِيْ مِثْلُهُ».

[٢] قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي «التِّبْرِ الْمَسْبُوْكِ» ص ٢٣٣ (سَنَةَ ٨٥٢): «وَبَيَّضْتُ مِنْ تَصَانِيْفِهِ مَا لَمْ أُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَمِمَّا كَتَبْتُهُ مِنْهَا جَمِيْعُ مَا سَمَّيْتُهُ (وَقَدْ سَمّٰى قَبْلَهُ أَكْثَرَ مِنْ ٣٠ تَصْنِيْفًا) وَكَذَا النُّكَتُ الظِّرَافُ عَلَى الْأَطْرَافِ، وَأَطْرَافُ مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَزَهْرُ الْفِرْدَوْسِ، وَتَخْرِيْجُ الْكَشَّافِ، وَالدُّرَرُ الْكَامِنَةُ بِأَعْيَانِ الْمِئَةِ الثَّامِنَةِ، وَإِنْبَاءُ الْغُمْرِ بِأَنْبَاءِ الْعُمْرِ، وَرَفْعُ الْإِصْرِ عَنْ قُضَاةِ مِصْرَ، وَمُعْجَمُ شُيُوْخِهِ، وَمَا يَفُوْقُ الْعَدَّ، وَالْكَثِيْرُ مِنْهَا كَتَبْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ».

[٣] قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي «التِّبْرِ الْمَسْبُوْكِ» ص٢٣٢: «سَمِعْتُ عَلَيْهِ فِي الصِّغَرِ مَعَ الْوَالِدِ رَحِمَهُمَا اللهُ أَشْيَاءَ، وَأَوَّلُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ فِيْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ، ثُمَّ لَازَمْتُهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ أَتَمَّ مُلَازَمَةٍ، حَتّٰى حَمَلْتُ عَنْهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عِلْمًا جَمًّا، وَاخْتَصَصْتُ بِالْمُثُوْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، بِحَيْثُ كُنْتُ مِنْ أَكْثَرِ الْآخِذِيْنَ عَنْهُ، وَأَعَانَ عَلٰى ذٰلِكَ قُرْبُ الْمَنْزِلِ مِنْهُ، فَلِذٰلِكَ كَانَ لَا يَفُوْتُنِيْ مِمَّا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، إِلَّا النَّادِرَ مِمَّا أَكُوْنُ فِيْ غَيْبَةٍ عَنْهُ، وَانْفَرَدْتُ عَنْ سَائِرِ الْجَمَاعَةِ بِأَشْيَاءَ، وَعَلِمَ شِدَّةَ حِرْصِيْ عَلٰى ذٰلِكَ، فَكَانَ يُرْسِلُ خَلْفِيْ أَحْيَانًا بَعْضَ خُدَّامِهِ لِلْمَنْزِلِ يَأْمُرُنِيْ بِالْمَجِيْءِ لِلْقِرَاءَةِ، فَرَأْتُ عَلَيْهِ...»، وَبِنَحْوِهِ قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي «الضَّوْءِ اللَّامِعِ» ٨/٦ أَيْضًا.

এ কারণেই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী সম্পর্কে এত বিস্তৃত ও তথ্যবহুল একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই ইবনে হাজার আসকালানীর রচনাবলি সম্পর্কে এত বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে রচনাবলির যে তালিকা দিয়েছেন তাতে 'মুনাব্বিহাত'এর উল্লেখ না থাকাটা (এবং রচনা প্রমাণিত হওয়ার অন্যান্য শর্তের অনুপস্থিতি) সঙ্গত কারণেই এই পুস্তিকা হাফেয ইবনে হাজারের রচনা হওয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এ ছাড়া পরবর্তী যুগের মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যারা তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন (যেমন জালালুদ্দীন সুয়ূতী[১] ইবনে ফাহাদ[২] ইবনুল ইমাদ[৩] শাওকানী[৪] আবদুল হাই আলকাত্তানী[৫] যিরিক্‌লী[৬] তাদের কেউ-ই এ নামে তাঁর কোনো রচনা আছে বলে উল্লেখ করেননি। (এখানে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, মুসলিম মনীষীদের জীবনীকারগণ তাঁদের জীবনী আলোচনাকালে গুরুত্বের সঙ্গে তাদের রচনাবলির কথা উল্লেখ করে থাকেন।)

মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন রচনাবলি থেকে পরবর্তী যুগের মুসলিম মনীষী ও গবেষকগণ বিভিন্ন তথ্য উদ্ধৃত করে থাকেন। পরবর্তী যুগের প্রায় সকল মুসলিম মনীষী হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য উল্লেখ করেছেন নিজেদের রচনাবলিতে। তাঁর বিভিন্ন রচনাবলির বরাতও এসেছে অসংখ্য লেখকের লেখায়। প্রশ্ন হল, পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য ও সচেতন মনীষীগণ নিজেদের লেখায় 'মুনাব্বিহাত'এর বরাত দিয়ে থাকেন কি? এ পুস্তিকার কোনো তথ্য হাফেয ইবনে হাজারের বরাতে মুসলিম মনীষীগণ উল্লেখ করেন কি? (১২৭০ হিজরীতে হিন্দুস্তানে ছাপা অক্ষরে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ হিন্দুস্তানী ছাপার উপর নির্ভর করে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা)।[৭] এর দ্বারা বোঝা যায় 'মুনাব্বিহাত' নামে হাফেয ইবনে হাজারের কোনো পুস্তিকা আহলে ইলমের মাঝে সাধারণভাবে স্বীকৃত কিংবা পরিচিত ছিল না।

---

[১] হুসনুল মুহাযারা ১/২৭৯, নাযমুল ইকয়ান ফী আ'য়ানিল আ'য়ান ৪৫-৫৩ (এ গ্রন্থে তিনি প্রায় ২০০ রচনার নাম উল্লেখ করেছেন।)

[২] লাহযুল আলহায বি-যাইলি তবাকাতিল হুফফায ৩২৬-৩৪৩

[৩] শাযারাতুয যাহাব ৭/২৭০-২৭৩

[৪] আল-বাদরুত তালি' ১/৬১-৬৪

[৫] ফিহরিসুল ফাহারিসি ওয়াল-আছবাত ১/৩২১-৩৩৭ =

দুই. কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকা যদি 'তাওয়াতুর' (বিপুলসংখ্যকসূত্র) বা 'তালাক্কি বিল-কবুল' (আহলে ইলমের মাঝে স্বীকৃত ও পরিচিত হওয়া) দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তাহলে তা প্রমাণিত হওয়ার পথ হল, উক্ত গ্রন্থ বা পুস্তিকার নির্ভরযোগ্য কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাওয়া। এ পুস্তিকার ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত সংস্করণগুলোতে নির্ভরযোগ্য কোনো পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করা হয়নি। হিন্দুস্তানী ছাপায়ও কোন্ পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে এটিকে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী কর্তৃক রচিত পুস্তিকা হিসেবে ছেপে দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।[১]

= [৬] আলআ'লাম ১/১৭৮-১৭৯

[৭] হায়দারাবাদের দায়েরাতুল মাআরেফ থেকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর রিজালশাস্ত্র সম্পর্কিত দু'টি গ্রন্থ তাহযীবুত তাহযীব ও লিসানুল মীযান প্রকাশিত হয়। এই উভয় গ্রন্থের শেষে হাফেয ইবনে হাজার রহ.এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী যোগ করে দেওয়া হয়েছে। আবুল মুযাফফর আবদুল মালেক মুহাম্মদ (বলা হয়েছে, তিনি কাযী মুহাম্মদ শরীফুদ্দীন নামে প্রসিদ্ধ) নামে দায়েরাতুল মাআরেফের সম্পাদনা বিভাগের একজন লোক এ জীবনীটি লিখেছেন (উভয় কিতাবে একই জীবনী)। সেখানে তিনি ইবনে হাজার রহ.এর রচনাবলির তালিকা দিতে গিয়ে 'মুনাব্বিহাত'এর কথাও উল্লেখ করেছেন। কীসের উপর ভিত্তি করে তিনি 'মুনাব্বিহাত'এর কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে স্পষ্ট করে বলেননি। জীবনীর শেষে শুধু উল্লেখ করেছেন যে, 'সাখাবী রহ. আয্যাওউল লামি' ও আলজাওয়াহের ওয়াদ-দুরার-এ ইবনে হাজার রহ.এর দীর্ঘ জীবনী লিখেছেন। এমনিভাবে হাসরুশ শারেদ, আলউমাম, সুয়ূতী রহ.এর 'হুসনুল মুহাযারা'তেও ইবনে হাজার রহ.এর জীবনী আছে।'
আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আয্যাওউল লামি', আলজাওয়াহের ওয়াদ-দুরার ও হুসনুল মুহাযারায় 'মুনাব্বিহাত'এর উল্লেখ নেই। হাসরুশ শারেদ মিন আসানীদি মুহাম্মদ আবেদ (এটি আবেদ সিন্দী রহ.এর 'ছাবাত') ও 'আল্উমাম লি-ঈকাযিল হিমাম'এও 'মুনাব্বিহাত'এর কথা উল্লেখ নেই। তাহলে কোত্থেকে তিনি তা পেলেন? সন-তারিখ মিলিয়ে দেখতে গিয়ে পাওয়া গেল, তাহযীবুত তাহযীব ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ হিজরীতে এবং লিসানুল মীযান ছাপা হয়েছিল ১৩৩১ হিজরীতে, আর হিন্দুস্তান থেকে 'মুনাব্বিহাত' ছেপে বেরিয়েছিল ১২৭০ হিজরীতে। অর্থাৎ তাহযীবুত তাহযীব ছাপার ৫৭ বছর আগে এবং লিসানুল মীযান ছাপার ৬১ বছর আগে 'মুনাব্বিহাত' ছাপা হয়। তাই সমূহ সম্ভাবনা এই যে, 'মুনাব্বিহাত'এর হিন্দুস্তানী ছাপার উপর নির্ভর করেই তিনি ইবনে হাজার রহ.এর রচনাবলির তালিকায় তা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

[১] قَالَ الدُّكْتُوْرُ شَاكِر مَحْمُوْد فِيْ كِتَابِهِ «ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَدِرَاسَةُ مُصَنَّفَاتِهِ وَمَنْهَجِهِ فِيْ كِتَابِهِ الْإِصَابَةِ» عَنِ الطَّبْعَةِ الْهِنْدِيَّةِ لِـ«مُنَبِّهَاتِ ابْنِ حَجَرٍ»: «وَلَمْ يُبَيِّنِ النَّاشِرُ شَيْئًا عَنِ النُّسْخَةِ أَوِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ الَّتِيْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا».

স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টি জানার জন্য এ পুস্তিকার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি খোঁজ করা হয়। তালাশ করার পর এর চারটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।[১] কিন্তু পাণ্ডুলিপি সমালোচনার নীতি অনুসারে তার কোনোটিকেই নির্ভরযোগ্য বলা যায় না।। কারণ, এই পাণ্ডুলিপিগুলোর কোনোটিতেই স্বাক্ষরিক পাণ্ডুলিপি (Autograph), আদর্শ পাণ্ডুলিপি (Exemplar), স্বাক্ষরিক পাণ্ডুলিপি বা আদর্শ পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের সনদ (সূত্র), লিপিকরের নাম-পরিচয় ইত্যাদির কিছুই উল্লেখ নেই। আহলে ইলমগণ জানেন, এ তথ্যগুলো উল্লেখ না থাকলে একটি পাণ্ডুলিপির কোনো মূল্যমানই থাকে না।

পুস্তিকাটি কার রচিত সে ব্যাপারে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধপূর্ণ। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, এটি আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলহাজ্জী (নাকি আলহিজ্জী?) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحجِّيْ কর্তৃক রচিত। সেই পাণ্ডুলিপিটিতেই পরে আছে, এর লেখক সফী আলমু'তাকিদ صَفِيْ الْمُعْتَقِدُ! খুব সম্ভব এটি লিপিকরের ভুল। কারণ এটি কোনো নাম হতে পারে না।

১নং পাণ্ডুলিপি

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, এখানে প্রথমে (مِمَّا صَنَّفَهُ زَيْنُ الْقُضَاةِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحجِّيُّ) লেখা, পরবর্তীতে লেখা صَنَّفَهَا صَفِيُّ الْمُعْتَقِدُ لِلنُّصْحِ وَالْوُدَادِ । দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতেও উল্লেখ করা হয়েছে, এর রচয়িতা সফী আলমু'তাকিদ! এ ছাড়া আর কোনো তথ্য নেই।

২নং পাণ্ডুলিপি

---

[১] 'জামিয়াতুল মালিক সঊদ'এর গ্রন্থাগারে এ পাণ্ডুলিপিগুলো সংরক্ষিত আছে।

তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে রচয়িতা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। রচয়িতার বক্তব্য আছে–

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام
على نبيه محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه نجوم
الهدى ومصابيح الظلم وبعد فهذه منبهات على الاستعداد
ليوم المعاد جمعتها من الأخبار والآثار معتقدا للنصح والود

৩নং পাণ্ডুলিপি

কিন্তু পাণ্ডুলিপির উপরে ভিন্ন কালিতে (লাল কালিতে) লেখা–

পাঠ হল–

هٰذِهِ كِتَابُ الْمُنَبِّهَاتِ عَلَى الْاِسْتِعْدَادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ تَأْلِيْفُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الْحَافِظِ شَارِحِ أَحَادِيْثِ النَّبِيِّ صَفِيِّ الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ أَحْمَد ابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ.

কিন্তু ভিন্ন কালিতে লিখিত এই লেখা কার? কীসের ভিত্তিতে এই দাবি করা হচ্ছে যে, এটি ইবনে হাজার আসকালানী রহ. কর্তৃক রচিত– এ ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই। লাইব্রেরির পক্ষ থেকে প্রদত্ত তথ্যে বলা হয়েছে–

فِيْ صَفْحَةِ الْعُنْوَانِ نُسِبَ لِابْنِ حَجَرٍ خِلَاف مَا وَرَدَ فِي الْفَهَارِسِ وَالْمَصَادِرِ.

চতুর্থ পাণ্ডুলিপিটি 'মুনাব্বিহাত'এর নয়; বরং তা থেকে সংক্ষেপিত একটি পুস্তিকার। সেখানেও লেখা হয়েছে– মূল পুস্তিকা, যা থেকে এই সংক্ষেপিত পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছে, তা ইবনে হাজার আসকালানীর রচনা। কিন্তু এখানেও না লিপিকরের নাম-পরিচয় আছে, না দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ?

বেশ কয়েক বছর আগে বাগদাদের একজন গবেষক আলেম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এবং তাঁর রচনাবলি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর প্রায় সমগ্র রচনাবলি সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা আছে। 'মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার' সম্পর্কে

আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, তিনি এ পুস্তিকার যে ক'টি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখেছেন তার অধিকাংশতেই পুস্তিকার লেখকের নাম নেই। তাঁর দেখা একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'ইবনে হাজার হাইতামী'র নাম। অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে– صَفِي مُعْتَمِد لِلنُّصْحِ وَالْوُدَادِ

'মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার' সম্পর্কিত আলোচনার শেষে তিনি লিখেছেন–

اَلْمُلَاحَظَاتُ عَنْهُ بِالْآتِيْ:

١– إِنَّهُ يُخَالِفُ أُسْلُوْبَ ابْنِ حَجَرٍ فِيْ ذِكْرِ الْأَحَادِيْثِ وَمَنْهَجِهِ فِيْ تِبْيَانِ أَسَانِيْدِهَا وَنَقْدِهَا وَمُتُوْنِهَا وَالْإِخْتِلَافِ فِيْهَا.

٢– لَمْ يَذْكُرْهُ مَصْدَرٌ مُعَاصِرٌ لِابْنِ حَجَرٍ وَلَا تَلَامِذَتُهُ.

٣– لَا يُوْجَدُ اسْمُ الْمُؤَلِّفِ فِيْ غَالِبِ النُّسَخِ الَّتِيْ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا.

দ্রষ্টব্য, ইবনে হাজার আসকালানী ওয়া-দিরাসাতু মুসান্নাফাতিহী[১] ড. শাকের মাহমূদ আবদুল মুনঈম ১/৬৮১-৬৮৩ (১/৩৯৪-৩৯৫, মুআস্সাসাতুর রিসালা)

পাণ্ডুলিপির আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পুস্তিকার লেখক আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলহাজ্জী। কাশফুয যুনূন-এ (২/১৮৪৮) হাজী খলিফাও লিখেছেন, এই পুস্তিকার রচয়িতা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলহাজ্জী।[২] **অথচ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ছিল না, তাঁর নাম ছিল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার।** হাফেয সাখাবী উল্লেখ করেছেন, তিনি নিজের নাম আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ লিখতেন। দ্রষ্টব্য, আলজাওয়াহের ওয়াদ-দুরার ১/১০১-১০২

---

[১] এ গ্রন্থটি প্রথমে اِبْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَدِرَاسَةُ مُصَنَّفَاتِهِ وَمَنْهَجِهِ فِيْ كِتَابِهِ الْإِصَابَةِ নামে বাগদাদের দারুর রিসালা থেকে ছাপা হয়। পরবর্তী সময়ে বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুআস্সাসাতুর রিসালা থেকে اِبْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ: مُصَنَّفَاتُهُ وَدِرَاسَةٌ فِيْ مَنْهَجِهِ وَمَوَارِدِهِ فِيْ كِتَابِهِ الْإِصَابَةِ নামে ছাপা হয়। এই সংস্করণে ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৭৭, দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪৪। প্রথম খণ্ডে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর সমগ্র রচনাবলি সম্পর্কে আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর 'আলইসাবা' গ্রন্থ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।

[২] ইস্তাম্বুল থেকে কাশফুয যুনূন-এর যে সংস্করণ ছেপেছে (যা সরাসরি লেখকের পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য, ভূমিকা ১/৭-১০) তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (Gustavus Flugel) কর্তৃক কাশফুয যুনূন-এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ভুলক্রমে (اَلْحجِّيُّ) শব্দটি (اَلْحَجَرِيُّ) লেখা হয়। দ্রষ্টব্য, কাশফুয যুনূন ২/১৮৪৮ এবং ভূমিকা ১/১০-১১

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাকরীবুত তাহযীব'-এর একটি পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যায় সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি পুরোটাই হাফেয ইবনে হাজার রহ.এর নিজের হাতে লেখা। পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন–

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি

آخِرُ الْكِتَابِ. فَرَغَ - سِوٰى مَا أَصْلَحَ فِيْهَ بَعْدُ- فِيْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، رَابِعِ عِشْرِيْ جُمَادَى الْآخِرَةِ، عَام سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَمَانِمِائَةٍ مُلَخِّصُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ حَامِدًا مُصَلِّيًا مُسَلِّمًا.

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নিজের নাম লিখেছেন, আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার।[১] এ ছাড়া ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর যেসব রচনার শুরুতে বা শেষে নিজের পূর্ণ নাম লিখেছেন সেখানেও তিনি 'আহমদ ইবনে আলী'-ই লিখেছেন।

দ্রষ্টব্য, ফাতহুল বারী ১৩/৫৫৬, তাহযীবুত তাহযীব ১২/৪৯৩, তাকরীবুত তাহযীব ৭৮৭, বুলূগুল মারাম ৩৩৪ (দারুল মারেফা), ইনবাউল গুমর ১/২, আত্তালখীসুল হাবীর ৬/৩২৯৬, তা'জীলুল মানফাআ ২/৬৮৭, তাবসীরুল মুনতাবিহ ৪/১৫১৫, আলমাজমাউল মুআস্সিস ৩/৩৬৯, তাগলীকুত তা'লীক ৫/৩৮৩, ফাত্ওয়া ফী ওয়াক্ফিন মুজাবিরিন লিল-হারাম, লিকাউল আশরিল আওয়াখিরি বিল-মাসজিদিল হারাম, রিসালা নং ৭৪, পৃ. ৩৭ এবং মুহাক্কিকের ভূমিকা ১৬

কিন্তু এই 'আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলহাজ্জী' কে ছিলেন কিংবা আদৌ এ নামে কেউ ছিলেন কি না? অনেক চেষ্টার পরও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পাণ্ডুলিপির আলোচনায় এ বিষয়টিও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদের কাছে মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজারের যে হিন্দুস্তানী সংস্করণ আছে তা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭০ হিজরীতে। মাতবায়ে মুস্তাফাই থেকে এটি ছাপা হয়। ছাপা হওয়ার পর পুস্তিকাটি সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

---

[১] দেখুন, আলআ'লাম, যিরিক্লী ১/১৭৯, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা কৃত তাকরীবুত তাহযীব-এর ভূমিকা ৭৩

কেউ কেউ এটি ইবনে হাজার রহ.এর রচনা নয় বলে জোরালো মতও প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটি সম্পর্কে এই বিতর্ক ওঠার পরও ১২৭০ হি. থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত (১৪৩৬হি.) ১৬৫ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে কেউ 'মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার'-এর নির্ভরযোগ্য কোনো পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিতে পারেননি।

মোটকথা, এই পুস্তিকার নির্ভরযোগ্য কোনো পাণ্ডুলিপি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে পাণ্ডুলিপিগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে পাণ্ডুলিপি প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলি অনুপস্থিত। পুস্তিকার লেখক সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য এত বিরোধপূর্ণ যে তা সমাধান করে লেখক সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা যায় না।

তিন. আগে উল্লেখ করা হয়েছে, পুস্তিকার মূল পাঠে এমন কিছু বিষয় আছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ইবনে হাজার রহ.এর রচনা নয়। বিষয়টি এখানে বিশদ করে আলোচনা করা হল–

ক. মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজারের হিন্দুস্তানী সংস্করণে আমাদের গণনা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধিত করে উল্লেখ করা বাণী, সাহাবী-তাবেঈ-তাবে-তাবেঈর উক্তি, মুসলিম মনীষী বা বিজ্ঞজনদের কথা ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ১০৮টি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] (চারটি কবিতা এবং 'আবুল ফযল' বলে একটি উক্তির উল্লেখ আছে, সেগুলো এখানে হিসেব করা হয়নি)।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই ১০৮টি বর্ণনার একটিরও বরাত (রেফারেন্স) উল্লেখ করা হয়নি। এটি ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর রচনারীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি তাঁর লেখায় সাধারণত বরাত ছাড়া কোনো কথা উল্লেখ করেন না। বিশেষ করে হাদীস, সাহাবী-তাবেঈ-তাবে-তাবেঈর উক্তি উল্লেখ করলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরাত উল্লেখ করেন। তাঁর যেসব গ্রন্থে রেওয়ায়েত বিবৃত হয়েছে, যেমন ফাতহুল বারী, আত্তালখীসুল হাবীর, তাগলীকুত তা'লীক, আলইসাবা, বাযলুল মাউন, তাবয়ীনুল আজাব, নাতায়েজুল আফকার, আদ্দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া, আলকাফিশ শাফ ফী তাখরীজি আহাদীসিল কাশশাফ প্রভৃতি গ্রন্থে একবার নজর বুলালেই এ বিষয়টি ধরা পড়বে। নিজস্ব রচনারীতি থেকে সরে গিয়ে এ পুস্তিকায় এসে তিনি ১০৮টি বর্ণনার প্রত্যেকটিই বরাত ছাড়া উল্লেখ করেছেন– বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

---

[১] হিন্দুস্তানী ছাপায় পুস্তিকাটি শেষ হয়েছে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ-এর বক্তব্য দিয়ে। একটি পাণ্ডুলিপিতে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ-এর বক্তব্যের পরে بَعْضُ الْحُكَمَاءِ এর একটি বক্তব্য আছে। এটি যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়াবে ১০৯।

খ. ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর রচনাবলিতে সাধারণত মওযূ, মুনকার ও ভিত্তিহীন বর্ণনা থাকে না। কোনো স্থানে তিনি যয়ীফ কোনো রেওয়ায়েত উল্লেখ করলে সাধারণত বর্ণনাটির শাস্ত্রীয় মান উল্লেখ করে দেন। অথচ 'মুনাব্বিহাত'-এ বেশ কিছু মওযূ, মুনকার ও ভিত্তিহীন বর্ণনা আছে। কিছু বর্ণনা এমন আছে, ইবনে হাজার রহ. নিজেই তাঁর অন্য রচনায় যাকে 'মুনকার' বলেছেন। কোথাও সাহাবীর কথাকে রাসূলের বাণী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও লোকমান হাকীমের কথা হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও সহীহ হাদীসে ভিত্তিহীন কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট এই পুস্তিকাটিতে এ ধরনের এমন সব অসঙ্গতি রয়েছে, যা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর মতো বিদগ্ধ একজন হাদীস বিশারদের পক্ষ থেকে হওয়া অসম্ভব। নমুনাস্বরূপ এখানে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল–

১. মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার-এর ৭০ নং পৃষ্ঠায়[১] উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ لَا تَشْبَعُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: اَلْعَيْنُ مِنَ النَّظَرِ، وَالْأَرْضُ مِنَ الْمَطَرِ، وَالْأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ، وَالْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ، وَالسَّائِلُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ، وَالْحَرِيْصُ مِنَ الْجَمْعِ، وَالْبَحْرُ مِنَ الْمَاءِ، وَالنَّارُ مِنَ الْحَطَبِ.

এটি একটি জাল বর্ণনার সংযোজিত রূপ। মূল জাল বর্ণনাটির পাঠ–

أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ : أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ، وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ.

মূল জাল বর্ণনাটির সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করে একটি নতুন রূপ দাঁড় করানো হয়েছে। বর্ণনাটি সম্পর্কে জানতে দেখুন, আলমাওযূআত, ইবনুল জাওযী (টীকাসহ) ১/৩৮৩-৩৮৫, মীযানুল ইতিদাল ১/৫৪২ (হুসাইন ইবনে উলওয়ান-এর জীবনী), লিসানুল মীযান ৩/১৮৯-১৯০, আলমানারুল মুনীফ ৯৯-১০০, ফয়যুল কাদীর ১/৪৬৭, আলমুগীর, আহমদ গুমারী ১৯, প্রয়োজনে দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা, ক্রমিক নং ৭৬৬

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. মীযানুল ইতিদাল-এ হুসাইন ইবনে উলওয়ান নামক একজন বর্ণনাকারীর জীবনীতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে লিখেছেন–

وَكَذَّابٌ مِنْ كَذِبٍ.

---

[১] এই পৃষ্ঠা নম্বর হিন্দুস্তানের মাতবায়ে মুস্তফাই থেকে ছাপা সংস্করণ অনুসারে প্রদত্ত।

অর্থাৎ চার জিনিস চার জিনিসে যেমন তৃপ্ত হয় না, তেমনি মিথ্যুকও মিথ্যা বলে তৃপ্ত হয় না। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এটি একটি জাল বর্ণনা। যা এক মিথ্যুকের নির্লজ্জ মিথ্যাচারের ফসল।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিসানুল মীযান-এ হাফেয যাহাবী রহ.এর কথা উল্লেখ করে তা বহাল রেখেছেন এবং যাহাবী রহ.এর কথা শেষ হওয়ার পর হুসাইন ইবনে উলওয়ান সম্পর্কে আরও কিছু ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা যাহাবী রহ.এর কথার সমর্থন করে। **এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বর্ণনাটি হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর মতে জাল।**

এক গ্রন্থে একটি বর্ণনা সম্পর্কে মওযূ হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়ে তিনিই আবার তাঁর অন্য একটি পুস্তিকায় (মুনাব্বিহাত-এ) তা উল্লেখ করবেন? জাল বর্ণনার সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করে 'জাল বর্ণনার জালরূপ' দাঁড় করাবেন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর মতো হাদীস বিশারদ?!

২. ৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ يَشْكُوْ ضِيْقَ الْعَيْشِ فَكَأَنَّمَا يَشْكُوْ رَبَّهُ، وَمَنْ أَصْبَحَ لِأُمُوْرِ الدُّنْيَا حَزِيْنًا فَقَدْ أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ.

বর্ণনাটি 'মুনকার'। ইমাম আবু জাফর উকাইলী রহ. আয্যুআফাউল কাবীর গ্রন্থে উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে মা'দান নামক একজন বর্ণনাকারীর জীবনীতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে মা'দান সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

كُوْفِيٌّ مَجْهُوْلٌ بِنَقْلِ الْحَدِيْثِ، حَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ، لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ.

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে মা'দান-এর জীবনীতে লিখেছেন–

عَنْ مَنْصُوْرٍ. لَا يُعْرَفُ، وَأَتَى بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ ذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যাহাবী রহ.এর কথা উল্লেখ করে তা বহাল রেখেছেন এবং উকাইলী রহ.এর কিতাব থেকে বর্ণনাটির মূল পাঠ উল্লেখ করেছেন।

এই বর্ণনাটি ওয়াহ্ব ইবনে রাশেদ নামক আরেকজন বর্ণনাকারীর জীবনীতে হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ওয়াহ্ব

ইবনে রাশেদ এই মুনকার বর্ণনাটি বর্ণনা করার কারণে তার ব্যাপারে আপত্তি উঠেছে। সেখানেও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যাহাবী রহ.এর কথা উল্লেখ করে তা বহাল রেখেছেন।

দ্রষ্টব্য, আয্‌যুআফাউল কাবীর ৩/১২৭, মীযানুল ইতিদাল ৩/১৭, লিসানুল মীযান ৫/৩৮৭ (উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে মা'দান-এর জীবনী) এবং আলকামিল ফী যুআফাইর রিজাল ৮/৩৩৯, আলমাজরূহীন ৩/৭৫-৭৬, আয্‌যুআফাউল কাবীর ৪/৩২২, মীযানুল ইতিদাল ৪/৩৫১-৩৫২, লিসানুল মীযান ৮/৩৯৭-৩৯৮ (ওয়াহ্‌ব ইবনে রাশেদ-এর জীবনী)

'মুনাব্বিহাত'কে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর রচনা বলা হলে তার অর্থ দাঁড়াবে, এক কিতাবে একটি বর্ণনাকে মুনকার বলে সেই বর্ণনাকেই তিনি ভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

৩. ১৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে—

وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟ فَقَالُوْا: أَصْبَحْنَا مُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ. فَقَالَ: وَمَا عَلَامَةُ إِيْمَانِكُمْ؟ قَالُوْا: نَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ، وَنَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ، وَنَرْضٰى بِالْقَضَاءِ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ حَقًّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

এই বর্ণনাটিও মুনকার। ইমাম তবারানী তাঁর আলমু'জামুল আওসাত (১/১৯৪, হাদীস নং ৯৪২৩) ও আলমু'জামুল কাবীর (১১/১২৩, হাদীস নং ১১৩৩৬) গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেছেন—

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» مِنْ رِوَايَةِ يُوْسُفَ بْنِ مَيْمُوْنٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَطَاءٍ.

মুরতাযা যাবীদী রহ. তাঁর কথা উল্লেখ করে মৌন সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্য, আলমুগনী আন হামলিল আসফার ৪/৮৫, ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৯/৬, আরও দেখুন, তাহযীবুল কামাল ৩২/৪৬৯-৪৭০, তাহযীবুত তাহযীব ১১/৪২৬ (ইউসুফ ইবনে মায়মূন-এর জীবনী)

৪. ২৩ নং পৃষ্ঠায় আছে—

وَعَنْ رَسُوْلِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: اَلطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

وَكَانَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ جُلُوْسًا، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ: «صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَأَنَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ: اَلنَّظْرُ إِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ، وَإِنْفَاقُ مَالِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، وَأَنْ يَكُوْنَ اِبْنَتِيْ تَحْتَ رَسُوْلِ اللهِ». فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «صَدَقْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ: اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالثَّوْبُ الْخَلِقُ». فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «صَدَقْتَ يَا عُمَرُ، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ: إِشْبَاعُ الْجِيْعَانِ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ»، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «صَدَقْتَ يَا عُثْمَانُ: وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ: اَلْخِدْمَةُ لِلضَّيْفِ، وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ» فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ وَقَالَ أَرْسَلَنِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ، وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَنِيْ عَمَّا أُحِبُّ، إِنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: «إِرْشَادُ الضَّالِّيْنَ، وَمُوَانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِيْنَ، وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ الْعِيَالِ الْمُعْسِرِيْنَ». وَقَالَ جِبْرِيْلُ: يُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ: بَذْلُ الْإِسْتِطَاعَةِ، وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ».

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন–

ক. বর্ণনাটির প্রথম অংশ (রাসূলুল্লাহ সা.এর কথা) মুসনাদে আহমদ (১২২৯৩) ও সুনানে নাসায়ী (৩৯৩৯, ৩৯৪০)-এ আছে। তবে সেখানে ثَلَاثٌ শব্দটি নেই। (ثَلَاثٌ শব্দ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসছে)। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এই বর্ণনাটির সনদ নির্ভরযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। –মীযানুল ইতিদাল ২/১৭৭, আত্‌তালখীসুল হাবীর ৫/২১৫৫

সনদ নির্ভরযোগ্য হলেও বর্ণনাটি মূলত 'মুরসাল'। ইমাম আবুল হাসান দারাকুত্‌নী রহ. এই তাহকীক পেশ করেছেন এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। –আলকাফিশ শাফ ফী তাখরীজি আহাদীসিল কাশশাফ ১/৩৮৮ (সূরা বাকারা ৪৫) মুসনাদে আহমদ ১৯/৩০৬ (টীকা)

খ. ثَلَاثٌ শব্দটি এই হাদীসের অংশ নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. প্রমুখ হাদীস বিশারদ ইমাম বলেছেন, এই শব্দটি কোনো রেওয়ায়েতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

–আত্তালখীসুল হাবীর ৫/২১৫৫, আলকাফিশ শাফ ১/৩৮৮, আত্তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা, যারকাশী ১৮১, আলমাকাসিদুল হাসানা ২৯৩, আরও দেখুন, আলমাসনূ ৮৯, আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১২৫

এখানে আমরা ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি–

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي «التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ» (٢١٥٥/٥): «وَقَدِ اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ بِزِيَادَةِ: (ثَلَاثٍ)، وَشَرَحَهُ الْإِمَامُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ فُوْرَكَ فِيْ جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَلَى ذٰلِكَ. وَكَذٰلِكَ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي «الْإِحْيَاءِ»، وَلَمْ نَجِدْ لَفْظَ (ثَلَاثٍ) فِيْ شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ الْمُسْنَدَةِ». وَقَالَ فِيْ «تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الْكَشَّافِ» ٣٨٨/١: «قُلْتُ: لَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ لَفْظُ «ثَلَاثٍ» بَلْ أَوَّلُهُ عِنْدَ الْجَمِيْعِ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ. اَلْحَدِيْثُ». وَزِيَادَةُ «ثَلَاثٍ» تُفْسِدُ الْمَعْنٰى، عَلٰى أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا بَكْرِ بْنَ فُوْرَكَ شَرَحَهُ فِيْ جُزْءٍ مُفْرَدٍ بِإِثْبَاتِهَا، وَكَذٰلِكَ أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَاشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ».

বোঝা গেল, ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর মতে এই শব্দটি প্রমাণিত নয়। 'মুনাব্বিহাত' যদি তাঁর রচনা হয় তাহলে এ শব্দ তিনি এখানে কেন উল্লেখ করবেন?

গ. ...وَكَانَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ جُلُوْسًا এই অংশটি প্রমাণিত নয়। শিহাবুদ্দীন কাস্তাল্লানী রহ. আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া গ্রন্থে বর্ণনাটির প্রথম অংশ (আলী রা.এর কথা পর্যন্ত) 'লতিফা'র শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার পরই তিনি বর্ণনাটি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন–

قَالَ الطَّبَرِيُّ (أَيْ اَلْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي «الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ» ٥٢/١) خَرَّجَهُ الْخُجَنْدِيُّ. كَذَا قَالَ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ».اِنْتَهٰى كَلَامُ الْقَسْطَلَّانِيِّ.

আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া-এর ভাষ্যগ্রন্থ শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়ায় ইমাম মুহাম্মদ যুরকানী রহ. স্পষ্ট বাক্যে বলেছেন– لَا يَصِحُّ 'এটি প্রমাণিত নয়।'[১] –আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ২/৪৭৮, শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া ৬/৩৭৫

---

[১] مَلْحُوْظَةٌ: مَعْنَى قَوْلِ الزُّرْقَانِيِّ هُنَا (لَا يَصِحُّ): لَا يَثْبُتُ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ الصِّحَّةِ الْاِصْطِلَاحِيَّةِ فَقَطْ، حَتّٰى يُقَالَ: إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ حَسَنًا أَوْ ضَعِيْفًا عَلَى الْأَقَلِّ. وَأَئِمَّةُ هٰذَا الشَّأْنِ لَا يُطْلِقُوْنَ (لَا يَصِحُّ) لِمُجَرَّدِ نَفْيِ الصِّحَّةِ الْاِصْطِلَاحِيَّةِ. اُنْظُرْ -غَيْرَ مَأْمُوْرٍ- بَحْثَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبِيْ غُدَّةَ فِيْ مُقَدِّمَةِ «الْمَصْنُوْعِ» لِلْمُلَّا عَلِيِّ الْقَارِيْ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالٰى.

৫. ৫ পৃষ্ঠায় আছে–

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «خَصْلَتَانِ لَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا: اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَخَصْلَتَانِ لَا شَيْءَ أَخْبَثُ مِنْهُمَا: اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالضَّرُّ بِالْمُسْلِمِيْنَ».

বর্ণনাটির কোনো সনদ খুঁজে পাওয়া যায় না। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন–

ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ (٣١٢/٢) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَلَدُهُ فِيْ مُسْنَدِهِ.

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ.ও এর কোনো সনদ খুঁজে পাননি। –আলমুগনী আন হামলিল আসফার ২/২৯৭, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া ৬/৩১৭

৬. ৭ পৃষ্ঠায় আছে–

عَنِ النَّبِيِّ: «لَا صَغِيْرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ».

মুনাব্বিহাত-এ এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এটি রাসূলের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। রাসূলের হাদীস হিসেবে যে বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছে সে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। হাফেয যাহাবী রহ. বর্ণনাটিকে 'মুনকার' বলেছেন।

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى فِي «الْمِيْزَانِ» ٥٣٨/٤ فِيْ تَرْجَمَةِ (أَبُوْ شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيُّ): «أَتٰى بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ رَوَاهُ عَنْهُ سَعْدُوْيَهْ، حَدَّثَنَا أَبُوْ شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيْرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ.

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যাহাবী রহ.এর কথা উল্লেখপূর্বক তা বহাল রেখেছেন। –মীযানুল ইতিদাল ৪/৫৩৮, লিসানুল মীযান ৯/৯৫, এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন, আলমাকাসিদুল হাসানা ৭২৬, মীযানুল ইতিদাল ১/৩১২-৩১৩ (বিশর ইবনে ইবরাহীম-এর জীবনী) মুসনাদুশ শিহাব ২/২০৪ (১১৯০) সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা, ক্রমিক নং ৪৮১০, ১৫৫৫১

তবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ মর্মে নির্ভরযোগ্য সূত্রে একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফসীরে ইবনুল মুনযির ২/৬৭১ (১৬৭০), তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম ৩/৯৩৪ (৫২১৭), তাফসীরে ইবনে জারীর ৬/৬৫১, শুআবুল ঈমান ৫/৪৫৬

লিসানুল মীযান-এ বর্ণনাটি রাসূলের বাণী নয়, এ মর্মে মত দিয়ে এসে 'মুনাব্বিহাত'এ আবার তা রাসূলের বাণী হিসেবেই উল্লেখ করে দিয়েছেন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.?

৭. ৫ পৃষ্ঠায় আছে–

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ».

মুনাব্বিহাত-এ এই বর্ণনাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নবীজীর বাণী হিসেবে এটি খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম শব্দে লোকমান হাকীমের উক্তি হিসেবে কোনো কোনো গ্রন্থে এটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনুল মুবারক রহ. রচিত আয্যুহ্দ গ্রন্থে (৫৬০, ক্রমিক নং ১০৮০) আছে, তাবেঈ আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে বুখত[১] বলেছেন, লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন–

يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ...

ইমাম মালেক রহ.এর মুআত্তা গ্রন্থে (২/২৮৯ ক্রমিক নং ২২৫) আছে–

مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمَ أَوْصَى ابْنَهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ. فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقُلُوْبَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ. كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.

মোটকথা, এটি (সর্বোচ্চ) লোকমান হাকীমের উক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়।[২]

৮. ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে–

---

(১) তাঁর জীবনী দেখুন, তাহযীবুল কামাল ১৮/৪৮৮-৪৯১

(٢) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» ١٩٩/٨ (٧٨١٠)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِيْ «أَمْثَالِ الْحَدِيْثِ» ص٨٧ (مُؤَسَّسَةُ الْكُتُبِ الثَّقَافِيَّةِ، بَيْرُوْتَ) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الْكُبْرَى» ص٢٩٩ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ... =

قَالَ النَّبِيُّ: «مَا مِنْ عَبْدٍ وَأَمَةٍ دَعَا بِهٰذَا الدُّعَاءِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَهِيَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَدْعُ قَطِيْعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمٍ: أَوَّلُهَا سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْأَرْضِ مُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْبَرِّ سَبِيْلُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْهَوَاءِ رُوْحُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْأَرْحَامِ عِلْمُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْقُبُوْرِ قَضَاؤُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ، سُبْحَانَ الَّذِيْ وَضَعَ الْأَرْضَ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ».

বর্ণনাটি মুনকার। এ বর্ণনার একজন রাবী আযরাহ্ ইবনে কায়েস সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেছেন–

مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ عَلٰى قِلَّتِهِ، لَا يُعْجِبُنِي الْاِحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ، وَإِنْ اعْتَبَرَ بِهِ مُعْتَبِرٌ بِمَا لَمْ يُخَالِفْ الْأَثْبَاتَ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا عَلٰى أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ كَانَ سَيِّءَ الرَّأْيِ فِيْهِ...

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেছেন– لَا شَيْءَ

ইমাম বুখারী রহ. তার জীবনীতে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন–

لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

এ বর্ণনার আরেকজন রাবী উম্মুল ফায়েয সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাছাড়া বর্ণনাটির বক্তব্যও আপত্তিকর। বিশেষ করে দাগটানা বাক্যটি।

–আত্তারীখুল কাবীর ৪/১/৬৫, আয্যুআফাউল কাবীর ৩/৪১২, আল্জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/২১, আলমুত্তাফিক ওয়াল-মুফ্তারিক, খতীব বাগদাদী ৩/১৭৪৪-১৭৪৫, মীযানুল ইতিদাল ৩/৫৬, লিসানুল মীযান ৫/৪৩২ (টীকাসহ)

উল্লেখ্য, এ বর্ণনাটিও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিসানুল মীযান-এ উল্লেখ করেছেন।

= قُلْتُ: اَلْحَدِيْثُ مَرْفُوْعًا مُنْكَرٌ، عَلِيُّ بْنُ يَزِيْدَ الْأَلْهَانِيُّ ضَعِيْفٌ، خُصُوْصًا فِيْمَا رَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، وَقَدْ رَوٰى عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ نُسْخَةً أَنْكَرَ عَلَيْهَا الْحُفَّاظُ، يُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ وَتَرْجَمَةُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ فِيْ «تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ» ٧/١٢-١٣، ٧/٣٩٦-٣٩٧، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِيْ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» ١/١٢٥: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَفِيْهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيْفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ».

৯. ৯২ পৃষ্ঠায় আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَحِمَهُ اللهُ (كَذَا) عَنِ النَّبِيِّ: «اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ، /وَفِيْهَا عَشْرُ خِصَالٍ: زَيْنُ الْوَجْهِ، وَنُوْرُ الْقَلْبِ، وَرَاحَةُ الْبَدَنِ، وَأُنْسٌ فِي الْقَبْرِ، وَمَنْزِلُ الرَّحْمَةِ، وَمِفْتَاحُ السَّمَاءِ، وَثِقْلُ الْمِيْزَانِ، وَمَرْضَاةُ الرَّبِّ، وَثَمَنُ الْجَنَّةِ، وَحِجَابٌ مِنَ النَّارِ، / وَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ.

এই বর্ণনার তিনটি অংশ। প্রথম অংশটি বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এ অংশ আমাদের আলোচ্যবিষয় নয়। তাই এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হল না। বিস্তারিত জানতে দেখুন, তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ, জামালুদ্দীন যাইলাঈ ১/৪২-৪৩, আন্নাফেলাহ ফিল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল-বাতিলাহ, আবু ইসহাক আলহুয়াইনী ২/৫৪

বর্ণনার তৃতীয় অংশ সম্পর্কে মুরতাযা যাবীদী রহ. বলেছেন–

وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَمَنْ تَرَكَهَا الخ فَلَمْ أَرَهُ.

অর্থাৎ বর্ণনার এ অংশ আমি খুঁজে পাইনি। –ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৯

আর বর্ণনার দ্বিতীয় অংশ অনেক তালাশের পরও হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থে আমরা খুঁজে পাইনি।

১০. ১২ পৃষ্ঠায় আছে–

ثَلَاثُ نَفَرٍ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: اَلْمُتَوَضِّئُ فِي الْمَكَارِهِ؛ وَالْمَاشِيْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ؛ وَمُطْعِمُ الْجَائِعِ.

বর্ণনাটি মুনকার। ইমাম আবুল কাসেম ইস্পাহানী তার আত্তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে (১/৯৩ ক্রমিক নং ১৪৮) বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। সনদে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আলগিফারী নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, যার ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞদের কঠিন মন্তব্য আছে। হাদীস জাল করার অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছেন তাকে কোনো কোনো ইমাম। শাস্ত্রজ্ঞদের মন্তব্য জানতে দেখুন, তাহযীবুত তাহযীব ৫/১৩৭-১৩৮

প্রসঙ্গত, উক্ত বর্ণনাটির দু'টি অংশ। মুনাব্বিহাত-এ একটি অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। অপর অংশ উল্লেখ করা হয়নি। আবুল কাসেম ইস্পাহানীর কিতাবে উভয় অংশই আছে। বর্ণনাটির অপর অংশ ইমাম তিরমিযী রহ. জামে তিরমিযী (২৪৯৪)-এ উল্লেখ করে বলেছেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

ইমাম তিরমিযী যখন কোনো হাদীস সম্বন্ধে শুধু 'গারীবুন' বলে মন্তব্য করেন, এর সঙ্গে 'সহীহ' বা 'হাসান' শব্দ যুক্ত না করেন, তখন সাধারণত তার উদ্দেশ্য হয় বর্ণনাটি যয়ীফ বা মা'লূল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা। (সে মা'লূল 'শুযূয' বা 'নাকারাত'-এর কারণে হোক, 'ইযতিরাব, 'ইনকিতা' বা 'ইরসাল' যে কারণেই হোক।) –আলইমাম আত্তিরমিযী ওয়া-মানহাজুহূ ফী কিতাবিহিল জামে, ড. আদাব মাহমুদ আলহাম্শ ১/৪৩৬, মাসিক আলকাউসার, মার্চ '১৫ঈ.

এখানে নমুনাস্বরূপ ১০টি বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু রেওয়ায়েত এমন আছে, যেগুলো অনেক চেষ্টার পরও আমাদের পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। যেমন ৩২ পৃষ্ঠায় একটি বর্ণনা আছে–

اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ وَالصَّمْتُ أَفْضَلُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَالصَّمْتُ أَفْضَلُ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَالصَّمْتُ أَفْضَلُ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الدِّيْنِ وَالصَّمْتُ أَفْضَلُ.

বর্ণনাটির চারটি ভাগ। প্রত্যেক ভাগের প্রথম অংশ আমাদের পরিচিত। কিন্তু প্রত্যেক ভাগের প্রথম অংশের সঙ্গে وَالصَّمْتُ أَفْضَلُ যোগ করে বর্ণনাটির যে রূপ দাঁড় করানো হয়েছে, তা আমরা হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে খুঁজে পাইনি। তাছাড়া এখানে মৌনতা অবলম্বনকে নামায-রোযা-জিহাদ-সদকা থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, এটি ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ-রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ জাতীয় আরও অনেক বর্ণনা এ পুস্তিকায় আছে। এখানে শুধু একটি বর্ণনাই উল্লেখ করা হল।

মোটকথা, যদি দাবি করা হয় 'মুনাব্বিহাত' ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর রচনা, তাহলে তার অনিবার্য অর্থ দাঁড়াবে–

* হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর রচিত একটি পুস্তিকায় ১০৮টি বর্ণনা বরাত ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

* হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর পুস্তিকায় জাল বর্ণনা স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, জাল বর্ণনার সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা সংযোজন করে দিয়ে জাল বর্ণনার নবরূপ সৃষ্টি করেছেন। অথচ লিসানুল মীযানে তিনি বর্ণনাটি জাল হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে এসেছেন।

* লিসানুল মীযান প্রভৃতি গ্রন্থে কিছু কিছু বর্ণনা 'মুনকার' হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়ে সেই বর্ণনাগুলোই আবার একটি পুস্তিকায় উল্লেখ করে দিয়েছেন।
* হাওয়ালা ও বরাত ছাড়া নির্দ্বিধায় ভিত্তিহীন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।
* একটি বর্ণনায় নির্দিষ্ট একটি শব্দ সম্পর্কে ভিত্তিহীন হওয়ার ফয়সালা দিয়ে এই পুস্তিকায় এসে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন।
* সাহাবীর উক্তিকে রাসূলের বাণী হিসেবে উল্লেখ করে দিয়েছেন অথচ রাসূলের বাণী হিসেবে তা প্রমাণিত নয় বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন লিসানুল মীযান গ্রন্থে।
* লোকমান হাকীমের উক্তিকে রাসূলের বাণী হিসেবে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

তাসাওউফ, মাওয়ায়েয, যুহদ-রাকায়েক ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত কিতাবে অনেকেই কিছুটা শিথিলতা করে থাকেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট শর্তাবলির প্রতি লক্ষ রেখে 'যয়ীফ' হাদীসও উল্লেখ করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট শর্তাবলি রক্ষা করে যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করা আর উপরিউক্ত ত্রুটিগুলোর শিকার হওয়া এক কথা নয়। তাই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর মতো ব্যক্তিত্বের উপর উপরিউক্ত ত্রুটিগুলো আরোপ করার আগে ভেবে দেখা প্রয়োজন–

* ৮৫২ হিজরীতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইন্তেকাল করেন। আর হিন্দুস্তানে 'মুনাব্বিহাত' ছাপা হয় ১২৭০ হিজরীতে। ৮৫২ থেকে ১২৭০ এই ৪১৮ বছরের ইতিহাসে কোনো নির্ভরযোগ্য, সতর্ক ও সচেতন মুসলিম মনীষী এই পুস্তিকা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর বলে দাবি করেছেন কি?
* ৪১৮ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে কোনো নির্ভরযোগ্য, সতর্ক ও সচেতন মুসলিম লেখকের লেখায় (এই পুস্তিকা হাফেয ইবনে হাজার কর্তৃক রচিত এমন ধারণা দিয়ে) এই পুস্তিকার বরাত পাওয়া যায় কি?
* এই দীর্ঘ সময়ে এবং ১২৭০ থেকে আজ পর্যন্ত ১৬৫ বছরে (মোট ৫৮৩ বছর) এই পুস্তিকার নির্ভরযোগ্য কোনো পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে কি?

একটি স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের বিপরীত মতামত দানের জন্য বক্তব্যের পক্ষে শক্ত ও নির্ভরযোগ্য দলিলের প্রয়োজন। হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর সতর্কতা ও সচেতনতা একটি স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এই স্বীকৃত বাস্তবতার বিরুদ্ধে কোনো মত প্রদানের জন্য যে নির্ভরযোগ্য দলিলের প্রয়োজন উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের

সমাধান হলেই নিশ্চিতভাবে তা বলা সম্ভব হবে। কিন্তু এগুলোর সমাধান কোথায়?

বাকি থাকল দু'টি বিষয় :

ক. তাহলে এই পুস্তিকার রচয়িতা কে?

খ. এই পুস্তিকায় উল্লেখকৃত বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী হবে?

প্রথম জিজ্ঞাসার জবাব হল, অনেক চেষ্টা করেও পুস্তিকাটি কার রচনা– এটি উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যেমনি সম্ভব হয়নি এ বিষয়টিও উদ্ধার করা যে, কীভাবে এবং কোন্ জটিলতার কারণে এটি হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর দিকে সম্বন্ধিত হওয়া শুরু হল। আল্লাহর রহমতে হয়তো কখনও এমন কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, যার ভিত্তিতে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় বিষয়ে করণীয় হল, প্রত্যেক রেওয়ায়েত স্বতন্ত্রভাবে তাহকীক করে নেওয়া। 'মুনাব্বিহাত'-এ উল্লেখ থাকার কারণে কোনো রেওয়ায়েত যেমন বিনা-দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে না, তেমনি শুধু 'মুনাব্বিহাত'-এ আছে বলেই কোনো রেওয়ায়েতকে নির্দ্বিধায় মওযূ, মুনকার বা ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যাবে না। 'মুনাব্বিহাত'-এ আমরা কয়েকটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাও পেয়েছি। তাই স্বতন্ত্র তাহকীকের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضمیمہء متعلقہ بحث منبہات

از بندہ محمد عبدالمالک

"منبہات" عرب کے بعض دار النشر سے "الاستعداد لیوم المعاد" کے نام سے چھپی ہے، کسی سفر میں جب بعض غیر ذمے دار کتب خانے میں مجھے "الاستعداد" کا وہ مطبوعہ حافظ ابن حجر رح کی طرف منسوب نظر آیا، میں اسے دیکھتا رہا اور تعجب کرتا رہا کہ کس ظالم نے اسے حافظ ابن حجر رح کی طرف منسوب کیا، واپس آکر اس رسالے کی نسبت حافظ ابن حجر رح کی طرف باطل ہونے پر ایک مضمون لکھا تھا جو ماہ نامہ الکوثر میں چھپ چکا ہے۔

اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ "منبہات" الاستعداد ہی کا دوسرا نام ہے!! جب یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی رسالہ کے دو نام ہیں، تو استغراب ہونے لگا کہ پھر "منبہات" کا حوالہ حضرت شیخ الحدیث کاندھلوی رح کی کتاب میں کیسے آگیا، اگرچہ یہ حوالہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے؟! بعد میں حضرت رح کے مجموعۂ خطوط "کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات" مرتبہ مولانا سید محمد شاہد حفظہ اللہ مطالعہ کرنے کی نوبت آئی، اس میں منبہات کے بارے میں تین خطوط ملے، وہ پڑھنے کے بعد استغراب کم ہوگیا، اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت رح نے خود لکھا:

"منبہات ابن حجر ابتداءً اس وقت دیکھی تھی جب میری عمر بیس بائیس برس کی تھی، غالباً مطبع مجتبائی دہلی کی چھپی ہوئی تھی، اور اس پر مصنفہ ابن حجر عسقلانی یاد پڑتا ہے لکھا ہوا تھا، وہی ذہن میں ہے"۔
(کتب فضائل پر اشکالات ص ۱۶۸)

ابتداء سے چونکہ ذہن میں مجتبائی کے مطبوعہ کے اتباع میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ یہ ابن حجر رح کی تصنیف ہے، اس لئے اس کے خلاف کسی واضح دلیل کے بغیر حضرت اس سے رجوع نہ کر سکتے تھے،

افسوس جنہوں نے اس موضوع پر حضرت رح کے ساتھ مکاتبت کی ہے وہ مدلل اور محکم انداز سے اپنی بات پیش نہ کر سکے، ورنہ حضرت رح کو اپنے خیال پر کوئی اصرار نہیں تھا، حضرت رح نے خود لکھا: "نیز منبہات کا حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہونا مصر وہند ہر جگہ کی مطبوعات کی ابتداء میں مشہور چیز ہے، اس کے خلاف کے لئے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے... ، ایک معروف چیز کو محتمل سے رد کر دینا اب تک سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس پر اصرار نہیں کہ یہ حافظ ہی کی تالیف ہے، مگر وہاں اس مشہور کے رد کرنے کے واسطے کسی حجت کی ضرورت سمجھ رہا ہوں"۔ (ص ۲۱۵)

یہاں یہ تسامح ضرور ہو گیا کہ مطبوعہ کتاب کے سرورق پر کسی کا نام لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کو معروف و مشہور قرار دیا گیا، پھر اس شہرت کو صحت نسبت کی دلیل سمجھ لیا گیا، حالانکہ جو شہرت حجت ہے وہ مطبعی تشہیر کی شہرت نہیں، بلکہ اہل فن کے مابین تلقی وتداول والی شہرت ہے، جو یہاں مفقود ہے، چھپنے سے پہلے تو الگ رہا چھپنے کے بعد اکابر مصر وہند میں کتنوں نے اس کی تلقی کی، اس کے حوالے نقل کیے، ابن حجر کی طرف نسبت کی؟ ناشرین کی نسبت کر دینے سے نسبت کی شہرت ہو گئی، یہ بات متعدد ایسی کتابوں پر بھی صادق آتی ہے جو بالاجماع غیر مستند اور غیر صحیح النسبۃ ہیں۔

صرف بہشتی زیور میں ایک جگہ کتب نافعہ کے عنوان (کتب معتبرہ کے عنوان سے نہیں) سے اس رسالے کا نام آیا، لیکن وہاں بھی اسے ابن حجر رح کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، کتب نافعہ کی اس فہرست میں روایات کے لحاظ سے کمزور کئی رسالوں کے نام بھی آئے، اس لئے صرف اس فہرست میں منبہات کا نام آنے سے صاحب بہشتی زیور کی نظر میں اس کا مستند و معتبر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

اور حضرت رح نے ایک خط کے جواب میں ۱۵ شوال ۱۳۸۳ھ کو یہ تحریر فرمائی کہ: "البتہ یہ اشکال ضرور ہے کہ اس کی روایات حافظ کی شان کے مناسب نہیں، اگرچہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تصوف میں جا کر سب ہی حضرات ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ رسالہ تصوف ہی کا ہے"۔ (ص ۱۲۸)

یہ اشکال بہت اہم ہے، صحت نسبت کی کوئی دلیل موجود نہ ہونا مزید برآں یہ قوی اشکال، ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو عدم صحتِ نسبت کا جزم کیا جانا ہی دلیل کا تقاضا ہے، حافظ ابن حجر رح کی شان

کے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ تصوف میں ڈھیلے پڑ جائیں، ادعیہ واذکار پر نووی رح کی کتاب "الاذکار" کی تخریج "نتائج الافکار"، الخصال المکفرۃ، بذل الماعون في فضل الطاعون سمیت ان کی وہ کتابیں جو فضائل اور ترغیب وترہیب یابلفظ دیگر تصوف سے متعلق ہیں، مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ان میں بھی ان کی تحقیق وتخریج کاوہی اسلوب ہے جو فتح الباری اور التلخیص الحبیر میں ہے۔

میرا خیال ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس وقت اگر حضرت رح کی خدمت میں سلیقے کے ساتھ ٹھوس انداز سے اصل بات پیش کر دیتا تو حضرت رح ضرور رجوع فرمالیتے۔

تاہم چونکہ پوری مدلل بحث حضرت رح کے سامنے پیش نہیں کی گئی تھی اور اب حضرت رح ہمارے درمیان نہیں ہیں اس لئے ہم جزم کے ساتھ حضرت رح کی رائے کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اغلب یہ ہے کہ متعدد لوگوں کی مراجعت سے حضرت رح کو صحتِ نسبت میں شک ضرور پیدا ہو گیا تھا، جیسا کہ حضرت رح کے مذکورہ خطوط کو بتمام وکمال پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے۔

برادر عزیز مولوی حجت اللہ نے یہ مقالہ مجھے دکھایا، میں نے اسے ملاحظہ کیا، مجھے ان کا استدلال مضبوط معلوم ہوا، اور اسلوب وانداز بھی ماشاء اللہ ٹھوس اور جاذب، مگر چونکہ حضرت شیخ الحدیث رح کے خطوط کے مجموعی نتیجہ سے اس مقالے کا نتیجہ مختلف ہے اس لئے مجھے اسے شائع کرنے میں تردد ہوا، تاہم خیال آیا کہ اسے علمائے کرام اور تخصص کے طلبہ کی بحث ونظر کی خاطر اس تنبیہ کے ساتھ شائع کیا جا سکتا ہے، تاکہ اگر واقعۃً اس میں کوئی غلطی ہوگئی ہو تو ان کی نظر ثانی سے اس کی اصلاح ہو سکے، چنانچہ اللہ کے نام پر یہی کیا گیا. واللہ یعلم المصلح من المفسد.

بعد میں حضرت شیخ الحدیث رح کے شاگرد اور خلیفۂ مجاز شیخ یونس مظاہری دامت برکاتہم کا مضمون ان کی کتاب "الیواقیت الغالیۃ" ج ۱ ص ۴۴۱-۴۴۳ میں ملا ہے، جس میں انہوں نے مفصل بحث کے بعد لکھا ہے : "فالذي أجزم به أنها ليست من مؤلفات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى".

اس سے مولانا حجت اللہ کی تحقیق کی صحت پر مزید وثوق حاصل ہوا ہے، اللہ تعالی اسے نافع اور مقبول فرمائے، آمین۔

امید ہے کہ حضرات اہل علم ہمیں اپنے خیالات سے مطلع فرمائیں گے، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔

هذا، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وکتبہ العبد محمد عبد المالک

۲۶/۷/۱۴۳۶ھ

ثَبَتُ الْمَصَادِرِ

তথ্যপঞ্জি

তাফসীর ও উলূমুল কুরআন

اَلتَّفَاسِيْرُ وَعُلُوْمُ الْقُرْآنِ

১. তাফসীরে তাবারী = জামেউল বয়ান আন্ তা'ভীলি আয়িল কুরআন
মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত্তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) দারু আলামিল কুতুব, রিয়ায, সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি.

١. تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ = جَامِعُ الْبَيَانِ عَنْ تَأْوِيْلِ آيِ الْقُرْآنِ

২. তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম
আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেম (৩২৭ হি.) মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা আল্বায, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব, ১৪২৪ হি.

٢. تَفْسِيْرُ ابْنِ أَبِيْ حَاتِمٍ = تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ

৩. তাফসীরে ইবনুল মুনযির
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (৩১৮ হি.) দারুল মাআছির, সৌদি আরব ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি. = ২০০২ ঈ.

٣. تَفْسِيْرُ ابْنِ الْمُنْذِرِ

৪. তাফসীরে রাযী = মাফাতীহুল গাইব
ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪-৬০৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন ২য় সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৪ ঈ.

٤. تَفْسِيْرُ الرَّازِيِّ = مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ

৫. তাফসীরে কুরতুবী = আলজামে লি-আহকামিল কুরআন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আলকুরতুবী (৬৭১ হি.) মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন ১ম সংস্করণ ১৪২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.

٥. تَفْسِيْرُ اَلْقُرْطُبِيِّ = اَلْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ

৬. তাফসীরে নাসাফী = মাদারেকুত তানযীল ওয়া-হাকায়েকুত তা'ভীল
আবুল বারাকাত আন্নাসাফী (৭১০ হি.)
দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

٦. تَفْسِيْرُ النَّسَفِيِّ = مَدَارِكُ التَّنْزِيْلِ وَحَقَائِقُ التَّأْوِيْلِ

৭. আলবাহরুল মুহীত
আবু হাইয়ান আলআন্দালুসী (৭৪৫ হি.)
দারু ইহয়ায়িত তুরাস আলআরাবী, বৈরুত লেবানন, ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি.

٧. اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ

৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর
ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.)
দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন
২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

٨. تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ = تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ

৯. আদ্দুর্রুল মানছূর
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
মারকাযু হিজর লিল-বুহূস ওয়াদ-দিরাসাতুল আরাবিয়া ওয়াল-ইসলামিয়া, কায়রো, মিসর
১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি. = ২০০৩ ঈ.

٩. اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ

১০. রূহুল মাআনী
সাইয়িদ মাহমূদ আলূসী (১২৭০ হি.)
মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

١٠. رُوْحُ الْمَعَانِيْ

১১. তাফসীরুল কাসেমী = মাহাসেনুত তা'ভীল
মুহাম্মদ জামালুদ্দীন কাসেমী (১৩২২ হি.)
মুআসসাসাতু তারীখিল আরাবী, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

١١. تَفْسِيْرُ الْقَاسِمِيِّ= مَحَاسِنُ التَّأْوِيْلِ

১২. তাফসীরুল মারাগী
আহমদ মুস্তফা আলমারাগী (১৩৭১ হি.)
দারুল ফিক্র, বৈরুত, লেবানন

١٢. تَفْسِيْرُ الْمَرَاغِيْ

১৩. আযওয়াউল বয়ান ফী ঈযাহিল কুরআন বিল-কুরআন
মুহাম্মদ আমীন শিনক্বিতী (১৩৯৩ হি.)

١٣. أَضْوَاءُ الْبَيَانِ فِيْ إِيْضَاحِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
৩য় সংস্করণ, ১৪২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.

১৪. আত্তাফসীরুল ওয়াযিহ — ١٤. اَلتَّفْسِيْرُ الْوَاضِحُ
মুহাম্মদ মাহমূদ হিজাযী
দারুল জিল, বৈরুত, লেবানন

১৫. মাআরিজুত তাফাক্কুর — ١٥. مَعَارِجُ التَّفَكُّرِ وَدَقَائِقُ التَّدَبُّرِ
আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা
দারুল কলম, দামেস্ক
১ম সংস্করণ ১৪২০ হি. = ২০০০ ঈ.

১৬. হাদায়েকুর রূহ ওয়ার-রায়হান — ١٦. حَدَائِقُ الرُّوْحِ وَالرَّيْحَانِ
মুহাম্মদ আমীন বিন আবদুল্লাহ্ আলহারাবী
দারু তওকিন নাজাত, বৈরুত, লেবানন

১৭. আলইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর — ١٧. اَلْإِسْرَائِيْلِيَّاتُ وَالْمَوْضُوْعَاتُ فِيْ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ
ড. মুহাম্মদ আবু শাহবা (১৩৩২-১৪০৩ হি.)
মাকতাবাতুস সুন্নাহ্, কায়রো
৪র্থ সংস্করণ ১৪০৮ হি.

১৮. মাওসূআতুল ইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত, মুহাম্মদ আহমদ ঈসা — ١٨. مَوْسُوْعَةُ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ وَالْمَوْضُوْعَاتِ
দারুল গদ আল-জাদীদ
১ম সংস্করণ ১৪২৯ হি. = ২০০৮ ঈ.

১৯. তাফসীরে উসমানী — ١٩. تفسیر عثمانی المسمی: فوائد عثمانی
শাব্বীর আহমদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯হি.)
মাকতাবাতুল বুশরা, করাচি, পাকিস্তান
১৪৩০ হি.= ২০০৯ ঈ.

২০. মাআরেফুল কুরআন — ٢٠. تَفْسِيْرُ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ
মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-১৩৯৬ হি.)
ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি, পাকিস্তান
তবয়ে জাদীদ, ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

২১. তাফসীরে মাজেদী — ٢١. تفسیر ماجدی
আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (১৩৯৭ হি.)
মাজলিসে নাশরিয়াতে কুরআন

নাযেমাবাদ, করাচি, ১৪১৮ হি.= ১৯৯৮ ঈ.
২২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (উর্দু)
٢٢. تَفْسِيْرُ تَوْضِيْحِ الْقُرْآنِ
মাকতাবাতু মাআরেফুল কুরআন, করাচি
১৪৩০ হি. = ২০০৯ ঈ.
তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (অনূদিত)
মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা
১ম প্রকাশ ১৪৩১ হি. = ২০১০ ঈ.
২৩. কাছাছুল কুরআন
٢٣. قَصَصُ الْقُرْآنِ
হিফযুর রহমান (১৩১৮ হি.-১৩৮২ হি.)
ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর, করাচি
১৪২৬ হি. = ২০০৬ ঈ.

হাদীস
اَلْحَدِيْثُ

২৪. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক
٢٤. مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
ইমাম আবদুর রাযযাক (২১১ হি.)
আলমাজলিসুল ইলমী, ইদারাতুল কুরআন,
করাচি, পাকিস্তান
২য় সংস্করণ ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ ঈ.
২৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা
٢٥. مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ
আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবি শায়বা
(১৫৯ হি.-২৩৫ হি.) দারুল কিবলাহ ও
মুআস্সাসাতু উলূমুল কুরআন
১ম সংস্করণ ১৪২৭হি.= ২০০৬ ঈ.
২৬. মুসনাদে আহমদ
٢٦. مُسْنَدُ أَحْمَدَ
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১
হি.) মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪২৯ হি. = ২০০৮ ঈ.
২৭. সহীহ বুখারী
٢٧. صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ
মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (১৯৪-২৫৬
হি.) দারু তওকিন নাজাত, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪২২ হি. (হাদীস নম্বর ফুয়াদ
আবদুল বাকী কৃত ক্রমিক নম্বর অনুসারে)

২৮. সহীহ মুসলিম — ٢٨. صَحِيْحُ مُسْلِم
মুসলিম বিন হাজ্জাজ (২৬১ হি.)
শরহুন নববী-এর সঙ্গে সংযুক্ত মতন, দারুল
কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
(হাদীস নম্বর ফুয়াদ আবদুল বাকী কৃত)

২৯. সুনানে আবু দাউদ — ٢٩. سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ
সুলাইমান বিন আশআস সিজিস্তানী
(২০২-২৭৫ হি.)
(ক) দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, মক্কা
৩য় সংস্করণ ১৪৩১ হি. = ২০১০ ঈ.
(শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা-এর তাহকীক)
(খ) আররিসালাতুল আলামিয়া
বিশেষ সংস্করণ ১৪৩০ হি. = ২০০৯ ঈ.
(শুআইব আরনাউত-এর তাহকীক)

৩০. সুনানে তিরমিযী — ٣٠. سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ
আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী
(২০৯-২৭৯ হি.)
(ক) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
লেবানন (তাহকীক : আহমদ শাকের)
(খ) আররিসালাতুল আলামিয়া
১ম সংস্করণ ১৪৩০ হি. = ২০০৯ ঈ.
(গ) দারুল গরবিল ইসলামী
২য় সংস্করণ ১৯৯৮ ঈ.

৩১. সুনানে ইবনে মাজাহ — ٣١. سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ
কাযবিনী (২০৭-২৭৫ হি.)
দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী
সংস্করণ ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ ঈ.

৩২. সুনানে নাসায়ী — ٣٢. سُنَنُ النَّسَائِيِّ
আহমদ ইবনে শুআইব নাসায়ী (৩০৩ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া
হালাব, দামেস্ক, ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৪ হি.

৩৩. সহীহ ইবনে খুযায়মা ٣٣ . صَحِيْحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ
মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা (২২৩-৩১১ হি.) আলমাকতাবুল ইসলামী
৩য় সংস্করণ ১৪২৪ হি. = ২০০৩ ঈ.

৩৪. মুসনাদে আবু ইয়ালা ٣٤. مُسْنَدُ أَبِيْ يَعْلٰى
আবু ইয়ালা আলমাওসিলী (২১০-৩০৭ হি.) দারুল কিবলা, ১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি.

৩৫. মুসনাদে বাযযার = আলবাহরুয যাখখার, আবু বকর আহমদ ইবনে আমর (২৯২ হি.) ٣٥. مُسْنَدُ الْبَزَّارِ = اَلْبَحْرُ الزَّخَّارُ
মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল-হিকাম, সৌদি
সংস্করণ ১৪২৪ হি. = ২০০৩ ঈ.

৩৬. আলমু'জামুল কাবীর ٣٦. اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ
সুলাইমান ইবনে আহমদ তবারানী (২৬০-৩৬০ হি.) দারু ইহয়ায়িত তুরাস আলআরাবী, ২য় সংস্করণ

৩৭. আলমু'জামুল আওসাত ٣٧. اَلْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ
সুলাইমান ইবনে আহমাদ তবারানী (২৬০-৩৬০ হি.)
মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়ায, সৌদি
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

৩৮. সহীহ ইবনে হিব্বান ٣٨. صَحِيْحُ ابْنِ حِبَّانَ
মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)
মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন
৩য় সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৩৯. শুআবুল ঈমান ٣٩. شُعَبُ الْإِيْمَانِ
আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন বাইহাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি.)
(ক) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১০ হি. = ১৯৯০ ঈ.
(খ) মাকতাবাতুর রুশদ
১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি. = ২০০৩ ঈ.

৪০. বুলূগুল মারাম
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

٤٠. بُلُوْغُ الْمَرَامِ

৪১. তালখীসুল মুস্তাদরাক
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ যাহাবী (৭৪৮ হি.) (মুস্তাদ্‌রাক আলাস সহীহাঈন-এর সঙ্গে সংযুক্ত) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি.=১৯৯০ ঈ.)

٤١. تَلْخِيْصُ الْمُسْتَدْرَكِ

৪২. আততারগীব ওয়াত-তারহীব
আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী (৪৫৭-৫৩৫ হি.)
মুআস্‌সাসাতুল খাদামাতিত তিবাইয়া, বৈরুত, লেবানন
২য় সংস্করণ ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

٤٢. اَلتَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ

৪৩. মুসনাদুল ফারূক
ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর (৭০০-৭৭৪ হি.) দারুল ওয়াফা
২য় সংস্করণ ১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

٤٣. مُسْنَدُ الْفَارُوْقِ

শরহে হাদীস, উলূমুল হাদীস

شُرُوْحُ الْحَدِيْثِ، عُلُوْمُهُ

৪৪. আত্‌তামহীদ লিমা ফিল মুআত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল-আসানীদ
আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল বার্ (৩৬৮-৪৬৩ হি.)
১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ ঈ.

٤٤. اَلتَّمْهِيْدُ لِمَا فِي الْمُوَطَّأ مِنَ الْمَعَانِيْ وَالْأَسَانِيْدِ

৪৫. ইকমালুল মু'লিম
কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি.) দারুল ওয়াফা
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

٤٥. إِكْمَالُ الْمُعْلِم بِفَوَائِدِ مُسْلِم

৪৬. শরহু সহীহি মুসলিম
ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববী (৬৭৬ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

٤٦. شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم

৪৭. শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ
আলাউদ্দীন মুগলাতায় (৭৬২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪২৮ হি. = ২০০৭ ঈ.

٤٧. شَرْحُ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ

৪৮. ফাতহুল বারী
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
দারুর রাইয়ান লিত-তুরাস, কায়রো
২য় সংস্করণ ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

٤٨. فَتْحُ الْبَارِيْ

৪৯. ফয়যুল কাদীর শরহুল জামিয়িস সগীর
আব্দুর রউফ মুনাভী (১০৩১ হি.)
দারু ইহয়ায়িস সুন্নাতিন নববিয়া

٤٩. فَيْضُ الْقَدِيْرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ

৫০. আলফুতূহাতুর রব্বানিয়া
মুহাম্মদ ইবনে আল্লান (১০৫৭ হি.)
দারু ইহয়ায়িত তুরাস আলআরাবী
বৈরুত, লেবানন

٥٠. اَلْفُتُوْحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ

৫১. তাগলীকুত তা'লীক
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
আলমাকতাবুল ইসলামী

٥١. تَغْلِيْقُ التَّعْلِيْقِ

৫২. আওনুল মা'বূদ
শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

٥٢. عَوْنُ الْمَعْبُوْدِ

৫৩. ফতহুল মুলহিম
শাব্বীর আহমদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯ হি.) দারুল কলম, দামেস্ক
১ম সংস্করণ ১৪২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.

٥٣. فَتْحُ الْمُلْهِمِ

৫৪. আন্নুকাত আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) দারুর রায়াহ, রিয়ায, সৌদি
২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

٥٤. اَلنُّكَتُ عَلٰى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ

৫৫. ফতহুল মুগীস, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান সাখাবী (৯০২ হি.)
দারুল মিনহাজ, রিয়ায,১ম সংস্করণ ১৪২৬হি.

٥٥. فَتْحُ الْمُغِيْثِ

৫৬. শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার
মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
দারুল আরকাম ইবনে আবিল আরকাম
বৈরুত, লেবানন

٥٦. شَرْحُ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ

৫৭. আলইমাম আততিরমিযী ওয়া-
মানহাজুহূ ফী কিতাবিহিল জামি'
ড. আদাব মাহমুদ আলহামশ
দারুল ফাত্হ, ওমান, জর্ডান
১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি. = ২০০৩ ঈ.

٥٧. اَلْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَمَنْهَجُهُ فِيْ كِتَابِهِ الْجَامِع

সীরাত, তারীখ, তারাজিম

اَلسِّيْرَةُ وَالتَّارِيْخُ وَالتَّرَاجِمُ

৫৮. হিলয়াতুল আউলিয়া
আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (৪৩০ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

٥٨. حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ

৫৯. দালায়েলুন নুবুওয়াহ
ইমাম বাইহাকী, আবু বকর আহমদ ইবনে
হুসাইন (৩৮৪-৪৫৮ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

٥٩. دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ

৬০. তারীখে বাগদাদ
খতীব বাগদাদী, আবু বকর আহমদ ইবনে
আলী (৪৬৩ হি.)
মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো-এর
ফটোকপি সংস্করণ, দারুল ফিক্র, বৈরুত

٦٠. تَارِيْخُ بَغْدَادَ

৬১. আলইস্তিআব ফী মারিফাতিল আসহাব
ইমাম ইবনে আবদুল বার্, আবু উমর
ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ (৪৬৩ হি.)
দারুল জিদ, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

٦١. اَلْإِسْتِيْعَابُ فِيْ مَعْرِفَةِ الْأَصْحَابِ

৬২. তারীখে দামেস্ক
ইমাম ইবনে আসাকির, আবুল কাসেম

٦٢. تَارِيْخُ دِمَشْقَ

আলী ইবনে হাসান (৪৯৯-৫৭১ হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ ঈ.

৬৩. উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা — ٦٣. أُسْدُ الْغَابَةِ
ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর (৫৫৫-৬৩০ হি.)
দারুল মারিফাহ, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৬৪. তারীখুল ইসলাম — ٦٤. تَارِيْخُ الْإِسْلَامِ
শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ
(৭৪৮ হি.) দারুল গরবিল ইসলামী
১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি. = ২০০৩ ঈ.

৬৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা — ٦٥. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ
শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ
(৭৪৮ হি.) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৬৬. আল-ওয়াফী বিল-ওফায়াত — ٦٦. اَلْوَافِيْ بِالْوَفَيَاتِ
সালাহুদ্দীন খলিল ইবনে আইবেক সফাদী
(৭৬৪ হি.) দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল
আরাবী, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হি.

৬৭. তবাকাতুশ শাফিয়িয়াতিল কুবরা — ٦٧. طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرٰى
তাজুদ্দীন সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি.)
দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া

৬৮. আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া — ٦٨. اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ
ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি.)
দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪২৮ হি. = ২০০৭ ঈ.

৬৯. জামিউল আছার ফী মাওলিদিন নাবিয়্যিল মুখতার — ٦٩. جَامِعُ الْآثَارِ فِيْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ
ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেস্কী, মুহাম্মদ ইবনে
আবদুল্লাহ (৮৪২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ২০০৯ ঈ.

৭০. যাইলু তবাকাতিল হানাবেলা
ইবনে রজব, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ
(৭৯৫ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া,
বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি.

٧٠. ذَيْلُ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ

৭১. যাদুল মাআদ ফী হাদ্য়ি খাইরিল ইবাদ
ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর
(৬৯১-৭৫১ হি.)
মুআসসাসাতুর রিসালা
৩য় সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

٧١. زَادُ الْمَعَادِ فِيْ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ

৭২. আলইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা
ইবনে হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনে
আলী (৭৭৩-৮৫২ হি.) দারুল জিল,
বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

٧٢. اَلْإِصَابَةُ فِيْ تَمْيِيْزِ الصَّحَابَةِ

৭৩. আযযাওউল লামি‘
হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.)
দারুল জিল, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

٧٣. اَلضَّوْءُ اللَّامِعُ

৭৪. হুসনুল মুহাযারা ফী তারীখি মিসর
ওয়াল-কাহেরা
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
আলমাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৪ ঈ.

٧٤. حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ

৭৫. লাহ্যুল আলহায বি-যাইলি
তবাকাতিল হুফফায, তকীউদ্দীন মুহাম্মাদ
ইবনে ফাহাদ (৮৭১ হি.)
দারু ইহয়ায়িত তুরাস
(ফটোকপি সংস্করণ)

٧٥. لَحْظُ الْأَلْحَاظِ بِذَيْلِ طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ

৭৬. নাযমুল ইকয়ান ফী আয়ানিল আয়ান
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
আলমাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত
(আলমাকতাতুশ শামেলা)

٧٦. نَظْمُ الْعِقْيَانِ فِيْ أَعْيَانِ الْأَعْيَانِ

٧٧. اَلْجَوَاهِرُ وَالدُّرَرُ فِيْ تَرْجَمَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ حَجَرٍ

৭৭. আলজাওয়াহের ওয়াদ-দুরার
শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.)
দারু ইবনে হায্‌ম, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ ঈ.

٧٨. اَلتِّبْرُ الْمَسْبُوْكُ فِيْ ذَيْلِ الْمُلُوْكِ

৭৮. আত্‌তিব্‌রুল মাসবূক
শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.)
মাকতাবাতুল কুল্লিয়া আলআযহারিয়া, কায়রো, মিসর

٧٩. إِنْبَاءُ الْغُمْرِ بِأَبْنَاءِ الْعُمْرِ

৭৯. ইনবাউল গুমরি বি-আবনাইল উমরি
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনে আলী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
(ক) দায়েরাতুল মাআরেফ, ১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ ঈ. (ফটোকপি সংস্করণ)
(খ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ ঈ.

٨٠. اِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَدِرَاسَةُ مُصَنَّفَاتِهِ وَمَنْهَجِهِ وَمَوَارِدِهِ فِيْ كِتَابِهِ الْإِصَابَةِ

৮০. ইবনে হাজার আসকালানী ওয়া-দিরাসাতু মুসান্নাফাতিহী
ড. শাকের মাহমুদ আব্দুল মুনঈম
দারুর রিসালা, বাগদাদ

٨١. اَلرِّيَاضُ النَّضِرَةُ

৮১. আররিয়াযুন নাদিরা
মুহিব্ব তবারী (৬৭৪ হি.)
দারুন নদওয়া আলজাদীদা, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

٨٢. شَذَرَاتُ الذَّهَبِ فِيْ أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ

৮২. শাযারাতুয যাহাব
ইবনুল ইমাদ, আবদুল হাই ইবনুল ইমাদ (১০৮৯হি.) দারুল মাসিরা, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ ঈ.

٨٣. اَلْبَدْرُالطَّالِعُ بِمَحَاسِنِ مَنْ بَعْدَ الْقَرْنِ التَّاسِعِ

৮৩. আলবাদরুল তালি' বি-মাহাসিনি মান বা'দাল কারনিত তাসি'
মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী (১২৫০ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

৮৪. আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাস্তাল্লানী (৮৫১-৯২৩ হি.) আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত
১য় সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৪ ঈ.

٨٤. اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ

৮৫. শরহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া
মুহাম্মদ যুরকানী (১১২২হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

٨٥. شَرْحُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ

৮৬. আলমা'দিনুল আদানী
মোল্লা আলী কারী, পাণ্ডুলিপি

٨٦. اَلْمَعْدِنُ الْعَدَنِيُّ فِيْ فَضْلِ أُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ

৮৭. আল্আ'লাম
খাইরুদ্দীন যিরিক্লী (১৩১০-১৩৯৬ হি.)
দারুল ইলম লিল-মালাইন, বৈরুত,
লেবানন, ১২তম সংস্করণ ১৯৯৭ ঈ.

٨٧. اَلْأَعْلَامُ

৮৮. শাওয়াহিদুন নুবুওয়াহ
আবদুর রহমান জামী
অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

٨٨. شَوَاهِدُ النُّبُوَّةِ

৮৯. সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, মুহাম্মদ আলহাসানী (১৩৯৯ হি.)
মাকতাবাতু দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, ১৯৬৪ ঈ.

٨٩. سیرت سید محمد علی مونگیری

৯০. তাযকিরায়ে ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী
আবুল হাসান আলী নদবী (১৪২০ হি.)
মজলিসে সাহাফাত ও নাশরিয়াতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাক্ষ্মৌ

٩٠. تذکرۂ فضل الرحمن گنج مرادآبادی

আসমাউর রিজাল

أَسْمَاءُ الرِّجَالِ

৯১. আততারীখুল কাবীর
ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.)
দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া

٩١. اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ

হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, হিন্দুস্তান
১ম সংস্করণ

৯২. আলজারহু ওয়াত-তা'দীল — ٩٢. اَلْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ
আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেম (৩২৭ হি.) দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া
হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, হিন্দুস্তান
১ম সংস্করণ

৯৩. আযযুআফাউল কাবীর — ٩٣. اَلضُّعَفَاءُ الْكَبِيْرُ
আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আমর উকাইলী (৩২২ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ ১৪১৮ হি.

৯৪. আল্‌মাজরূহীন — ٩٤. اَلْمَجْرُوْحِيْنَ
মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান আলবুসতী (৩৫৪ হি.) দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন
১৪১২ হি. = ১৯৯২ ঈ.

৯৫. আলকামিল ফী যুআফায়ির রিজাল — ٩٥. اَلْكَامِلُ فِيْ ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ
আবদুল্লাহ ইবনে আদী (৩৬৫ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৯৬. আলমুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক — ٩٦. اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ
খতীব বাগদাদী আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী (৪৬৩ হি.) দারুল কারী, দামেস্ক
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

৯৭. মীযানুল ইতিদাল — ٩٧. مِيْزَانُ الْاِعْتِدَالِ فِيْ نَقْدِ الرِّجَالِ
শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (৭৪৮ হি.)
(ক) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ ঈ.
(খ) দারুল ফিক্‌র
তাহকীক : আলী মুহাম্মদ আলবাজাবী

৯৮. তাহযীবুল কামাল — ٩٨. تَهْذِيْبُ الْكَمَالِ
জামালুদ্দীন মিযযী (৬৫৪-৭৪২ হি.)

মুআসসাসাতুর রিসালা
৫ম সংস্করণ ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ ঈ.

৯৯. তাহযীবুত তাহযীব — ٩٩. تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْبِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
দায়েরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ,
হিন্দুস্তান, ১ম সংস্করণ ১৩২৫ হি.

১০০. তাকরীবুত তাহযীব — ١٠٠. تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

১০১. তা'জীলুল মানফাআ — ١٠١. تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

১০২. তাবসীরুল মুনতাবিহ — ١٠٢. تَبْصِيْرُ الْمُنْتَبِهِ بِتَحْرِيْرِ الْمُشْتَبِهِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
আলমাক্তাবাতুল ইসলামিয়া, বৈরুত

১০৩. লিসানুল মীযান — ١٠٣. لِسَانُ الْمِيْزَانِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া
হালাব, ১৪২৩ হি. = ২০০২ ঈ.

১০৪. মাসায়েলুল ইমাম আহমদ — ١٠٤. مَسَائِلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيْ دَاوُدَ
সংকলন : আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হি.)
মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া
১৪২০ হি. = ১৯৯৯ ঈ.

তাখরীজে হাদীস, ইলালে হাদীস

تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ وَعِلَلُ الْأَحَادِيْثِ وَكُتُبُ الزَّوَائِدِ

১০৫. ইলালু ইবনে আবি হাতেম — ١٠٥. عِلَلُ ابْنِ أَبِيْ حَاتِمٍ
আবদুর রহমান ইবনে আবি হাতেম (২৪০-৩২৭ হি.)
মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ

আলওয়াতানিয়া
১ম সংস্করণ ১৪২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.

১০৬. আলমুনতাখাব মিনাল ইলাল ١٠٦. اَلْمُنْتَخَبُ مِنَ الْعِلَلِ لِلْخَلَّالِ
ইবনে কুদামা মাকদিসী, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (৫৪১-৬২০ হি.) দারুর রায়াহ
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

১০৭. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ١٠٧. اَلْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ
ইমাম ইবনুল জাওযী, আবদুর রহমান ইবনে আলী (৫১০-৫৯৭ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ ঈ.

১০৮. তালখীসুল ইলালিল মুতানাহিয়া ١٠٨. تَلْخِيْصُ الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ
শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (৭৪৮ হি.) মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়ায
১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

১০৯. নাসবুর রায়াহ ١٠٩. نَصْبُ الرَّايَةِ
জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ যাইলাঈ (৭৬২ হি.) দারুল কিবলা
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

১১০. আলমুগনী আন হামলিল আসফার ١١٠. اَلْمُغْنِيْ عَنْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ فِي الْأَسْفَارِ
(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-এর সঙ্গে সংযুক্ত)
হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬ হি.)
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

১১১. আলবাদরুল মুনীর ١١١. اَلْبَدْرُ الْمُنِيْرُ
ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, ওমর ইবনে আলী (৭২৩-৮০৪ হি.)
দারুল হিজরা, রিয়ায, সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৫ ঈ.

১১২. নাতায়েজুল আফকার ١١٢. نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪২৯ হি. = ২০০৮ ঈ.

১১৩. আত্‌তালখীসুল হাবীর
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
আযওয়াউস সালাফ, রিয়ায, সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪২৮ হি. = ২০০৭ ঈ.

١١٣. اَلتَّلْخِيْصُ الْحَبِيْرُ

১১৪. ইত্‌হাফুল খিয়ারা
(আল্‌মাতালিবুল আলিয়া'য় সংযুক্ত)
আহমদ ইবনে আবু বকর বূসীরী (৮৪০হি.)
মুআস্‌সাসাতু কুরতুবা
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

١١٤. إِتْحَافُ الْخِيَرَةِ الْمَهَرَةِ

১১৫. তাখরীজু আহাদীসি শরহিল আকায়েদ
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.) পাণ্ডুলিপি

١١٥. تَخْرِيْجُ أَحَادِيْثِ شَرْحِ الْعَقَائِدِ

১১৬. ফারায়েদুল কালায়েদ আলা আহাদীসি শরহিল আকায়েদ
মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
আলমাকতাবুল ইসলামী
১ম সংস্করণ ১৪১০ হি. = ১৯৯০ ঈ.

١١٦. فَرَائِدُ الْقَلَائِدِ عَلٰى أَحَادِيْثِ شَرْحِ الْعَقَائِدِ

১১৭. আল-মুদাভী লি-ইলালিল জামিইস সগীর, আহমদ ইবনে সিদ্দীক গুমারী (১৩৮০ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ

١١٧. اَلْمُدَاوِيْ لِعِلَلِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَشَرْحَيِ الْمُنَاوِيْ

১১৮. আনীসুস সারী
নাবিল ইবনে মানসুর
মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪২৬ হি. = ২০০৫ ঈ.

١١٨. أَنِيْسُ السَّارِيْ فِيْ تَخْرِيْجِ وَتَحْقِيْقِ الْأَحَادِيْثِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِيْ فَتْحِ الْبَارِيْ

১১৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া-মানবাউল ফাওয়ায়েদ
নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭ হি.)
দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন
১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

١١٩. مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ

দুআ-দরূদ-আকীদা

كُتُبُ الْأَدْعِيَةِ وَالْعَقَائِدِ

১২০. আমালুল য়াওমি ওয়াল-লাইলা
আহমদ ইবনে শুআইব নাসায়ী (৩০৩ হি.)
মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ ঈ.

١٢٠. عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِلنَّسَائِيِّ

১২১. আমালুল য়াওমি ওয়াল-লাইলা
ইবনুস সুন্নী, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ
(৩৬৪হি.) দারুল কিবলা, জেদ্দা

١٢١. عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِابْنِ السُّنِّيِّ

১২২. কিতাবুদ দুআ
সুলাইমান ইবনে আহমদ তবারানী (২৬০-
৩৬০ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত,
১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

١٢٢. كِتَابُ الدُّعَاءِ

১২৩. আল্‌আযকার
ইমাম নববী, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ (৬৭৬
হি.) দারুল হিজরা, দামেস্ক
১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ ঈ.

١٢٣. اَلْأَذْكَارُ

১২৪. আল্‌ওয়াবিলুস সায়্যিব ওয়া-
রাফিউল কালিমিত তায়্যিব
ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর
(৬৯১-৭৫১ হি.)
দারু আলামিল ফাওয়ায়েদ, মক্কা
২য় সংস্করণ ১৪২৭ হি.

١٢٤. اَلْوَابِلُ الصَّيِّبُ وَرَافِعُ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ

১২৫. হিয্‌বুল বাহর (মুনাজাতে মকবুলের সঙ্গে) আলী ইবনে আবদুল্লাহ শাযিলী (৬৫৬ হি.) হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী (ফটোকপি সংস্করণ) বাংলাবাজার, ঢাকা

١٢٥. حِزْبُ الْبَحْرِ

১২৬. আল্‌হিযবুল আযম
মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
মাজলিসুদ্‌ দাওয়াতি ওয়াত-তাহকীক,
আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী টাউন, করাচি

١٢٦. اَلْحِزْبُ الْأَعْظَمُ

১২৭. মুনাজাতে মকবুল

١٢٧. مناجات مقبول

আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী (ফটোকপি
সংস্করণ) বাংলাবাজার, ঢাকা

১২৮. মুহাজুদ দাওয়াত ওয়া-মানহাজুল
ইবাদাত, রযিউদ্দীন ইবনে তাউস (৫৮৯-
৬৬৪ হি.) মুআসসাসাতুল আ'লামী লিল-
মাতবূআত, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

١٢٨. مُهَجُ الدَّعَوَاتِ وَمَنْهَجُ الْعِبَادَاتِ

১২৯. আলকওলুল বাদী' ফিস সালাত
আলাল হাবীবিশ শাফী', মুহাম্মদ ইবনে
আবদুর রহমান সাখাবী (৮৩১-৯০২ হি.)
মুআস্‌সাসাতুর রাইয়ান
১ম সংস্করণ ১৪২২ হি. = ২০০২ ঈ.

١٢٩. اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ

১৩০. সাআদাতুদ দারাইন ফিস সালাত
আলা সাইয়িদিল কাওনাইন
ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নাবহানী (১২৬৫-
১৩৫০ হি.) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪২৬-২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.

١٣٠. سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ

আকায়েদ

كُتُبُ الْعَقَائِدِ

১৩১. শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ
ওয়াল-জামাআ
আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ ইবনে হাসান
লালিকায়ী (৪১৮ হি.) দারু তাইবা, রিয়ায
৫ম সংস্করণ ১৪১৮ হি.

١٣١. شَرْحُ أُصُوْلِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

১৩২. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম
ইবনে তাইমিয়া, আহমদ ইবনে আবদুল
হালীম (৭২৮ হি.)
মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়ায, সৌদি আরব
৫ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

١٣٢. اِقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

১৩৩. বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়া
ইবনে তাইমিয়া, আহমদ ইবনে আবদুল

١٣٣. بَيَانُ تَلْبِيْسِ الْجَهْمِيَّةِ

হালীম (৭২৮ হি.)
আদদারুল উসমানিয়া, জর্ডান
১ম সংস্করণ ১৪২৯ হি. = ২০০৮ ঈ.

মওযূ ও জাল হাদীস বিষয়ক

كُتُبُ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ

১৩৪. কিতাবুল মাওযূআত
ইবনুল জাওযী, আবুল ফরয আবদুর রহমান
(৫৯৭ হি.) আযওয়াউস সালাফ, রিয়ায,
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

١٣٤. كِتَابُ الْمَوْضُوْعَاتِ

১৩৫. রিসালাতুল মাওযূআত
হাসান ইবনে মুহাম্মদ সাগানী (৬৫০ হি.)
মাতবায়ে বারোনিয়া, মিসর

١٣٥. رِسَالَةُ الْمَوْضُوْعَاتِ

১৩৬. আল্‌আবাতীল ওয়াল-মানাকীর
ওয়াস-সিহাহ ওয়াল-মাশাহীর
হুসাইন ইবনে ইবরাহীম জাওরাকানী (৫৪৩
হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪২২হি. = ২০০১ ঈ.

١٣٦. اَلْأَبَاطِيْلُ وَالْمَنَاكِيْرُ
وَالصِّحَاحُ وَالْمَشَاهِيْرُ

১৩৭. আহাদীসু মুখতারাহ মিন
মাওযূআতিল জাওরাকানী, ওয়া-ইবনুল
জাওযী, শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে
আহমাদ (৭৪৮ হি.)

١٣٧. أَحَادِيْثُ مُخْتَارَةٌ مِنْ
مَوْضُوْعَاتِ الْجَوْرَقَانِيِّ

১৩৮. তালখীসুল মাওযূআত
শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ
(৭৪৮ হি.) মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়ায

١٣٨. تَلْخِيْصُ الْمَوْضُوْعَاتِ

১৩৯. আল্‌মানারুল মুনীফ ফিস সহীহি
ওয়ায-যয়ীফ, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মদ
ইবনে আবি বকর (৬৯১-৭৫১ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া
হালাব, সিরিয়া, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪ হি.

١٣٩. اَلْمَنَارُ الْمُنِيْفُ فِي
الصَّحِيْحِ وَالضَّعِيْفِ

১৪০. আললাআলিল মাসনূআ
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন

١٤٠. اَللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةُ فِي
الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ

১৪১. যাইলুল লাআলিলি মাসনূআ
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ
১ম সংস্করণ ১৪৩১ হি. = ২০১০ ঈ.

١٤١. ذَيْلُ اللَّآلِي الْمَصْنُوْعَةِ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ

১৪২. তাযকিরাতুল মাওযূআত
মুহাম্মদ তাহের ইবনে আলী পাটনী (৯৮৬ হি.) দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী
বৈরুত, ৩য় সংস্করণ ১৪১৫হি.= ১৯৯৫ ঈ.

١٤٢. تَذْكِرَةُ الْمَوْضُوْعَاتِ

১৪৩. তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ
আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আররাক (৯০৭-৯৬৩ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪০১ হি. = ১৯৮১ ঈ.

١٤٣. تَنْزِيْهُ الشَّرِيْعَةِ الْمَرْفُوْعَةِ

১৪৪. আল্মাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ, মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া
হালাব, ৫ম সংস্করণ ১৪১৪ হি.= ১৯৯৪ঈ.

١٤٤. اَلْمَصْنُوْعُ فِيْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ

১৪৫. আলআসরারুল মারফূআ
মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

١٤٥. اَلْأَسْرَارُ الْمَرْفُوْعَةُ

১৪৬. আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ
মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী (১২৫০ হি.)
(ক) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
(খ) মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা আলবায
রিয়াদ, ২য় সংস্করণ ১৪২১ হি.= ২০০০ ঈ.

١٤٦. اَلْفَوَائِدُ الْمَجْمُوْعَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ

১৪৭. আল লু'লুউল মারসূ
মুহাম্মদ আবুল হাসান কাউকজী (১৩০৫ হি.) মাতবায়ে বারোনিয়া, মিসর

١٤٧. اَللُّؤْلُؤُ الْمَرْصُوْعُ

১৪৮. আলমুগীর আলাল আহাদীসিল মাওযূআ, আহমদ ইবনে সিদ্দীক গুমারী
(১৩৮২ হি.) মাকতাবাতুল কাহেরা
১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ ঈ.

١٤٨. اَلْمُغِيْرُ عَلَى الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ

১৪৯. আলআসারুল মারফূআ
আবদুল হাই ইবনে আবদুল হালিম
লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ ঈ.

١٤٩. اَلْآثَارُ الْمَرْفُوْعَةُ فِي الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوْعَةِ

১৫০. আসনাল মাতালিব
মুহাম্মদ বিন দরবেশ হূত (১২৭৬ হি.)
দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ ঈ.

١٥٠. أَسْنَى الْمَطَالِبِ

১৫১. সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল-মাওযূআ, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৩৩২-১৪২০ হি.)
মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়ায
২য় সংস্করণ ১৪২০ হি. = ২০০০ ঈ.

١٥١. سِلْسِلَةُ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالْمَوْضُوْعَةِ

১৫২. প্রচলিত জাল হাদীস ১ম খণ্ড
মাওলানা মুতীউর রহমান
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি. = ২০০৩ ঈ.

١٥٢. اَلْأَحَادِيْثُ الْمَوْضُوْعَةُ الرَّائِجَةُ

লোকমুখে প্রসিদ্ধ হাদীসবিষয়ক

كُتُبُ الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ

১৫৩. আত্তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশ্তাহিরা, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি. = ১৯৮৮ ঈ.

١٥٣. اَلتَّذْكِرَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُشْتَهِرَةِ

১৫৪. আলমাকাসিদুল হাসানা
শামসুদ্দীন যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (৯০২ হি.) দারুল কিতাবিল আরাবী, লেবানন, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি.

١٥٤. اَلْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ

১৫৫. আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা
জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আবদুর রহমান (৯১১ হি.) মাকতাবাতুল ওররাক, রিয়ায

١٥٥. اَلدُّرَرُ الْمُنْتَثِرَةُ

১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

১৫৬. কাশফুল খাফা ওয়া-মুযীলুল ইলবাস আম্মাশ তাহারা মিনাল আহাদীস আলা আল্‌সিনাতিন নাস, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আজলূনী (১১৬২ হি.)

১٥٦. كَشْفُ الْخَفَاءِ وَمُزِيْلُ الْإِلْبَاسِ عَمَّا اشْتَهَرَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ عَلٰى أَلْسِنَةِ النَّاسِ

(ক) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ ঈ.
(খ) মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত
৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ ঈ.

ফিকহ, ফাতাওয়া, উসূলে ফিকহ

كُتُبُ الْفِقْهِ وَالْفَتَاوٰى وَالْأُصُوْلِ

১৫৭. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া
আহমদ ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.)
দারু আলামুল কুতুব, রিয়ায, সৌদি আরব
১৪১২ হি. = ১৯৯১ ঈ.

١٥٧. مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى ابْنِ تَيْمِيَةَ

১৫৮. ফাতহুল কাদীর
কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ (৮৬১ হি.) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন
দ্বিতীয় সংস্করণ

١٥٨. فَتْحُ الْقَدِيْرِ

১৫৯. আলইন্‌সাফ ফী মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ
আলাউদ্দীন আলী ইবনে সুলাইমান (৮৮৫ হি.) দারু ইহ্‌য়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ

١٥٩. اَلْإِنْصَافُ فِيْ مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلَافِ

১৬০. আল্‌বাহরুর রায়েক শরহু কানযিদ দাকায়েদ, ইবনে নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ (৯৭০ হি.)
মাকতাবায়ে রশীদিয়া (ফটোকপি সংস্করণ)

١٦٠. اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ

১৬১. আল্‌হাভি লিল-ফাতাওয়া
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)
আস্‌সালাম আল-আমিরিয়া, কায়রো

١٦١. اَلْحَاوِيْ لِلْفَتَاوِيْ

১৬২. আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়া ١٦٢. اَلْفَتَاوَى الْحَدِيْثِيَّةُ
ইবনে হাজার হাইতামী, আবুল আব্বাস
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (৯০৯-৯৭৪ হি.)
দারুত তাকওয়া, ১ম সংস্করণ ১৪২৮ হি.
১৬৩. আল-আজবিবাতুল মারযিয়া ١٦٣. اَلْأَجْوِبَةُ الْمَرْضِيَّةُ
শামসুদ্দীন সাখাবী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর
রহমান (৯০২ হি.) দারুর রায়াহ, রিয়ায
১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি.
১৬৪. আন্নাহরুল ফায়েক ١٦٤. اَلنَّهْرُ الْفَائِقُ
সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে
নুজাইম (১০০৫ হি.)
মাকতাবাতু দারিল আয়মান, সাহারানপুর
১ম সংস্করণ ১৪২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.
১৬৫. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ١٦٥. حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلَاحِ
ফালাহ, আহমদ ইবনে ইসমাঈল তাহতাবী
(১২৩১ হি.) দারুল কিতাব, দেওবন্দ
(ফটোকপি সংস্করণ)
১৬৬. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল ١٦٦. حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ
মুখতার, আহমদ ইবনে ইসমাঈল তাহতাবী
(১২৩১ হি.) মাকতাবায়ে রশীদিয়া,
পাকিস্তান
১৬৭. রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়া শামী) ١٦٧. رَدُّ الْمُحْتَارِ
আমীন ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ ঈ.
১৬৮. মাজমূআয়ে ফাতাওয়া আবদুল হাই ١٦٨. مجموعہ فتاوی عبد الحی اللکنوي
লাখনোভী (১৩০৪ হি.)
এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, আদব মনযিল
পাকিস্তান চক, করাচি
১৬৯. ফাতাওয়া রশীদিয়া ١٦٩. فتاوی رشیدیہ
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (১২৪৪-১৩২৩ হি.)
মাকতাবায়ে ফকীহুল উম্মত, দেওবন্দ

(তাহকীক ও তা'লীক : মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ তাওদী)

১৭০. ইমদাদুল ফাতাওয়া
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)
মাকতাবাতু দারিল মাআরিফ, করাচি
সংস্করণ ১৪৩১ হি. = ২০১০ ঈ.

١٧٠. امدادالفتاوی

১৭১. ইমদাদুল আহকাম
যফর আহমদ উসমানী (১৩৯৪ হি.)
যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ
(অধ্যায় বিন্যাস : মাহমূদ আশরাফ উসমানী)

١٧١. امدادالاحکام

১৭২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (১৪১৭ হি.) মাকতাবায়ে মাহমূদিয়া
(নতুন বিন্যাস : মুহাম্মদ ফারূক)

١٧٢. فتاوی محمودیہ

তাসাওউফ ও মাওয়ায়েয

اَلتَّصَوُّفُ وَالْمَوَاعِظُ

১৭৩. কিতাবুয যুহ্দ
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) দারুর রাইয়ান লিত-তুরাস, কায়রো
১ম সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ ঈ.

١٧٣. كِتَابُ الزُّهْدِ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ

১৭৪. কিতাবুয যুহ্দ
আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশআস সিজিস্তানী (২০২-২৭৫ হি.)
দারুল মিশকাত, কায়রো
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ ঈ.

١٧٤. كِتَابُ الزُّهْدِ لِلإِمَامِ أَبِيْ دَاوُدَ

১৭৫. কিতাবুয যুহ্দ
হান্নাদ ইবনে সারী (১৫২-২৪৩ হি.)
দারুল খুলাফা, কুয়েত, ১ম সংস্করণ ১৪০৬হি.

١٧٥. كِتَابُ الزُّهْدِ لِهَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ

১৭৬. কিতাবুয যুহ্দ
আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবি আসেম (২৮৭ হি.)
আদ্দারুস সালাফিয়া, বোম্বাই, ভারত
২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ ঈ.

١٧٦. كِتَابُ الزُّهْدِ لِابْنِ أَبِيْ عَاصِمٍ

১৭৭. রিসালাতুল মুস্তারশিদীন
آ١٧٧. رِسَالَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ
আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবী (১৬৫-২৪৩ হি.)
মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হালাব
১১তম সংস্করণ ১৪২৬ হি. = ২০০৫ ঈ.

১৭৮. আল্‌আদাবুল মুফরাদ
١٧٨. اَلْأَدَبُ الْمُفْرَدُ
ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত
৪র্থ সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ ঈ.

১৭৯. জুয্‌উ ইবনে আসাকির ফী ফাযলি রজব (ইবনে দিহ্‌ইয়া কালবী রচিত 'আদাউ মা ওয়াজাব'এর সঙ্গে সংযুক্ত)
١٧٩. جُزْءُ ابْنِ عَسَاكِرَ فِيْ فَضْلِ رَجَبَ
আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে আসাকির (৫৭১ হি.)
মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৪২১ হি. = ২০০০ ঈ.

১৮০. ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন
١٨٠. إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ
ইমাম গাযযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ (৫০৫ হি.)
মাকতাবাতুল ঈমান, কায়রো
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ ঈ.

১৮১. মাদারিজুস সালেকীন
١٨١. مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ بَيْنَ مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.)
দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত
২য় সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

১৮২. লাতায়েফুল মাআরেফ ফী-মা লি-মাওয়াসিমিল আম' মিনাল ওযায়েফ
١٨٢. لَطَائِفُ الْمَعَارِفِ فِيْمَا لِمَوَاسِمِ الْعَامِ مِنَ الْوَظَائِفِ
ইবনে রজব, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ (৭৯৫ হি.) দারু ইবনে কাসীর, ৭ম সংস্করণ ১৪২৪হি.= ২০০৩ ঈ.

১৮৩. ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন
١٨٣. إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِيْنَ
মুরতাযা যাবিদী, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ

بِشَرْحِ أَسْرَارِ إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ	(১২০৫ হি.) দারুল ফিক্‌র (ফটোকপি সংস্করণ)
١٨٤. تَرْبِيَةُ السَّالِكِ	১৮৪. তারবিয়াতুস সালেক আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.) দারুল ইশাআত, উর্দু বাজার, করাচি
١٨٥. کمالات اشرفیہ	১৮৫. কামালাতে আশরাফিয়া সংকলক : ঈসা ইলাহাবাদী (১৩৬৩ হি.) ইদারায়ে তালীফাতে আশরাফিয়া, থানাভবন প্রকাশকাল : ১৪১২ হি.
١٨٦. مکتوبات شیخ الاسلام (حسین احمد مدنی)	১৮৬. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (১৩৭৭ হি.) মাকতাবায়ে দ্বীনিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর (বিন্যাস : নাজমুদ্দীন ইসলাহী) প্রকাশকাল : ২০০৪ ঈ.
١٨٧. اصلاحی خطبات	১৮৭. ইসলাহী খুতুবাত মুহাম্মদ তাকী উসমানী (বিন্যাস : আবদুল্লাহ মায়মান) মায়মান ইসলামিক পাবলিশার্স, করাচি
اَلْمُتَفَرِّقَاتُ	**বিবিধ**
١٨٨. اَلْمُجَالَسَةُ وَجَوَاهِرُ الْعِلْمِ	১৮৮. আলমুজালাসা ওয়া-জাওয়াহিরুল ইলম, আহমদ ইবনে মারওয়ান দিনাওয়ারী (৩৩৩ হি.) দারু ইবনে হায্‌ম, বৈরুত ১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.
١٨٩. كِتَابُ الْعَظَمَةِ	১৮৯. কিতাবুল আযামা আবুশ শায়খ আসবাহানী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (২৭৪-৩৬৯ হি.) দারুল আসেমা, রিয়ায, সৌদি আরব ২য় সংস্করণ ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ ঈ.
١٩٠. اَلرِّحْلَةُ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ	১৯০. আর্‌রিহ্‌লাতু ফী তলাবিল হাদীস খতীব বাগদাদী, আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (৪৬৩ হি.)

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ ঈ.

১৯১. ইক্‌তিযাউল ইলমিল আমালা — ١٩١. اِقْتِضَاءُ الْعِلْمِ الْعَمَلَ
খতীব বাগদাদী, আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (৪৬৩ হি.) আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ ১৩৮৯ হি.

১৯২. মাজমূউ রাসায়িলিল হাফেয ইবনে রজব, আবদুর রহমান ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫ হি.) — ١٩٢. مَجْمُوْعَةُ رَسَائِلِ الْحَافِظِ ابْنِ رَجَبَ
মাকতাবাতু আওলাদিশ শায়খ লিত-তুরাস
তাহকীক : নাসের আন্‌নাজ্জার

১৯৩. তাবয়ীনুল আজাব — ١٩٣. تَبْيِيْنُ الْعَجَبِ بِمَا وَرَدَ فِيْ فَضْلِ رَجَبَ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
তাহকীক : আবু আসমা ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আলে আস্‌র

১৯৪. আলমাজমাউল মুআস্‌সিস — ١٩٤. اَلْمَجْمَعُ الْمُؤَسَّسُ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন
১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ ঈ.

১৯৫. কিতাবুল কালয়ূবী = নাওয়াদেরুল কালয়ূবী, আহমদ শিহাবুদ্দীন কালয়ূবী — ١٩٥. نَوَادِرُ الْقَلْيُوْبِيِّ
আশরাফিয়া বুক হাউস, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১৯৬. আলবুরহানুল জালী ফী তাহকীকী ইনতিসাবিস সূফিয়াতি ইলা আলী — ١٩٦. اَلْبُرْهَانُ الْجَلِيُّ فِيْ تَحْقِيْقِ انْتِسَابِ الصُّوْفِيَّةِ إِلٰى عَلِيٍّ
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সিদ্দীক গুমারী (১৩৮০ হি.) প্রকাশক : হাসান মুহাম্মদ তিহামী, ১ম সংস্করণ ১৩৮৯ হি.

১৯৭. আলমুস্‌হিম ফী বয়ানি হালি হাদীসি তলাবুল ইলমি ফারীযাতুন আলা কুল্লি মুসলিম (হুসুলুত তাফরীজ-এ সংযুক্ত) — ١٩٧. اَلْمُسْهِمُ فِيْ بَيَانِ حَالِ حَدِيْثِ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সিদ্দীক গুমারী

(১৩৮০ হি.) মাকতাবাতু তবারিয়া, রিয়ায
১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ ঈ.

১৯৮. ফিহরিসুল ফাহারিসি ওয়াল-আসবাত
আব্দুল হাই কাত্তানী (১৩৮২ হি.)
দারুল গরব আলইসলামী, বৈরুত
২য় সংস্করণ, ১৪০২ হি. = ১৯৮২ ঈ.

١٩٨. فِهْرِسُ الْفَهَارِسِ وَالْأَثْبَاتِ

১৯৯. আল্আনওয়ারুল কাশিফা
আবদুর রহমান ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুআল্লেমী (১৩৮৬ হি.)
আলামুল কুতুব, ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ ঈ.

١٩٩. اَلْأَنْوَارُ الْكَاشِفَةُ

২০০. নুযহাতুল মাজালিস ওয়া-মুনতাখাবুন নাফায়িস, আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম সুফুরী (৮৯৪ হি.) আলমাকতাবুল কাসতিলিয়া, মিসর, ১২৮৯ হি.

٢٠٠. نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ وَمُنْتَخَبُ النَّفَائِسِ

২০১. হাশিয়াতু শায়খুল হিন্দ আলা মুখতাসারিল মাআনী, শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯ হি.)
আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ

٢٠١. حَاشِيَةُ شَيْخِ الْهِنْدِ عَلٰى مُخْتَصَرِ الْمَعَانِيْ

২০২. আলআহাদীস ওয়াল-আসারুল ওয়ারিদাতু ফী ফাযলিল লুগাতিল আরাবিয়া
ড. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ
কুনূযে ইশবীলিয়া
১ম সংস্করণ ১৪২৭ হি. = ২০০৬ ঈ.

٢٠٢. اَلْأَحَادِيْثُ وَالْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِيْ فَضْلِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَذَمِّ اللَّحْنِ

২০৩. আমছালুল হাদীস
হাসান ইবনে খাল্লাদ রামাহুরমুযী (৩৬০ হি.)
মাকতাবাতু ইবনে আব্বাস, মিসর
২০১৩ ঈ.

٢٠٣. أَمْثَالُ الْحَدِيْثِ

২০৪. হাসরুশ শারিদ মিন আসানীদে মুহাম্মাদ আবেদ, মুহাম্মাদ আবেদ সিন্দী (১২৫৭ হি.) মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ
১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.

٢٠٤. حَصْرُ الشَّارِدِ مِنْ أَسَانِيْدِ مُحَمَّد عَابِد

২০৫. আলউমাম লি-ঈকাযিল হিমাম

٢٠٥. اَلْأُمَمُ لِإِيْقَاظِ الْهِمَمِ

ইবরাহীম ইবনে হাসান কুরানী (১১০১ হি.)
দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া
হায়দারাবাদ, ভারত
১ম সংস্করণ ১৩২৮ হি.
২০৬. কাশফুয যুনূন
٢٠٦. كَشْفُ الظُّنُوْنِ
হাজী খলীফা (১০১৭-১০৬৭ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
১৪১৩ হি. = ১৯৯২ ঈ. (ফটোকপি সংস্করণ)
২০৭. বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত তাঊন
٢٠٧. بَذْلُ الْمَاعُوْنِ فِيْ فَضْلِ الطَّاعُوْنِ
ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.)
দারুল আসেমা, রিয়ায, সৌদি আরব
১ম সংস্করণ ১৪১১ হি.
২০৮. মকছুদোল মোমেনীন
٢٠٨. مَقْصُوْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ
কাজী মো. গোলাম রহমান
রহমানিয়া লাইব্রেরি, ৪২/৪৩ নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
২০৯. তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ
٢٠٩. اَلتَّصَوُّفُ : بَيْنَ عَرْضٍ وَنَقْدٍ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ৪র্থ মুদ্রণ ১৪২৮ হি.
২১০. মাসিক আলকাউসার
٢١٠. مَجَلَّةُ الْكَوْثَرِ اَلشَّهْرِيَّةُ
মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
৩০/১২, পল্লবী (মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬
২১১. উম্মতি নবী
٢١١. امتی نبی
শাহ্ মুস্তাফিযুর রহমান
প্রকাশনা বিভাগ, আহমদিয়া মুসলিম জামাত, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা

সমাপ্ত
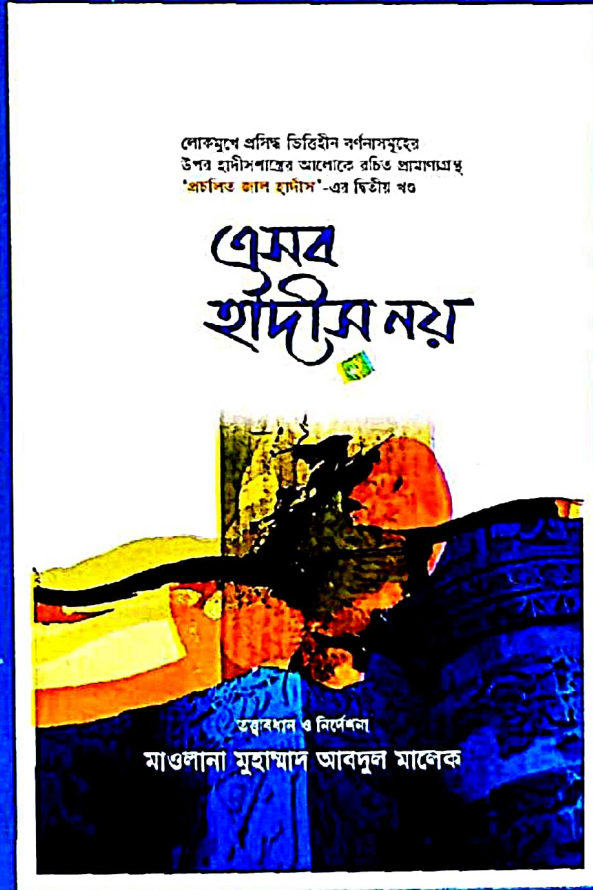
প্রকাশনা বিভাগ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬। ফোন : ৮০০১৪৯৪, ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫
e-mal : publisher.markaz@yahoo.com